প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৭১

প্রকাশক :
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
প্রাণেশ মণ্ডল

মুদ্রাকর :
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

সাহিত্য জগতে পত্রাবলীর একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এ-দেশে এবং ও-দেশে নানা জ্ঞানী গুণী মনীষীর পত্র-সংকলন প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। পত্রের মধ্যে যেমন অন্তরঙ্গতার সুর ফুটিয়া উঠে এবং একটি ব্যক্তিগত যোগসূত্রের গভীর সম্পর্ক অন্তরালে থাকার ফলে আলোচ্য যে কোনো বিষয় যেমন হৃদ্য ও আস্বাদনীয় হইয়া উঠে এমন অন্যত্র পাওয়া যায় না। অন্য যে কোনো রচনাই নৈর্ব্যক্তিক অবাস্তবতার স্পর্শে যেন একান্ত প্রাণহীন বলিয়া বোধ হয় এবং সেখানে আদানপ্রদান বা বিনিময়ের কোনো অবকাশই থাকে না। মনীষীদের পত্র-সাহিত্যে তাই লক্ষ্য করা যায় যে তাঁহারা দিবার জন্য যেমন আকুল, গ্রহীতা বা জিজ্ঞাসুও পাইবার জন্য ততোধিক উন্মুখ। তাই এ সব পত্রের মূল্য লেখক ও প্রাপক উভয়ের কাছেই অপরিসীম।

এখানে যে পত্রাবলী প্রকাশিত হইতেছে, ইহার বিষয়বস্তু একটু স্বতন্ত্র ও অভিনব। অধ্যাত্ম জগতের নানা নিগূঢ় তত্ত্বের অনুভূতির মণি-মাণিক্যকে একজন নিপুণ জহুরীর কাছে যাচাই করিয়া লইবার জন্য সকলে উপস্থিত হইয়াছেন। যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন তাঁহারা কেহ সিদ্ধ মহাপুরুষ, কেহ বা পরম জ্ঞানী বা ভক্ত, কেহ বা প্রবর্তক সাধক। কেহ বা সিদ্ধির শিখরে উঠিয়া আপন সিদ্ধিকে যাচাই করিয়া লইতে চাহিয়াছেন, কেহ বা সাধনার পথে সবে চলিতে সুরু করিয়াছেন, তাই পথের অভিজ্ঞান প্রথমেই সংগ্রহ করিতে চাহিয়াছেন। যাঁহার কাছে এই যাচাই করিতে সকলে একত্রিত হইয়াছেন তাঁহার দুয়ার হইতে কেহই কোনদিন বিমুখ হইয়া ফিরিয়া যান নাই। মাতা অন্নপূর্ণার অবারিত দানসত্রের ক্ষেত্রে বসিয়া এই সচল বিশ্বনাথ নিরন্তর সকলের জন্য সমান আদরে জ্ঞানামৃত বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁর অলৌকিক প্রতিভার ও আশ্চর্য মনীষার পরিচয় তাঁর নানা ভাষায় প্রকাশিত বিবিধ গ্রন্থে উজ্জ্বল হইয়া আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসুর সংশয় নিরসনের জন্য তাঁর সাক্ষাৎ উপদেশের অমৃত-প্রবাহ তাহাতে বিধৃত হয় নাই। যে সাক্ষাৎ শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে সে-ই তার আস্বাদ পাইয়াছে ও মজিয়াছে। আর তার কিছুটা এই পত্রাবলীর মধ্যে বিধৃত আছে।

শাস্ত্রে নির্দেশ আছে জিজ্ঞাসু তাঁর সংশয় নিরসনের জন্য যাইবেন 'শ্রোত্রিয়' ও 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' আচার্যের নিকট। 'শ্রোত্রিয়' বা শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে নিষ্ণাত অনেকে আছেন, 'ব্রহ্মনিষ্ঠ'ও কেহ কেহ আছেন, যদিও তাঁদের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। কিন্তু বিরলতম তিনি, যাঁর মধ্যে একাধারে 'শাস্ত্রেষু অকুণ্ঠিতা বুদ্ধিঃ' এবং গভীরতম তত্ত্বোপলব্ধির সমন্বয় ঘটিয়াছে। গীতায় শ্রীভগবান্ এইরূপ 'জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ'র কাছেই পরিপ্রশ্নের দ্বারা জ্ঞান লাভের বিধান দিয়াছেন। পরম পূজনীয় আচার্যদেব মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

তাঁহাদেরই সগোত্র ও প্রতিভূরূপে আজও আমাদের মধ্যে বিরাজমান বলিয়া ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত হইতে নানা অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু নিরন্তর বিবিধ জিজ্ঞাসা লইয়া তাঁহার কাছে সমাগত হন। তাহারই উত্তরচ্ছলে এই অমূল্য পত্রাবলী সংগৃহীত হইয়াছে।

এই পত্রগুলির অধিকাংশ ১৯৪৪-৪৫ সালে লিখিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালের কিছু পত্রও শেষের দিকে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। যাঁহাদের নিকট পত্রগুলি প্রেরিত হইয়াছিল তাঁহাদের কেহ কেহ বয়োবৃদ্ধ, কেহ বা যুবক, কেহ সন্ন্যাসী, কেহ গৃহস্থ, কেহ বা ব্রহ্মচারী—সকলেই যে এক পথের পথিক এবং একভাবের ভাবুক তাহাও নহে, কিন্তু সকলেই সরল এবং তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন। পত্রগুলি প্রকাশনের ভাব লইয়া লিখিত হয় নাই এবং বহু পত্রের প্রতিলিপিও ছিল না। যেগুলির প্রতিলিপি ছিল সেইগুলি দেখিয়া অনেকে ঐগুলিকে জিজ্ঞাসু সাধকগণের উপকারার্থে মুদ্রণ ও প্রকাশন করার ইচ্ছা প্রকট করায় আচার্যদেব সানন্দে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন এবং তিনি এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রকাশনের এই উদ্দেশ্য সার্থক হইবে অর্থাৎ বহু অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসু এগুলি পাঠে উপকৃত হইবেন।

যাঁহাদের উদ্দেশ্যে পত্রগুলি লিখিত হইয়াছিল আমরা ইচ্ছা করিয়াই তাঁহাদের নাম প্রকাশ করি নাই, কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখন পরলোকগত, অনেকে সিদ্ধ আচার্য বা গুরুপদে অধিষ্ঠিত, অনেকে কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তখন তাঁহারা যে ভূমিতে থাকিয়া এসব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এখন হয়তো অনেকে সে-সব ভূমি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ ভূমিগুলি চিরন্তন, সনাতন। তাই যে কোনো সাধককে সেই ভূমির মধ্য দিয়া যাইতে হইতে পারে। তখন এই জাতীয় জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন তাঁহার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই জাগিয়া উঠিবে এবং তাহার উত্তর ইহার মধ্যে দেখিতে পাইয়া তিনি কৃতার্থ ও নিঃসংশয় হইবেন। নাদানুসন্ধান, জপবিজ্ঞান ইত্যাদি সাধনার নানা কথাও যেমন এই পত্রাবলীর মধ্যে আলোচিত হইয়াছে, তেমনি সাংখ্য, বেদান্ত, তন্ত্রের নানা তত্ত্ব, কোথাও বা প্রাসঙ্গ কিছু কিছু শ্লোক বা মন্ত্রাদির রহস্যও এখানে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। তাই তত্ত্ব বা লক্ষ্য এবং সাধন উপেয় এবং উপায় এই উভয় দিকেরই নানা সংশয় এখানে নিরসন করা হইয়াছে। সেজন্য ইহার মূল্য অপরিসীম।

১৭. ৫. ৪৪

১

আজ প্রাতে আপনার সঙ্গে যে আলোচনা হইয়াছে তাহার মর্মটি মনে রাখিতে পারিলে অনেক বিষয় বুঝিবার সুবিধা হইবে।

নাদের আভাস কিছু কিছু পাইতেছেন। ইহা আভাসমাত্র—এখনও প্রকৃত নাদ ফোটে নাই। নাদের প্রবাহ হইতেই বিশুদ্ধ সৃষ্টির সূচনা হয়। বিশুদ্ধ সৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়াই আধ্যাত্মিক সাধনা সফলতা লাভ করে। মলিন সত্তা শুদ্ধ হইলে ঐ শুদ্ধ সত্তাতে যখন চৈতন্যের উজ্জ্বল জ্যোতি প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায় তখনই মহাচৈতন্যের দিকে স্বাভাবিক আকর্ষণ উপলব্ধ হয়। মহাচৈতন্যের অতীত অবস্থাও আছে।

কিন্তু এসব ভাবিয়া বুঝিবার প্রয়োজন নাই। সময় আসিলে নিজে নিজেই সব বুঝিতে পারিবেন। এখন চাই শুধু নাদের অনুসন্ধান। নাদ অবিচ্ছিন্ন, তাহার বিরাম নাই। কিন্তু আপনার মন নাদপ্রবাহে অবিচ্ছিন্নরূপে যুক্ত থাকিতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে যোগসূত্র ছিঁড়িয়া যায়।

মন বিক্ষিপ্ত থাকা পর্যন্ত নাদকে পায় না, একাগ্র হইলেও নাদকে পায় না। বিক্ষিপ্ত হইতে একাগ্র ভূমিতে ক্রমশঃ সঞ্চরণই নাদ সাধনা। নাদ তরঙ্গরূপে প্রবাহিত হয়—চিদাকাশ অথবা কুন্ডলিনী হইতেই এই প্রবাহ উত্থিত হয়। কুণ্ডলিনীই বিন্দুস্বরূপা মহামায়া। ভগবানের কৃপাশক্তি অর্থাৎ চিৎশক্তি মহামায়াতে পতিত হইলে মহামায়া বিক্ষুব্ধ হইয়া নাদরূপে পরিণত হন। নাদের অভিব্যক্তির মূল, চিদাকাশে চিৎশক্তিব আঘাত। ইহাকে মহাকৃপা বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু নাদ অভিব্যক্ত হইলেও মন তাহাতে যুক্ত না হইলে তাহা শ্রুতিগোচর হয় না। ক্রিয়াকৌশলে অথবা প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মনকে অন্তর্মুখ করিতে পারিলে নাদ শ্রবণ হয়। তখন নাদই ক্রমশঃ মনকে আকর্ষণ করিতে থাকে। যে অনুপাতে নাদে আকৃষ্ট হইতে থাকে সেই অনুপাতে মন একাগ্রতা লাভ করে। নাদ উত্থিত হয় চিদাকাশ হইতে এবং লীনও হয় চিদাকাশে। নাদ ফিরিবার মুখে মনকে টানিয়া লইয়া যায়। বিন্দুই চিদাকাশ। যখন মন ঐ স্থানে পৌঁছিয়া যায় তখন তাহার চঞ্চলতা আর থাকে না—তাহা বিন্দুতে স্থিতিলাভ করে। ইহাই একাগ্রতা। এই অবস্থায় মনের লয় হয় না—ইহা চৈতন্যাবস্থা। ইহাকে প্রজ্ঞা বলে। মনের জাগ্রৎ অবস্থা ইহাই।

নাদের আশ্রয় না পাইলে মন বিন্দুতে স্থিতি লাভ করিতে পারে না। করিলেও ঐ স্থিতি চৈতন্যরূপ না হইয়া সুষুপ্তিরই নামান্তর হয়, মনকে বিন্দুরূপী কেন্দ্রস্থানে যাইতে হইলে একটি রাস্তা ধরিয়া যাইতে হয়—ইহাই নাড়ীপথ। বিন্দু হইতে অসংখ্য রশ্মি নির্গত হইয়াছে, তন্মধ্যে যেটির সঙ্গে

মনের যোগ হয় সেইটিই মনের স্বকীয় মার্গ। ঐ মার্গ ধরিয়া মন উজানে বহিতে থাকে, শব্দের নিবৃত্তিধারা ধরিয়া বিন্দুস্থানে যাইতে থাকে।

ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নাদের আশ্রয় না লইয়াও মন চেতনভাবে বিন্দুতে অবস্থান করিতে পারে। কিন্তু এরূপ ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। ইহার কারণ এই—চিৎশক্তি সাক্ষাৎভাবে মায়াতে পতিত হয় না। মহামায়া হইতে প্রতিফলিত হইয়া মায়াতে পতিত হয়। তখন মায়াতে ক্ষোভ জন্মে। মায়াকাশ হইতে যে শব্দ উত্থিত হয় তাহা ভেদজ্ঞানের কারণ ও বন্ধনের হেতু। ইহাই বিকল্পজাল। মাতৃকাচক্ররূপে এই বর্ণমালা অনন্ত বিকল্পময়ী বৃত্তি আকার ধারণ করিয়া জীবকে বদ্ধ করিয়া থাকে। এই মায়াজাল হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যই শুদ্ধ নাদময় শব্দকে আশ্রয় করিতে হয়। নাদময় শব্দই জাগ্রৎ মন্ত্র। ইহা অভেদজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া অশুদ্ধ বর্ণাত্মক শব্দের জালকে ভাঙ্গিয়া দেয়।

ইহা হইতে বুঝিতে পারিবেন চৈতন্যকে অবলম্বন না করিয়া মনকে নিরোধ করিবার চেষ্টা তমোভাব ও জড়ত্বকে আবাহন করা মাত্র।

নাদের বিস্তার কতটা ব্যাপক তাহা জানিতে চেষ্টা করিবেন না—করিলেও জানিতে পারিবেন না। কারণ, যে স্থানে আপনার মনের সঙ্গে নাদের যোগ, আপনি উহাকেই নাদের সীমা বলিয়া জানিবেন। ঐখান হইতেই আপনার প্রত্যাবর্তন বা ফিরিবার পালা। প্রত্যেকের পক্ষেই এই নিয়ম জানিতে হইবে। যে নাদ সৃষ্টির ধারায় বহির্মুখ হইয়া প্রবহনশীল তাহা অজ্ঞাত বলিয়া সৃষ্টির মূল অজ্ঞান ধারা। এইজন্য সৃষ্টির ধারা অজ্ঞানের ধারা। মন তখন নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দর্শন করিতেছে। কিন্তু এই ধারার সঙ্গে মন যুক্ত হইলেই অজ্ঞানধারা জ্ঞানপ্রবাহে পর্যবসিত হয়। তখন ঐস্থান হইতেই জ্ঞানের ধারারূপে নাদ চলিতে থাকে এবং ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে বিন্দু স্পর্শ করিয়া অশব্দ অবস্থায় পরিণত হয়। ইহাই চৈতন্যের উন্মেষ। বস্তুতঃ উহা অশব্দ অবস্থা নহে। কিন্তু মন একাগ্র হওয়ার ফলে অর্থাৎ প্রজ্ঞার উদয়বশতঃ উহা অশব্দরূপে সাধারণ জ্ঞানে প্রতিভাত হয়। বস্তুতঃ ইহাকে মহাশব্দও বলা যাইতে পারে।

চিৎশক্তি বিন্দুতে পতিত না হইলে নাদ উত্থিত হয় না, তদ্রূপ নাদ বিন্দুতে প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত চিৎশক্তিকে পাওয়া যায় না। মন বিন্দুতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিন্দুর ক্ষোভ মিটিয়া যায়, তখন মন চিৎশক্তিতে স্থিতিলাভ করে। চিৎশক্তিই চিৎকলা বা কলা। মন কলাত্মক হইয়া কলাতীত আত্মস্বরূপে অভেদে অবস্থান করে। নাদ-বিন্দু-কলার ইহাই রহস্য।

আজ এই পর্যন্তই বুঝিবার চেষ্টা করুন, আবার কাল বলিব। হৃদয় হইতে যেরূপ প্রেরণা আসিল তাহাই বলিলাম। যিনি বলিবার তিনিই বলিলেন, আমি বাহন মাত্র।

১৮, ৫, ৪৪

২

কাল যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে আবশ্যকীয় কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

মনই সাধনার যন্ত্রস্বরূপ। ইহার দ্বারাই ইষ্টসিদ্ধি করিতে হইবে। যতক্ষণ তাহা না হয়, যতক্ষণ জীব স্বাধীনতা লাভ না করিতে পারে, ততক্ষণ ইহার আবশ্যকতা আছে। কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি—প্রতি কার্যেই মনের প্রয়োজন আছে। প্রথম অবস্থাতেই মনকে নিরোধ করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে। করিলেও তাহা সুফল প্রসব করিবে না।

সুতরাং কৃত্রিম উপায়ে মনকে ডুবাইবার চেষ্টা করিলেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। মনকে পরিহার করিতে চেষ্টা করিয়া শুদ্ধ করিতে পারিলে বুঝিতে পারা যাইবে সাধকের অধ্যাত্মজীবন মন কিপ্রকার সাহায্য করে। অবশীভূত, মলিন মনই সাধকের রিপু, স্বায়ত্ত ও নির্মল মন তাহার পরম মিত্রস্বরূপ।

মন সর্বদাই চঞ্চল, সর্বদাই অস্থির, সর্বদাই ভ্রমণশীল। ইহার একমাত্র কারণ—মন সর্ব সময়েই একটা অভাব বোধ করিতেছে, একটা অস্পষ্ট অথচ বিপুল অতৃপ্তি তাহাকে শান্ত থাকিতে দিতেছে না। মন চায় ঐশ্বর্য জ্ঞান ও আনন্দ—তাহাই মনের কাম্য। তাহা না পাইয়া মন নিরন্তর হাহাকার করিতেছে। মনের ক্ষুধা নিবৃত্ত করিলেই মনের চঞ্চলতা চিরদিনের জন্য শান্ত হইয়া যাইবে।

মন যাহা চায় তাহা কোথা আছে? তাহার স্বরূপ কি। কি ভাবে তাহা উপলব্ধ হইতে পারে? এক কথায় ইহার উত্তর এই: মন চায় আত্মাকে—আত্মাই মনের বন্ধু, যথার্থ ঐশ্বর্য, পরমানন্দ, তাহার সর্বস্ব। তাহাকে হারাইয়াই মন পুনরায় তাহাকে পাইবার জন্য জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে বিরহানলে দগ্ধ হইতেছে। একমাত্র তাহাকেই মন অন্বেষণ করিতেছে—জগতের যাবতীয় বস্তুকে তন্ন তন্ন করিয়া তাহারই সন্ধান পাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু ফল লাভ হইতেছে না। অথচ সে বস্তু তাহার অতি সন্নিহিত। আত্মাকেই মন চায় এবং আত্মা মনের অতি নিকটে অবস্থিত। তথাপি মন তাহাকে চিনিতে পারিতেছে না। উহার প্রধান কারণ এই যে মন বহির্মুখ বলিয়া আত্মার দিকে বিমুখ।

সুতরাং মনকে অন্তর্মুখ করাই সাধনার উদ্দেশ্য।

যে বহির্মুখ শক্তির প্রবাহে পতিত হইয়া মন বাহিরের দিকে গতিশীল, তাহা প্রকৃতির শক্তি। আবার যে অন্তর্মুখী শক্তির প্রবাহে পতিত হইলে মন অন্তর্মুখ

হইতে পারিবে তাহাও প্রকৃতির শক্তি। উভয় শক্তি মূলতঃ একই শক্তি। ইহাই শব্দশক্তি।

সুতরাং শব্দের শক্তিতেই মন বহির্মুখ হয় বলিয়া অব্যবধানে বিদ্যমান আপন প্রভুকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। আবার ঐ শব্দশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই মন অন্তর্মুখ হইয়া আত্মলাভ করিবে ও পরম আনন্দ এবং শান্তি প্রাপ্ত হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে: শব্দের স্বরূপ এক হইলেও তাহার শক্তি বিভিন্ন হয় কেন? উত্তর—শব্দ স্বরূপতঃ এক বটে, কিন্তু তাহার ঐ মৌলিক রূপ মায়ার আবরণে তিরোহিতপ্রায়। শব্দ চৈতন্যস্বরূপ, অখণ্ড নিনাদ রূপেই তাহার আত্মপ্রকাশ হয়। বিশুদ্ধ ব্যোমতত্ত্বে ইহা স্বভাবতঃই হইয়া থাকে। কিন্তু মায়াস্পর্শে ব্যোম কলঙ্কিত হইলে তাহাতে ক্ষোভবশতঃ বায়ুর উদ্ভব হয়। বায়ু বক্রগতিবিশিষ্ট। তখন ঐ বক্র এবং কুটিল গতির প্রভাবে সরল নিনাদ খণ্ড খণ্ড হইয়া বিভিন্ন বর্ণরূপে অভিব্যক্ত হয়। এই বর্ণমালা বায়ুরই খেলা—ইহা হইতেই বিশুদ্ধ চৈতন্যপ্রবাহে নানা বৃত্তির উদ্গম হয়। এইগুলি মনকে আবদ্ধ করে এবং বিক্ষিপ্ত করে। মন আত্মবিস্মৃত হইয়া এই অসংখ্যপ্রকার বিক্ষেপে ক্রীড়াপুত্তলিকারূপে পরিণত হয়। তাহার আর আত্মবশতা থাকে না। পুনরায় শুদ্ধ চৈতন্যপ্রবাহে তাহাকে ফেলিতে পারিলে তাহার আত্মস্মৃতি ফুটিয়া উঠে—সে সুপ্তি হইতে জাগ্রত হয়। শুদ্ধ নাদধারাই নির্মল চৈতন্যের দেহাশ্রিত প্রকাশ। বিশুদ্ধ ব্যোমে এই প্রবাহ নিরন্তর চলিতেছে। তাই ইহাই অবলম্বনের বস্তু। অশুদ্ধ শব্দধারারও অন্তরালে এই বিশুদ্ধ প্রবাহ রহিয়াছে। একবার শুদ্ধ নাদের আশ্রয় পাইলে ও তাহাকে নিরন্তর ধরিয়া থাকিতে পারিলে মনের মলিনতা কাটিয়া যায়। তখন আর উহা বর্ণমালার দ্বারা বিরচিত বিকল্পজালে জড়িত হয় না। সর্বদা বিকল্পহীন শুদ্ধ চৈতন্যের ধারাতেই বহিতে থাকে।

তাই মনকে হৃদয়ে নিয়া ঐ শুদ্ধ প্রকৃতিস্রোতে ফেলিতে হয়। শব্দ—জ্যোতি—রূপ, ইহাই স্বাভাবিক ক্রম। নাদ সাধনার অখণ্ড অভ্যাসের ফলে অনুভূতির এমন একটি অবস্থা আসে যখন বুঝিতে পারা যায় যে ঐ নাদ বা শব্দ শুধু আপন হৃদয়ে আবদ্ধ নহে, উহা স্বীয় হৃদয় হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র জগতের ক্ষুদ্রতম হইতে বৃহত্তম পর্যন্ত প্রতি বস্তুতে সমভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ইহা শুধু বিচারমূলক বোধ নহে—ইহা প্রত্যক্ষভাবে বোধ করা যায়। ইহাই নাদসিদ্ধির লক্ষণ। ইহার পর এই নাদে ডুবিলেই অন্তঃস্থ বিশাল জ্যোতির অনুভব হয়। নাদকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে এই মহাজ্যোতিতে প্রবেশ করা যায় না। যদিও আমরা সকলেই, জগতের যাবতীয় বস্তুই, এই সর্বব্যাপক মহাজ্যোতিতেই রহিয়াছি, তথাপি আমাদের চিত্ত বাহ্যপ্রবণ বলিয়া নাদের সন্ধান না পাওয়াতে এবং শব্দভেদ করিবার কৌশল না জানাতে ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব

করিতে পারিতেছি না।

এই দুইটি উপলব্ধি ধ্যানেরই পরিপক্ক ফল বিশেষ। বস্তুতঃ শব্দ ও জ্যোতি ব্রহ্মেরই দ্বিবিধ স্বরূপ। সাধনার দ্বারা জীবহৃদয়ে ইহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র।

ঐ জ্যোতিঃ অরূপ। উহাতে কোনপ্রকার রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। উহা নিজ বোধরূপ চৈতন্য। মন আপন কল্পনা অনুসারে ঐ মহানাদ বা মহাজ্যোতি হইতে রূপ গঠন করিয়া থাকে। দিব্যরূপের আবির্ভাব জ্যোতিঃ হইতে হয় এবং অদিব্য মানবীয় বা জাগতিক বস্তুর আবির্ভাব শব্দ হইতে হয়।

শব্দব্রহ্মে ডুবাকে সাধারণতঃ সমাধি বলে। পরব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্যোতিতে ডুবাকে নির্বিকল্প সমাধি বলে। কিন্তু প্রচলিত সমাধি হইতে ইহা বিলক্ষণ। মনকে চেতন করিয়া বা জাগাইয়া না রাখিতে পারিলে রূপের আবির্ভাব সম্ভবপর হয় না। রূপ যে চিন্ময় তাহা বলাই বাহুল্য। অথচ দিব্য ও অদিব্য ভেদ আছে।

এই প্রকারে সাধনার পূর্ণতায় সৃষ্টিতে অধিকার জন্মে। তখন ঐ তিনটির কোনটিকে নিজের আয়ত্ত করিয়া তাহাতে ডুবিতে পারিলে ভগবদনুগ্রহে ধীরে ধীরে সত্যের অনুভব-দ্বার খুলিয়া যায়।

এবার নাদ, বিন্দু ও কলার কথা শ্রবণ করুন। নাদসাধনই শব্দসাধন। বিন্দুই জ্যোতিঃ। কলা চিদ্রূপা শক্তি, যাহা পূর্ববর্ণিত রূপের স্থানাপন্ন। অতএব কলাসিদ্ধিই রূপসিদ্ধি।

ইহার পর কলাতীতই প্রকৃত সত্য। তাহাই অশব্দ, অরূপ, নিষ্কল ও নিরঞ্জন।

২০, ৫, ৪৪

৬

নাদ, বিন্দু ও কলার সন্ধান না জানিলে জপরহস্য বুঝিতে পারা যায় না।

জপের উদ্দেশ্য কি? জপের প্রকার কি? জপের সফলতা কিসের উপর নির্ভর করে? এই সব প্রশ্ন সমাধান করিতে না পারিলে জপ শুদ্ধ হয় না। আমাদের চিত্ত সর্বদাই নানাপ্রকার বিকল্পে আক্রান্ত হইতেছে—এইসব আক্রমণের ফলে চিত্ত তরঙ্গিত হইতেছে। এই সকল বিকল্প বাসনাত্মক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশ্লেষণ করিলে জানিতে পারা যায় বাসনামাত্রই বায়ুর তরঙ্গ।

বায়ুর গতিতে বক্রতা আসিলে যে তরঙ্গ উঠে তাহাই বাসনা। তাহাকেই অশুদ্ধ বলে। ইহা অশুদ্ধ শব্দাত্মক। আমরা যাহাকে চিত্তবৃত্তি বলি তাহার মূলে এই প্রকার অশুদ্ধ কম্পন রহিয়াছে—ইহাই বাসনার ক্ষোভ। ৪৯টী বায়ু ৪৯ প্রকার গতিবিশিষ্ট। ইহাদের পরস্পর মিশ্রণে এবং তাহাদের মিশ্রণে অসংখ্য প্রকার গতি বায়ুমণ্ডলে প্রচলিত রহিয়াছে। এইগুলি বস্তুতঃ শব্দতরঙ্গ—মাতৃকার লহর। যখন কাহারাও চিত্ত এই লহরে আক্রান্ত হয় তখন উহা সদৃশভাবে তরঙ্গিত হইয়া উঠে। কৌশল না জানিলে ইহা হইতে কেহই আত্মরক্ষা করিতে পারে না। তাহার ফলে আত্মা নিজের স্বভাবসিদ্ধ দ্রষ্টৃভাব হইতে স্খলিত হইয়া চিত্তের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় ও ঐ তরঙ্গে তরঙ্গিত হইতে থাকে। আত্মা তরঙ্গের অতীত হইয়াও চিত্তের সহিত অবিবেকবশতঃ চিত্তের তরঙ্গকে নিজের মধ্যে আরোপ করেন। তাই সুখ-দুঃখরূপ বিকারপ্রাপ্ত হইয়া সংসার অনুভূতি করিতে বাধ্য হন।

এই যে বায়ুমণ্ডলের কম্পন এইগুলি বর্ণমালা। এই সকল বর্ণ নিরন্তর উদিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইতেছে এবং নানা প্রকার মিলনের ফলে চিত্তে বৃত্তিরূপে অনুভূত হইতেছে। ইহাই বিক্ষিপ্ততা।

কিন্তু এই তরঙ্গের মূল কোথায়? শুদ্ধ চিদাকাশে যে তরঙ্গ উঠে তাহাই নাদের হিল্লোল। ইহা সাক্ষাৎ চিৎশক্তির অভিঘাত হইতে সৃষ্টিকালে নিরন্তরই চলিতেছে। এই সূক্ষ্ম নাদকে আশ্রয় করিয়া মায়াতীত শুদ্ধ জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই শুদ্ধ আকাশে বায়ুর ক্রিয়া নাই? তির্যক্‌গতি বায়ুর স্বভাব-গতি যেখানে বক্রতাহীন সেখানে বায়ু নাই, তাহা নিশ্চিত। তবে গতি আছে—ইহাকে সরলগতি বলে। এই সরলগতি আপন স্বভাব হইতে চ্যুত না হইয়াও বক্রগতির আকার ধারণ করে। তাহার কারণ বায়ুর প্রভাব। অতএব চিত্তকে বক্রবায়ুর প্রভাব হইতে মুক্ত করাই তাহার বিক্ষিপ্ততা পরিহারের একমাত্র উপায়। জপের উদ্দেশ্য—বায়ুর বক্রতা দূর করা। জপের মন্ত্র নাদাত্মক। আপাততঃ তাহা আপনার নিকট বর্ণাত্মকরূপে প্রতিভাত হইলেও দীর্ঘকাল জপের ফলে মন্ত্রের বীর্য উদ্‌ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা বুঝিতে পারিবেন। বস্তুতঃ মন্ত্র যতক্ষণ নাদে পরিণত না হয় ততক্ষণ মন্ত্র চৈতন্য লাভ করে নাই, বুঝিতে হইবে।

মন্ত্র নাদে পরিণত হইবার সময় প্রথমতঃ উহা নাদে বেষ্টিত হইয়া চলিতে থাকে। দুইটি বর্ণের অন্তরালে নাদের প্রকাশ হয়। তখন ক্রমশঃ বর্ণগত বৈশিষ্ট্য নাদে লীন হইয়া যায়। তখন মনে হয় একমাত্র নাদই বর্তমান আছে। বস্তুতঃ বর্ণও নিত্য। তাহার ধ্বংস নাই। যদি বর্ণের ধ্বংস হইত তাহা হইলে নাদের অতীত ভূমিতে বর্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যাইত না। কিন্তু তাহা যায়। কারণ অ-ক-থ ত্রিকোণরূপী মহাযন্ত্রে সকল বর্ণেরই যুগপৎ সমাবেশ

আছে। ঐ স্থানে প্রতিবর্ণের বৈশিষ্ট্য অনুভূত হয়, অথচ সকল বর্ণ যে একই নাদস্বরূপ, এক বর্ণের সহিত অন্য বর্ণের যে ভেদ নাই, তাহাও অনুভূত হয়। যদি বর্ণ বস্তুতঃ ধ্বংসশীল হইত তাহা হইলে ব্রহ্মজ্যোতিঃ ভেদ করিয়া নিত্য সিদ্ধ সাকার রূপের স্ফুরণ হওয়া সম্ভবপর হইত না।

আসল কথা এই—বর্ণাত্মক স্থূল শব্দের অন্তরালে নাদাত্মক চেতন শব্দকে চিনিতে পারিলে বর্ণগত যাবতীয় দোষের উপসংহার হয়। তখন চৈতন্যই মুখ্য হয়। একাগ্রতার ইহাই লক্ষণ। ঐ অবস্থায় বক্র বায়ুর তরঙ্গ থাকে না—সরল গতিই মাত্র থাকে। তাহাই চৈতন্য শক্তির খেলা, যাহা মহামায়াকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

অতএব জপ করিতে করিতে বর্ণ শুদ্ধতা লাভ করিয়া নাদের অভিব্যঞ্জনা করে।

মন্ত্রের অন্তর্গত বর্ণসকলের মধ্যস্থ যে ব্যবধান এবং আবর্তনকালে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রশব্দের মধ্যস্থ যে ব্যবধান—এই উভয় ব্যবধানই জপের প্রভাবে কমিয়া আসিতে থাকে। সুতরাং ক্রম ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বহুর অন্তরাল কমিয়া আসিলে চরমাবস্থায় বহু একে পরিণত হয়—তখন ক্রম থাকে না, কাল থাকে না। তাহাই চৈতন্যের বিকাশ। কারণ, চিত্তের ভিন্ন ভিন্ন অগ্রভাগ এক বিন্দুতে মিলিত হইলে যে অবস্থা হয় তাহাই একাগ্রতা। তখন বহু নাই—তাই বর্ণ নাই। যাহা আছে তাহা এক—অখণ্ড চৈতন্যময় ধ্বনি মাত্র।

এই ভাবে ক্রমে ক্রমে বহু হইতে একে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। একে গেলেই চৈতন্যের স্ফূর্তি পাওয়া যায়। তাহা স্থায়ী হয় না—তা ছাড়া তাহারও বিকাশ আবশ্যক। সেইজন্য এই এককেও বহুর মধ্যস্থ এক বলিয়া গ্রহণ করিয়া ঐ স্তরের বহুকে আবার উচ্চতর একতায় পর্যবসিত করিতে হয়। চরমাবস্থায় মহাবিন্দুতে পোঁছিলে আর কিছু করণীয় থাকে না।

তখন আসন প্রতিষ্ঠা হয়। ইষ্টরূপী গুরু বা গুরুরূপী ইষ্ট অথবা উভয়ে মিলিতভাবে যুগপৎ তাহাতে আসীন হন।

আজ এই পর্যন্ত।

১৪, ৬, ৪৪

৪

গায়ত্রীর চতুর্থ পাদ গৃহস্থের জন্য নহে ।

এখানে কয়েকটি গুহ্য তত্ত্বের সন্ধান দিতেছি । অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবে ।

পরম তত্ত্ব অলিঙ্গ, উভয়লিঙ্গ, পুরুষ, প্রকৃতি—অথবা সব হইয়াও সকলের অতীত হইতে পারে । অলিঙ্গ বলিতে এখানে পুরুষ বা প্রকৃতি ভাববর্জিত অবস্থা বুঝিতে হইবে । ইহাকে কুটস্থ ব্রহ্মসত্তা মনে করিতে পার । ইহা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সন্দেহ নাই । কিন্তু এই অবস্থাতে শক্তির অভিব্যক্তি থাকে না ।—অর্থাৎ সদৃশ অভিব্যক্তিতে যে শক্তির বিলাস সম্ভবপর হয়, তাহা থাকে না । তবে সামান্য অভিব্যক্তি থাকিতে পারে । নতুবা এই অবস্থা স্বপ্রকাশ চৈতন্য বলিয়া বর্ণিত হইবার যোগ্য হইত না । অবশ্য এই সামান্য অভিব্যক্তিরও মাত্রা আছে । মাত্রার ন্যূনতায় আনন্দের হ্রাস, এমন কি চিদভাবেরও হ্রাস হইয়া পড়ে । চরমে শুদ্ধ সত্তারূপী ব্রহ্ম থাকিয়া যান । এই অবস্থা একটি সুষুপ্তির মতন অবস্থা মাত্র । কিন্তু এরূপ অবস্থাও আছে । ব্রহ্ম যে সচ্চিদানন্দ নহেন তাহা নহে । ইহা জীবের যোগ্যতানুরূপ ব্রহ্মোপলব্ধির রহস্য । সুতরাং অলিঙ্গ অবস্থাও নানা প্রকার হইতে পারে ।

ব্রহ্মের একটি একলিঙ্গাবস্থা আছে । তাহা হয় পরম-পুরুষ বা পরম-প্রকৃতি । যাঁহারা পরম-পুরুষের উপাসক তাঁহারা পরম-পুরুষরূপী ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন । প্রকৃতি এই পুরুষে লীন থাকেন অথবা লীন না থাকিলেও অপেক্ষিক দুর্বলতাবশতঃ আশ্রিত ভাবে বর্তমান থাকেন । এই সকল উপাসক যুগলের উপাসক নহেন । মনুষ্যের গতি এই স্থলে একলিঙ্গ ব্রহ্ম-স্বরূপে বুঝিতে হইবে । যাঁহারা পরমা প্রকৃতির উপাসক তাঁহারাও একলিঙ্গ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন । ইঁহারাও যুগলসেবক নহেন । উভয়লিঙ্গ ব্রহ্ম যুগপৎ পিতা ও মাতা, পুরুষোত্তম ও পরমা প্রকৃতি উভয়ই । তিনি অলিঙ্গ নহেন, একলিঙ্গও নহেন—উভয়লিঙ্গ । যুগল উপাসক এই উভয়লিঙ্গ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন । এখানে পুরুষ-প্রকৃতি উভয় ভাবই আছে । অথচ উভয়ে বিরোধ নাই । এই পুরুষ ও প্রকৃতিভাবের মধ্যে বৈষম্য নাই—উভয়ই তুল্যবল বুঝিতে হইবে । শিব ব্যতিরেকে শক্তি, শক্তি ব্যতিরেকে শিব অলীক—উভয়ে অবিনাভাব সম্বন্ধ । অগ্নি ও দাহিকা শক্তি যেমন অপৃথক্‌সিদ্ধ, ব্রহ্মের এই লিঙ্গদ্বয়ও তদ্রূপ ।

একলিঙ্গ ও উভয়লিঙ্গ—দুই-ই সলিঙ্গ ব্রহ্ম । তাছাড়া অলিঙ্গ ব্রহ্মও

আছেন। যখন এই অলিঙ্গ ও সলিঙ্গ ব্রহ্মের ভেদ থাকিয়াও থাকিবে না, অথবা এক নির্বিশেষ অভেদ অবস্থার মধ্যেও উভয়লিঙ্গের ও একলিঙ্গের প্রতিভাস পূর্ণরূপে উপলব্ধি হইবে, তখনই পরিপূর্ণ ব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধি মনে করিতে হইবে। এই অবস্থায় ভোগ ও ত্যাগ, গার্হস্থ্য ও সংন্যাস একার্থ-বোধক হইয়া পড়ে। এই অবস্থাতে শিব ও শক্তি এই দুইটি শব্দের পৃথক্ অর্থ থাকে না, অর্থাৎ থাকিয়াও থাকে না।

গায়ত্রীর তুর্য পদের প্রভাবে অলিঙ্গ স্থিতি হয়—ইহাই সাধারণ নিয়ম। ইহা ব্রাহ্মনির্বাণ বা কৈবল্যবৎ অবস্থা। সাধারণতঃ সংন্যাসের ফলে এই অবস্থাই উপলব্ধ হয়। এই অবস্থায় স্বরূপের মধ্যে স্থিতি হইলেও স্বরূপ-শক্তির উল্লাস থাকে না। ইহা নিষ্ক্রিয় শান্ত অচল পরমাবস্থা। যখন তুর্য-পাদ পাদত্রয়কে পরিহার করিয়া এককরূপে আত্মপ্রকাশ করে, ইহা তখনকার কথা।

কিন্তু তুরীয় পাদ পূর্ববর্তী তিন পাদকে পরিহার না করিয়া স্বীয়গর্ভে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলে উপাসকের গতি ভিন্ন হইবে। তখন পরিপূর্ণ ব্রহ্মের প্রাপ্তি হইবে—অলিঙ্গ ব্রহ্মের নহে।

ত্রিপাদরহিত তুর্যপাদ ও ত্রিপাদসহিত তুর্যপাদ—উভয়ের প্রভাবে যে ব্রহ্মানুভূতি হয় তাহা পৃথক। প্রথম অনুভূতিতে জগৎ মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়। অনুভূতির পরাকাষ্ঠাতে জগতের বোধ থাকে না। অথচ ব্যাপক ব্রহ্ম-সত্তার বোধ নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বর্তমান থাকে। দ্বিতীয় অনুভূতিতে জগৎটি সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়। ইহা ব্রহ্ম সত্তারই বাহ্য বিলাস বলিয়া উপলব্ধি হয়। শুদ্ধ জ্ঞান ভিন্ন এইরূপ বিলাসের অনুভূতি অসম্ভব। ইহার মূলে অজ্ঞানের প্রভাব নাই।

অর্থাৎ এক, নানা, এক ও নানা—এই তিন প্রকার অনুভূতি আছে। এক আছে, নানা নাই—ইহা অলিঙ্গ ব্রহ্মানুভূতি। আপাততঃ নানার প্রতিভাস থাকিলেও তাহার সত্যতাবোধ খণ্ডিত। প্রারব্ধাবসানে দেহপাতের পর ঐ মিথ্যা প্রতিভাসও তিরোহিত হইয়া যায়।

নানা আছে, এক নাই—ইহা ব্রহ্মানুভূতি নহে, বিষয়ানুভূতি মাত্র। ইহার বিষয় আলোচনা করিব না।

এক আছে, নানাও আছে—ইহাই অলিঙ্গ ও সলিঙ্গের যুগপৎ অনুভূতি, অভেদরূপে অনুভূতি। এই অনুভূতির বহু ভেদ আছে—এক প্রধান, অঙ্গী—নানা গৌণ, অঙ্গ, একে আশ্রিত নানা, নানা প্রধান, এক তাহার অঙ্গ। এক ও নানা—সমান সমান, তুল্যবল। এক ও নানা—অখণ্ড। দুই-ই একটি অখণ্ড অনুভূতি। শব্দে মাত্র দ্বৈত আছে। বাস্তবে কোন ভেদ নাই।

এবার তোমার মুখ্য প্রশ্নের উত্তর দিব। আজ সময় নাই। কাল বলিব।

১৫, ৬, ৪৪

৫

ত্রিপাদ গায়ত্রীর উপাসক ব্রাহ্মণ-সন্তান মহা-সবিতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই প্রাপ্তিতে ক্রম নাই। তবে ব্রাহ্মণদেহ না হইলে ক্রম আবশ্যক হইতে পারে। জন্ম আবার নিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। উর্ধ্বলোক হইতে দেহ শুদ্ধ হইতে হইতে ব্রহ্মদেহ লাভ হইতে পারে।

যদি মহানির্বাণের পথে চলিবার যোগ্যতা থাকে তাহা হইলে উর্ধ্বলোকেই চতুর্থ পাদের রহস্যজ্ঞান অধিগত হয়। আর যদি দিব্য ও দিব্যাতীত লোকে সাম্রাজ্য, বৈরাজ্য, অধিরাজ্য ও স্বরাজ্য লাভের যোগ্যতা থাকে তাহাও এই ত্রিপাদ দেবীই দান করিতে পারেন। আর যদি পরম পদ প্রাপ্য হয় তাহাও আয়ত্ত হইতে পারে। গায়ত্রী ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপা। ব্রহ্মবিদ্যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বহু ক্রম আছে—সে সব জানিবার দরকার হয় না। গায়ত্রীর পূর্ণ প্রসন্নতায় কিছুই বাকি থাকে না। যাহা ব্রহ্মবিদ্যার পরাবস্থা তাহাও অনধিগত থাকে না। গায়ত্রী হইতেই সব হইতে পারে।

মহাসন্ন্যাস ও মহাজ্ঞানাদি উপাসকের নিকট সময় হইলেই আবির্ভূত হয়।

বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। আশ্রমশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাস। কিন্তু উভয়ই চরমাবস্থায় অতিক্রান্ত হইয়া যায়—অবশ্য উভয়ের চরমোৎকর্ষ সিদ্ধ হওয়ার পরে।

একটি গুহ্য কথা বলিতেছি। গায়ত্রী বেদমাতা ও ছন্দোজননী। সমগ্র বেদ ও ছন্দের মূল গায়ত্রী। বেদে আছে দেবতাগণ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ছন্দের প্রসূতি এবং শুদ্ধতম স্বরূপই গায়ত্রী। সুতরাং গায়ত্রীকে আশ্রয় করিলেই দিব্য দেহ ও দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয়। এই জন্ম শুদ্ধ দেহপ্রাপ্তির নামান্তর। ইহাকে বিদ্যাজন্ম বলে। সুতরাং গায়ত্রী সংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ জন্ম বস্তুতঃ বৈন্দব দেহ। বেদমতে গায়ত্রী ছন্দে ব্রাহ্মণের দেহ উৎপন্ন হয়, ইহা মনে রাখিবে। অর্থাৎ যে দেহ গায়ত্রীছন্দে গঠিত হইয়াছে এবং যাহা গায়ত্রীছন্দে শোধিত হইয়াছে তাহাই শব্দব্রহ্ম অনুশীলনের উপযোগী দেহ। শব্দব্রহ্মের অনুশীলনই বেদের অনুশীলন—স্বাধ্যায়, বৈদিক কর্ম প্রভৃতি ইহারই অন্তর্গত। কর্মকাণ্ডের পর জ্ঞানকাণ্ডের অনুশীলনও বেদের অনুশীলন। এতটা উৎকর্ষ হইলে পর তপস্যা ও ব্রহ্মবিদ্যার চরম বিকাশ সম্পন্ন হয়। তখন সমনা ভেদ হইয়া বিন্দু রাজ্যের লঙ্ঘন হয়। এইটিই মহাসন্ন্যাসের অবস্থা।

ইহার পর পরমশুদ্ধ আত্মস্বরূপে চিন্মাত্ররূপে বা নিত্য চিদানন্দস্বরূপে

স্হিতি অথবা ভগবদ্ভাবে উন্মোধ উভয়ই হইতে পারে।

ওখানে একটি মহা করুণার খেলা আছে। তদনুসারে গতির বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রিত হয়। মহাকরুণার খেলায় কাল বা ক্রম কিছুরই অপেক্ষা নাই। উহাতে অঘটনও ঘটিতে পারে—অসম্ভবও সম্ভব হয়। উহার বিশ্লেষণ চেষ্টা জীবের পক্ষে অনধিকার চেষ্টা মাত্র।

৩০, ৪, ৬৪

৬

আপনার প্রেরিত নলিনীবাবুর পত্রখানা পড়িলাম। বেশ ভাল লাগিল। তাঁহাকে চিরদিনই ভাল লাগিত। তাঁহার জীবনের ধারাটি একমুখী হইয়া চলিয়াছে। তাঁহার ত্যাগ, নির্ভরতা, ধৈর্য, চরিত্রগত পবিত্রতা ও মাধুর্য এবং একান্ত গুরুনিষ্ঠা সত্যই প্রাণকে স্পর্শ করে। তিনি শ্রীঅরবিন্দের অন্যান্য ভক্তের ন্যায় শ্রীঅরবিন্দের সাধন প্রণালী ব্যতীত অন্যান্য সাধন প্রণালীকে 'গতানুগতিক' বলিয়া মোটামুটি সকলগুলিকেই একশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা Descent of the Supermind সম্বন্ধে অন্য কোন মহাপুরুষ সন্ধান পান নাই অথবা প্রকাশ করেন নাই। আমার বিশ্বাস এই ধারণা অমূলক। যিনি যোগদৃষ্টির দ্বারা অথবা ব্যবহারিক অনুসন্ধানের দ্বারা এই বিষয়ে সত্য নির্ণয় করিতে সমর্থ নহেন তাঁহার পক্ষে ব্যাপকরূপে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা সঙ্গত হয় না।

আমি নিজে যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে ধরাতলে পুরুষোত্তম ভাব পর্যন্ত স্হূলদেহ অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যখনই অরূপভাবের প্রকাশ হইয়াছে তখনই উহা বিশ্বগুরুর আবির্ভাব বলিয়া সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন যোগীমণ্ডলে উদ্‌ঘোষিত হইয়াছে। এই পুরুষোত্তমভাবের একটি পরাবস্হা আছে। স্হূলদেহে অবস্হানকালে কোন যোগীই এ পর্যন্ত ঐ অবস্হা লাভ করিতে পারেন নাই। ইহাই অভিজ্ঞ আচার্যগণের সিদ্ধান্ত। যদি কেহ ঐ পরাবস্থা স্থূলদেহে অবস্থানকালে প্রাপ্ত হইতে পারেন, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সৃষ্টিতে একটি অদ্ভুত পরিবর্তন উপস্থিত হইবে। ইহা তাঁহাদের বিশ্বাস। স্হূল দেহের অতীত হইয়া সূক্ষ্ম জগতে অবস্হান পূর্বক ক্রমশঃ ঐ অবস্হার প্রাপ্তি অনেকের হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে জাগতিক বিপ্লব হয় না। পূর্ণত্ব-লাভ করিয়াও জগৎ কল্যাণসাধনের জন্য তাঁহাদের ক্রিয়াশক্তি নিরন্তর ব্যাপৃত থাকে। বুদ্ধদেব যখন বোধিসত্ত্ব অবস্থা লাভ করিয়া পর পর দশটি ভূমি অতিক্রম

পূর্বক সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিলেন তখনই তিনি যথার্থ বুদ্ধ বা বিশ্বগুরু-পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ঐ একই অবস্থাতে অধিষ্ঠিত আছেন। ইঁহারা সকলেই বিশ্বকল্যাণের জন্য উদ্যমশীল রহিয়াছেন। আমাদের দেশের এবং অন্যান্য দেশেরও মহাযোগী আচার্যগণ সমগ্র জগতের মঙ্গল কামনায় আপন শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। অবতারবর্গের কথা ছাড়িয়া দিন, তাঁহারা জগতের সাময়িক বিক্ষোভ দূর করিয়া ধর্মসংস্থাপন করিবার জন্য আবির্ভূত হন। কিন্তু যিনি বিশ্বগুরু তিনি কালপুরুষের প্রভাব হইতে জীবকে উদ্ধার করিবার জন্য এবং উদ্ধার করিয়া পরম আনন্দময় স্বপদে স্থাপন করিবার জন্য সর্বদাই জাগ্রৎ রহিয়াছেন। তথাপি কাল অথবা নিয়তির প্রভাব ন্যূন হয় নাই এবং হইবার আশাও নাই। ব্যক্তিগতভাবে অধিকার অনুসারেই হউক্ অথবা স্বতন্ত্র পুরুষের লীলাবশতঃই হউক্, উদ্ধারকার্য অবশ্যই চলিতেছে। কিন্তু তাহাতে আমূল প্রাকৃতিক পরিবর্তন হওয়ার আশা নাই।

প্রকৃতির রূপান্তর এইভাবে হয় না। ভিতর হইতে শক্তির বিকাশ না হইলে উপর হইতে সঞ্চারিত করুণাশক্তির প্রভাবে প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন সম্ভবপর নহে। এইজন্যই পুরুষোত্তমের পরাবস্থা এই প্রাকৃতিক স্তরে থাকিবার সময় যদি একজনও প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহা হইলে ঐ একজনের পূর্ণতা হইতেই পূর্ণতার বীজাধান জগতে সিদ্ধ হইবে। তখন স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে ঐ বীজ বিকশিত হইতে থাকিবে। তখন ধরাতল ঐ পূর্ণসত্তার আভাসে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। একের মুক্তি সকলের মুক্তির সূচনা করিবে। কারণ, এক ও নানা সমসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। নানাকে ছাড়িয়া এক যেমন অসত্য অর্থাৎ হইয়াও অসৎকল্প, তেমনি এককে ছাড়িয়া নানাও নিরালম্ব আকাশকুসুমমাত্র। সুতরাং ধরাতলে পার্থিব দেহকে আশ্রয় করিয়া যদি অখণ্ড পূর্ণ সত্যের আবির্ভাব হয় তাহা হইলে এই অঘটন ঘটিয়া যাইবে। ঐ অবস্থাটি একজনের হইলেও ফলভোগ সকলেই সমভাবে করিতে পারিবে। স্থূলদেহে থাকিয়া ঐ দেহকে সম্পূর্ণরূপে ঐ পূর্ণতারূপ মহাশক্তিকে ধারণ করিবার যোগ্য করিতে না পারিলে ইহা সম্ভবপর হয় না। একমাত্র পুরুষোত্তম অবস্থাই ঐ মহাশক্তিকে ধারণ করিতে সমর্থ। সুতরাং পুরুষোত্তম-ভূমি অথবা বুদ্ধভূমি প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত মহাশক্তির অবতরণ আশা করা যায় না।

ভারতীয় সাধনামাত্রই অথবা অন্যান্য দেশেরও প্রাচীন সাধনামাত্রই গতানুগতিক ও ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের উপায়রূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য, একথা ঠিক নহে। এবিষয়ে আপনার বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে পরে আলোচনা করা যাইবে। এখন আর অধিক লিখিলাম না।

১৩. ৭. ৪৪

৭

তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, স্থিরভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিবে। (১) সদ্‌গুরুর আশ্রয় প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষিত হইয়া যথার্থ যোগপথে আরূঢ় হইলে, আধ্যাত্মিক বিকাশ অবশ্যম্ভাবী। কারণ, প্রতিকূল শক্তির অভাববশতঃ সদ্‌গুরুর শক্তি যাহা ক্ষেত্রে নিহিত করা হইয়াছে তাহা যথানিয়মে ক্রমশঃ অঙ্কুরিত হইয়া বিকাশের স্তরগুলি উত্তরোত্তর অধিকার করিতে থাকে। সদ্‌গুরুর শক্তি সাক্ষাৎ ভগবৎশক্তি। তাহাকে অবরোধ করিবার সামর্থ্য জাগতিক কোন শক্তিতে নাই। এইজন্য একবার ঐ শক্তি ক্ষেত্রে বীজরূপে পতিত হইলে তাহার সুফল অবশ্যম্ভাবী। তবে কর্মীর কর্মগত শিথিলতা এবং জড়তা প্রভৃতির প্রভাবে বিকাশে বিলম্ব হইতে পারে। জীব নির্বিচার হইয়া ঐ শক্তি ধারণ করিতে এবং রক্ষা করেতে পারিলে বিলম্বের বিশেষ কোন কারণ থাকে না।

কিন্তু বিকাশ হইলেই যে তাহা অনুভূতিগোচর হইবে এমন কোন কথা নাই। কারণ প্রতিবন্ধক থাকিলে বিকশিত বস্তুও অনুভূত হয় না। জীব যতক্ষণ পাঞ্চভৌতিক স্থূল আধারে অভিমানবিশিষ্ট থাকে ততক্ষণ নানা কারণে এই উপলব্ধির পথে বাধার উদয় হয়। এইজন্যই স্থূলদেহকে অর্থাৎ ভৌতিক পিণ্ডকে যথাযথভাবে শুদ্ধ করিতে না পারিলে অন্তঃস্থিত বিকশিত সত্তারও উপলব্ধি হয় না। উপলব্ধি না হইলে জীবন্মুক্তির আনন্দ আবির্ভূত হয় না। কিন্তু জীবন্মুক্তি না হইলেও দেহান্তে পরমা মুক্তি অপ্রতিহত।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে প্রতিবন্ধকবশতঃ যোগাভ্যাসী নিজের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সব সময়ে উপলব্ধি করিতে পারে না। কিন্তু বস্তুতঃ যদি উপলব্ধির উপায় না থাকে তাহা হইলে ঐ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ অথবা অপকর্ষ শুধু অমূলক বিশ্বাসের বস্তুরূপেই থাকিয়া যায়।

ইহার উত্তর এই—যে বস্তুর অভিব্যক্তি হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিবার যোগ্য শক্তির বিকাশ না থাকিলে অভিব্যক্ত বস্তুর সত্তাও উপলব্ধ হয় না। চক্ষু না থাকিলে যেমন ভৌতিক রূপের সত্তা বুঝিতে পারা যায় না—ঠিক সেইপ্রকার অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ না হইলে আভ্যন্তরীণ সত্তার নিঃসংশয় অপরোক্ষ জ্ঞান হয় না। এরূপ স্থলে যাঁহারা অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ সিদ্ধ হইয়াছে তাঁহার বাক্যই বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা কর্তব্য। অক্ষত বিশ্বাস ধারণ করিতে পারিলে সাধক অথবা যোগী কখনই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বস্তুতঃ ঐ প্রকার অটল ও দৃঢ় বিশ্বাস ভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হইলে বিকাশ হইতেছে কিনা তাহা

জানিবার জন্য ইচ্ছাও হৃদয়ে উদিত হয় না। কারণ ঐ জাতীয় ইচ্ছার উদয়ও সংশয়েরই লক্ষণ।

বিকাশের উপলব্ধি করা সাধকের পক্ষে শুভ অথবা অশুভ তাহাও আলোচনার বিষয়। কোন কোন স্থলে নিজের উন্নতি জানিতে না পারা, অর্থাৎ পথে চলার সময়ে গম্যস্থান কতটা ব্যবধানে অবস্থিত আছে তাহা বুঝিতে না পারা, ক্ষিপ্র সিদ্ধির লক্ষণ। অর্থাৎ যে সরল বিশ্বাসে গুরুবাক্য পালন করে অথবা করিবার চেষ্টা করে অথবা চেষ্টা করিবার সংকল্প করে তাহার পক্ষে কিছু জানিবার প্রয়োজন হয় না। কারণ যে ফল সুদীর্ঘকালে সম্পন্ন হওয়ার কথা, গুরুবাক্যে নিষ্ঠা থাকিলে তাহা অতিদ্রুত সম্পন্ন হইতে পারে এবং ঐ প্রকার নিষ্ঠার অভাববশতঃ যে ফল অতি শীঘ্র নিষ্পন্ন হওয়ার কথা তাহার আবির্ভাবেও বিলম্ব হইয়া যায়। দেশ ও কাল উভয়ই কল্পিত, এমন কি কার্যকারণ ভাবও কল্পিত। তীব্র সংবেগ হইলে জগতে অসম্ভব বলিয়া কোন বস্তু থাকে না। অচল বিশ্বাস ও তীব্র সংবেগ মোটের উপর একই কথা। বস্তুতঃ ঐ প্রকার বিশ্বাস থাকিলে গুরুতত্ত্বের বিচারও অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। কারণ, এক অনন্ত চিন্ময়ী মহাসত্তা সর্বত্র ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সরল বিশ্বাসে তাঁহাকে ধরিতে পারিলে সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণের বাকী থাকিল কি? তবে এই জাতীয় বিশ্বাস নিয়া কার্য করা ভাগ্যাধীন। সকলের পক্ষে সব সময়ে ইহা সম্ভবপর হয় না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিষ অমৃত হয়, আবার অমৃতও বিষের কার্য করিয়া থাকে। তাঁহার ইচ্ছা ব্যতিরেকে মূলতঃ বিষ বা অমৃত বলিয়া কিছুই নাই। প্রয়োজন অনুসারে উভয়েরই স্ফুরণ হইতে পারে। যে বিশ্বাসী হৃদয় সরল বিশ্বাসে অমৃতপিপাসু হইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করে সে কখনই প্রতারিত হয় না। জগতে এমন কোন শক্তি নাই যাহা তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারে।

অতএব তোমার প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে শ্রেষ্ঠ অধিকারী পুরুষ নিজের বিকাশ জানিতে চেষ্টা করিবেন না কারণ, তাহাতে চিত্তের উপরে প্রভাব পড়ে বলিয়া চরম সিদ্ধিলাভের পথে বিলম্ব ঘটে। নিজেদের উন্নতি অথবা অবনতি অনুভব করিয়া নির্বিকার থাকিতে পারে এমন সাধক খুবই কম। এই জন্যই জানিবার চেষ্টা না করিয়া সরল বিশ্বাস ধরিয়া থাকাই ভাল। তবে যাঁহারা ততটা ধৈর্যসম্পন্ন নহেন তাঁহারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তির নিকট হইতে কতটা বিকাশ হইয়াছে তাহা জানিয়া লইতে পারেন। তবে এখানেও কথা আছে। শক্তিশালী গুরু যদি শিষ্যের কল্যাণের জন্য তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয় তাহাকে তৎকালে জানাইতে না চাহেন তাহা হইলে কোনও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ তাহা জানিতে সমর্থ হইবেন না। তাহা ছাড়া এখানেও বিশ্বাস বাদ দিলে চলিবে না, কারণ যে যোগ্য পুরুষ নিজে প্রত্যক্ষ দেখিয়া

তোমার বিকাশের বিষয় যদি তোমাকে জানাইয়াও দেন তাহা হইলেই বা তোমার কি লাভ? তুমি তো তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে না। তাঁহার প্রত্যক্ষ সত্য তুমি বিশ্বাস করিয়া গ্রহণ করিলে মাত্র। আরও রহস্যের কথা আছে। তিনি দেখিলেন তোমার আধ্যাত্মিক সম্পদ চারি আনা মাত্র বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং তোমাকে তাহাই বলিলেন। কিন্তু এমন হইতে পারে যে উহার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে উহার দ্বিগুণ মাত্রা বিকশিত হইতে পারে। তুমি কিন্তু ঐ চারি আনার কথা শুনিয়া নৈরাশ্যমগ্ন হইয়া পড়িলে। ইহার ফল এই হইবে যে পরবর্তী দ্রুত উন্নতি যাহা তোমার হওয়ার কথা ছিল তাহা প্রাপ্ত হইতে বহু বিলম্ব হইবে।

আরও একটি রহস্য আছে। সাধক ও যোগীর চরম অবস্থা লাভে প্রভেদ আছে। যোগপথে চলিলে ধৈর্য্যের সহিত সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়। নিজেকে গঠন করিয়া লওয়াই যোগীর লক্ষণ। তাই তাহার পক্ষে নিজের আত্মিক বিকাশের সন্ধান নিতে চেষ্টা না করাই ভাল।

(২) কৃত্রিম ও অকৃত্রিম বৈন্দব দেহে পার্থক্য আছে। আজান-দেবতা ও কর্ম-দেবতার যে পার্থক্য ইহাও কতকটা সেইরূপ। অর্থাৎ কেহ স্বভাবসিদ্ধ ভাবে গুরুদত্ত বীজের অভিব্যক্তির ফলে বৈন্দব দেহ লাভ করিয়া থাকেন। ইহা অকৃত্রিম। কিন্তু যদি কেহ বৈন্দব জগতের কোনও ভুবনের অধিষ্ঠাতার আরাধনাবশতঃ তাঁহার কৃপায় সাময়িক ভাবে বৈন্দব দেহ লাভ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার ঐ দেহপ্রাপ্তি কৃত্রিম। মায়িক দেহে অবস্থান কালে উভয় প্রকার বৈন্দব দেহ প্রাপ্তিই ঘটিতে পারে। যদি অকৃতিম। দেহ প্রাপ্তি হয় তাহা হইলে উহা স্থায়ী হয়। অর্থাৎ দীক্ষাজন্য বৈন্দব দেহ স্থায়ী। এই স্থায়ী বৈন্দব দেহ হইতেই অধিকার আদি ঐশ্বরিক সম্পদের প্রাপ্তি ঘটে। ভুবনেশ্বরের আরাধনাবশতঃ তাঁহার কৃপাতে যে বৈন্দব দেহ লাভ করা যায় তাহা স্থায়ী হয় না। তাহা নিজস্ব নহে, কারণ তাহা বিকাশের পথে উপলব্ধ হয় না। ঐ দেহ দ্বারা মহামায়ার জগতে সঞ্চরণ এবং তদুপযোগী ভোগাদির আস্বাদন হইতে পারে। ইহা আশ্রিত ভাব এবং ইহা নিজের আয়ত্ত নহে। যে খণ্ড কৃপার ফলে কৃত্রিম বৈন্দব দেহ প্রাপ্তি ঘটে তাহার শক্তি ক্ষীণ হইয়া গেলে ঐ দেহসম্বন্ধও তিরোহিত হইয়া যায়। অকৃত্রিম বৈন্দব দেহলাভ অপরা মুক্তির নামান্তর। কিন্তু কৃত্রিম বৈন্দব দেহলাভকে মুক্তি বলা চলে না। তাহার দুইটি কারণ আছে—প্রথম ইহা অস্থায়ী, দ্বিতীয়তঃ ইহাতে ক্রিয়াশক্তির বিকাশ থাকে না।

কৃত্রিম হউক অথবা অকৃত্রিমই হউক মায়িক দেহে অবস্থান কালে বৈন্দব দেহ মায়িক দেহের সহিত অভিন্নভাবে বর্তমান থাকে। অকৃত্রিম বৈন্দব দেহের

সহিত মায়িক দেহের সহাবস্থান মায়িক দেহ থাকা পর্যন্ত বর্তমান থাকে। কিন্তু কৃত্রিম বৈন্দব দেহ অস্থায়ী বলিয়া যতদিন মায়িক দেহ বর্তমান থাকে ততদিন সব সময় ঐ সম্বন্ধ থাকে না। দেহত্যাগের পরও অকৃত্রিম ও কৃত্রিম বৈন্দব দেহের পার্থক্য উপলব্ধিগোচর হয়।

তবে এইখানে একটি রহস্যের কথা আছে। আরাধনার ক্রমবিকাশে উপাসক যদি সালোক্য সারূপ্য প্রভৃতি অবস্থা অতিক্রম করিয়া উপাস্যের সহিত সাযুজ্য লাভ করেন তাহা হইলে কৃত্রিম বৈন্দব দেহ অকৃত্রিম বৈন্দব দেহে পরিণত হইয়া যায়। তখন ঐ সাধককে আর নীচে নামিতে হয় না। তিনি ভুবনেশ্বরের সহিত আবিষ্ট ভাবে সকল কার্যই করিয়া থাকেন। ঐ সময়ে তাঁহার সম্পদ ঐশ্বরিক সম্পদরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। তবে তিনি অংশরূপ, অংশীরূপ নহেন, ইহাই মাত্র প্রভেদ।

অন্যান্য বিষয় পরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

১৭, ৭, ৪৪

৮

সাধনার জন্য এখন বিশেষ উগ্র চেষ্টা না করাই ভাল। সাধনামাত্রই বায়ুঘটিত। এমন কি প্রাণায়ামাদি না করিয়া তীব্রভাবে ধ্যান করিতে গেলেও বায়ুর ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। এখন যথাসম্ভব বায়ুর সাম্যাবস্থা আবশ্যক। এইজন্য নিত্যকার্যের জন্য যতটুকু আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত কোনপ্রকার ক্রিয়া বা চিন্তা আপনার বর্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থায় বর্জনীয় বলিয়া মনে হয়। নিত্যকর্মের সঙ্গে ভক্তিভাব ও আত্মনিবেদনের ভাব মিশাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলে পূর্বোক্ত কর্মাভাবজনিত ত্রুটি অনুভূত হইবে না। একমাত্র তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রকৃতির স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে অভিমানশূন্য দ্রষ্টাভাব স্থিতি হয়। তখন কৃত ও অকৃতকার্যের কোন পার্থক্য থাকে না। কারণ প্রাকৃতিক প্রবাহের চেতন সাক্ষীস্বরূপ বলিয়া যে নিজেকে বোধ করে সে অকর্তা হইয়াও 'কৃৎস্নকর্মকৃৎ' হইয়া পড়ে। জ্ঞান ও কর্মের সম্বন্ধের ইহাই গূঢ় রহস্য। শরীরে বল ও উৎসাহ ফিরিয়া পাইলে নির্দিষ্ট রুটিন অনুসারে চলিতে বাধা হইবে না।

25, 7,
26, 7, 27, 7, 44

১

সদ্‌গুরু লাভের জন্য আপনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। কারণ চিত্তের আত্যন্তিক ব্যাকুলতাই সদ্‌গুরু লাভের অব্যর্থ নিদর্শন। সদ্‌গুরুর কৃপা না হইলে এই জাতীয় ব্যাকুলতা চিত্তক্ষেত্রে উদ্ভূত হয় না। অভাবের তীব্র বোধই স্বভাব প্রাপ্তির পূর্ব সূচনা। আপনি এখনও হয়ত বুঝিতে পারিতেছেন না কবে এবং কিভাবে সদ্‌গুরু লাভ হইবে। কিন্তু যিনি আপনাকে গ্রহণ করিবেন তিনি পূর্ব হইতেই আপনাকে জানেন এবং আপনাকে গ্রহণ করিবার জন্য উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করিয়াছেন। সমগ্র সৃষ্ট জগৎ কালের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং প্রাকৃতিক জগতে কালকে উপেক্ষা করিয়া কোন কার্য করা চলে না। সকল কার্যের জন্যই একটা নির্দিষ্ট সময় আছে। সেই সময়টি সমাগত হইলে কার্যের উৎপত্তির উপযোগী বিভিন্ন কারণসমূহ স্বভাবের নিয়মে আপনা আপনিই সংঘটিত হয়। সুতরাং ধৈর্য অবলম্বন করিয়া কালের প্রতীক্ষা করাই উচিত। ব্যাকুলতা এবং আন্তরিকতার মাত্রাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দূরবর্তী কালও নিকটবর্তী হইয়া আসে। সদাকাঙ্ক্ষা এবং ব্যাকুলতা ভাল জিনিষ কিন্তু চঞ্চলতা ভাল নহে।

একমাত্র ভগবানই সদ্‌গুরু। যিনি তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হন তাঁহাকেও এইজন্যই সদ্‌গুরু বলা হয়। সদ্‌গুরু কোন্ রূপে কাহার নিকট প্রকট হইবেন তাহা ভাবিবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ তাঁহার অনন্তরূপ। যে কোনরূপে তিনি প্রকট হইতে পারেন। কোন রূপকে আশ্রয় না করিয়াও যে তিনি কৃপা করিতে পারেন না এমন নহে। তবে সে নিরাধার মহাকৃপা গ্রহণ করিবার যোগ্যতা এ জগতে কম লোকেরই আছে। এইজন্যই সিদ্ধ নরদেহকে অবলম্বন করিয়াই ভগবানের করুণাশক্তি সাধারণতঃ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীগুরুদেব পূর্বে যেরূপ ছিলেন এখনও তেমনিই আছেন। যোগ্য অধিকারীর সহিত তাঁহার প্রকট সম্বন্ধ এখনও তেমনিই আছে। বরং পূর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। যে সকল গুহ্যতত্ত্ব তিনি দেহে থাকিতে প্রকাশ করেন নাই এখন তাহাও করিতেছেন। ইহাও কালেরই মাহাত্ম্য জানিবেন কারণ, তখন ঐ সকল রহস্য প্রকাশিত করিবার সময় হয় নাই, কিন্তু এখন হইয়াছে।

আপনি যে বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহা জানিতে চেষ্টা না করিয়া নিজেকে সদ্‌গুরুর কৃপাপাত্র করিতে চেষ্টা করুন। আধার নির্মাণ

প্রথমেই আবশ্যক। কারণ কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্তে যে অনন্তের দ্বার খুলিয়া যাইবে তাহা বলা যায় না। কৃপা যখনই আসুক নিজে তাহার জন্য সর্বদাই উন্মুখ হইয়া থাকিতে হইবে। আধ্যাত্মিক জগৎ রহস্যময়। এই রহস্য ভেদ করা লৌকিক বুদ্ধি অথবা বিচার শক্তির অতীত। তবে মহাশক্তির কৃপা পাইলে এই দুর্ভেদ্যরহস্যও সরল হইয়া যায়। কোন তত্ত্বের উপর কোন প্রকার আবরণ আর অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ অন্তর্জগতে প্রবিষ্ট না হওয়া যায় ততক্ষণ রহস্যের সমাধান সম্ভবপর নহে। কৃত্রিম উপায়ে জাল ভেদ করার চেষ্টা করাও উচিত নহে। কারণ তাহার ফল বিষময় হয়।

আপনার বিশেষ কিছু জিজ্ঞাস্য থাকিলে পত্র লিখিবেন। এই সব বিষয় যদি কখনও সাক্ষাৎ হয় তখন বিশেষ ভাবে আলোচনা করা যাইবে।

২৭, ৪, ৪৪

১০

কাল ও ক্ষণের তত্ত্ব সম্বন্ধে দুএকটি কথা সংক্ষেপে তোমাকে বলিতেছি। এই কথাগুলি ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিলে এই দুর্ভেদ্য রহস্যের মধ্যে কতকটা আলোকপাত হইবে এবং পথের সন্ধান বুঝিয়া লইতে কতকটা সাহায্য পাইবে।

কাল সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান সকলেরই আছে। ইহা হইতেই আপাততঃ আলোচনার সূত্রপাত করা চলিতে পারে। যখন বিভিন্ন ঘটনা সংঘটিত হয় তখন তাহাদের মধ্যে কোনটি পূর্ববর্তী এবং কোনটি পরবর্তী এইরূপ পৌর্বাপৌর্যের যে প্রতীতি জন্মে তাহা হইতে কালের ধারণা সাধারণের মনে উদিত হয়। ঘটনাবলীর মধ্যে এই যে পৌর্বাপৌর্য সম্বন্ধ ইহাকে ক্রম বলে। সুতরাং ক্রম যে কালের ধর্ম ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। কোন একটি মনুষ্য দেহের বিকাশের পথে জন্মের পর হইতে—বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য এবং স্থবিরতা কতকগুলি ক্রমবদ্ধ অবস্থা। একই দেহ পর পর এই সকল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিতেছে। এই জন্য বলা হয় দেহ কালের অধীন। অনিত্য বস্তুমাত্রেই সৃষ্টি হইতে বিকাশ পর্যন্ত এই প্রকার একটি ক্রমের ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য তাহাকে পরিবর্তনশীল অথবা

পরিণামী বলিয়া বর্ণনা করা হয়। ইহাই কালের অধীনতা। নিত্য বস্তুতে কালের কোন প্রভাব বর্তমান থাকে না কারণ, যাহা নিত্য তাহা একভাবে চিরদিন প্রকাশমান থাকে। কখনই তাহাতে ভাবান্তর হয় না। ক, খ, গ এইগুলিকে যদি নিত্য বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে 'ক' চিরদিন 'ক' ই আছে, 'খ' চিরদিন 'খ' ই আছে, এবং 'গ' চিরদিন 'গ' ই আছে। 'ক' কখনো 'খ' রূপে, কিম্বা 'খ' কখনো 'গ' রূপে পরিণত হয় না। এই স্থলে বুঝিতে হইবে ক, খ, গ, কালের অধীন নহে কারণ ইহাদের মধ্যে পরস্পর কালগত ক্রমিক কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই।

আমাদের সুপরিচিত দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলার প্রকট স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাতে শ্রীকৃষ্ণে বালভাবই প্রকাশমান। ইহা নিত্য। পক্ষান্তরে তাঁহার কৈশোর লীলাতে তিনি নিত্য কিশোর। অর্থাৎ যিনি নিত্য বালক তিনিই নিত্য কিশোর। তাঁহার বালভাবটিও যেমন নিত্য তেমনি তাঁহার কিশোর ভাবটিও নিত্য। লৌকিক দেহ যেরূপ বালভাব হইতে কিশোরভাবে পরিণত হয় তদ্রূপ অলৌকিক শ্রীকৃষ্ণ দেহ বালভাব হইতে কিশোর ভাবে পরিণত হয় না কারণ তাঁহার বালদেহ এবং কিশোর দেহ উভয়ই যুগপৎ বর্তমান এবং উভয়ই নিত্য। শ্রীকৃষ্ণের বালদেহ পূর্বকালীন এবং তাঁহার কিশোর দেহ পরবর্তী কালের একথা বলা চলে না। গোপালরূপী বালক কৃষ্ণ সহস্রকল্প অতীত হইয়া গেলেও বালকই থাকিবেন, কিশোর বা যুবক হইবেন না। তদ্রূপ অন্যান্য ভাব সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝা যাইবে নিত্য বস্তু কালের অধীন নহে এবং ভিন্ন ভিন্ন নিত্য বস্তুতে কালগত কোন সম্বন্ধ নাই। তবে খেলাচ্ছলে যে কোন প্রকার সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া তদনুসারে বৈচিত্র্যের আস্বাদন করা চলিতে পারে।

কিন্তু রহস্যের কথা এই যে শুদ্ধ জ্ঞানদৃষ্টিতে অনিত্যও মূলত নিত্যেরই কালিক প্রকাশ। সুতরাং যাহাকে আমরা জাগতিক ঘটনা বলি অথবা অনিত্য ব্যাপার বলি তাহার মূলেও নিত্যসত্তা রহিয়াছে। জাগতিক দৃষ্টিতে আমরা যে পূর্ব ও পর বলিয়া বর্ণনা করি তাহা জাগতিক দৃষ্টিতে অপরিবর্তনীয় হইলেও বস্তুতঃ আপেক্ষিক। যাঁহার শুদ্ধ দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছে তাঁহার পক্ষে উহা অপরিবর্তনীয় নহে। দেশগত পরত্ব এবং অপরত্বের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইবে। ক, খ, গ এমন ভাবে উপবিষ্ট আছে যে 'ক' এর পশ্চিমে 'খ' এবং 'খ' এর পশ্চিমে 'গ' এইরূপ বলা যাইতে পারে। এই স্থলে 'ক' 'খ' এর পূর্বে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু 'ক' যদি নিজের স্থান পরিবর্তন করিয়া 'গ' স্থানে উপবিষ্ট হয় তাহা হইলে 'ক' কেও 'খ' এর পশ্চিমে

বলা যাইতে পারে। তদ্রূপ 'গ' যদি স্বস্থান ত্যাগ করিয়া 'ক' স্থানে উপবিষ্ট হয় তাহা হইলে 'গ' কে 'খ' এর পূর্ববর্তী বলা যাইতে পারে। এই প্রকার 'খ' এর স্বস্থান ত্যাগ এবং স্থানান্তর গ্রহণের ফলেও সম্বন্ধের ব্যতিক্রম হইয়া যাইবে। অতএব 'ক' 'খ' ও 'গ' এই তিনটিই যদি স্থির বলিয়া ধরা যায় আর যদি ইহাদের স্বস্থান ত্যাগ সম্ভবপর না হয় তাহা হইলে তাহাদের দেশগত সম্বন্ধ যাহা আছে তাহাই থাকিবে। কিন্তু যদি একটিরও স্থির ভাবের পরিবর্তে গতিমত্তা স্বীকার করা যায় তাহা হইলে সম্বন্ধের পরিবর্তন হইবে। তবে সবগুলি যদি সমরূপে সমবেগে এবং পরস্পরের ব্যবধান রক্ষা করিয়া গতিশীল হয় তাহা হইলে গতিশীলতা সত্ত্বেও সম্বন্ধের পরিবর্তন হইবে না।

দেশগত সম্বন্ধের এই বৈশিষ্ট্য সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে। কিন্তু কালসম্বন্ধে এই প্রকার গতিমত্তার সম্ভাবনা সাধারণ জাগতিক লোকের পক্ষে বিদ্যমান নাই, কারণ সাধারণ লোক স্বীয় স্থিতি পরিহার করিয়া (পূর্ণতঃ অথবা অংশতঃ) স্থিত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে না। একমাত্র যোগীর পক্ষেই তাহা সম্ভবপর। তবে লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাও স্পষ্টীকৃত হইবে। কলিকাতায় যখন সূর্যোদয় ব্রহ্মদেশে তাহার অনেক পূর্বেই সূর্যোদয় হইয়া গিয়াছে কিন্তু কাশীতে তখন সূর্যোদয় হয় নাই। অতএব কলিকাতাবাসীর পক্ষে যেটা উদয়কাল ব্রহ্মবাসীর পক্ষে তাহা পূর্বাহ্ন, এবং কাশীবাসীর পক্ষে তাহা শেষরাত্রি। দেশের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া জাগতিক কালের স্ফূর্তি হয় না। উদয়কাল বলিলেই কোন না কোন দেশকে গ্রহণ করিয়াই উদয়কাল বলিতে হইবে। মধ্যাহ্ন প্রভৃতি কাল সম্বন্ধেও সেই নিয়ম। দেশ সম্বন্ধ বর্জিত উদয়কাল সম্ভবপর নহে। জাগতিক দেশ গতিশীল বলিয়া তাহার উদয়কাল স্থায়ী হয় না। কিন্তু নিত্যধামে বাস্তবিক পক্ষে গতি না থাকার দরুণ সেখানকার প্রত্যেকটি কালই নিত্য অর্থাৎ এমন নিত্য দেশ আছে যাহা স্থির বলিয়া সেখানকার উদয়কালও নিত্য। অর্থাৎ সেখান হইতে সর্বদাই নবোদিত ভাবেই দেখা যায়। সেখান হইতে সূর্যের ঊর্ধ্বগতি অর্থাৎ পূর্বাহ্ণ মধ্যাহ্ন প্রভৃতি কাল কখনই প্রতীতিগোচর হয় না। তদ্রূপ এমন দেশ আছে যেখানে সর্বদাই মধ্যাহ্ন, সেখানে পূর্বাহ্ণ নাই, অপরাহ্ন নাই, রাত্রিও নাই। নিত্যদেশ অনন্ত। দেশভেদে প্রত্যেকটি কালই নিত্য। কিন্তু অনিত্যজগতে গতিশীলতা আছে বলিয়া ব্যবহারিক কোন কালকেই আমার নিত্যরূপে প্রাপ্ত হই না। কিন্তু দেশের গতিশীলতার অনুরূপ গতিশীলতা নিজের মধ্যে আরোপ করিতে পারিলে নিত্যকালের আভাস এই জগতে বসিয়াই প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। নিত্যকালকে নির্বিশেষ বলিয়া মনে করিও না। কারণ নির্বিশেষ কালে উদয়কাল, মধ্যাহ্নকাল অপরাহ্ণকাল এই প্রকার ভেদ থাকে না। আমি সবিশেষ কালের কথাই বলিতেছি। সবিশেষ কালও যে নিত্য

ইহার রহস্য একমাত্র যোগীই ভেদ করিতে পারেন। এই রহস্য ভেদ না করিলে নিত্যলীলার অনুভূতি সম্ভবপর হয় না। কারণ কূটস্থে লীলা নাই। নির্বিশেষ সত্তাতে লীলা নাই। শক্তিহীন স্বরূপে লীলা নাই। এই লীলা আবিষ্কারই যোগের মহিমা।

সূর্যের উদয়কালে 'ক' নামক দ্রষ্টা কলিকাতায় বর্তমান। তাহার পক্ষে উহা প্রাতঃকাল, ছয় ঘণ্টা পরে কলিকাতাস্থ 'ক'র পক্ষে মধ্যাহ্নকাল। কিন্তু ইউরোপের পশ্চিমপ্রান্তে তখন প্রাতঃকাল। কিন্তু 'ক' যদি স্বীয় যোগশক্তি প্রভাবে গতিশীল হইয়া মনোবেগে অর্থাৎ বিদ্যুৎ অপেক্ষাও তীব্রতর বেগে ইওরোপের পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত হয় তখন সে সূর্যের উদয় দেখিতে পাইবে এবং তাহার পক্ষে তখন প্রাতঃকাল। কলিকাতা হইতে তাহার দৃষ্টিকে সঞ্চালিত করিতে পারে না বলিয়া সে মধ্যাহ্নকাল অনুভব করে এবং তখন প্রাতঃকাল অনুভব করিতে পারে না। পৃথিবী অথবা সূর্যের অনুরূপ গতি নিজের মধ্যে বিকশিত হইলে যে কোন বিশিষ্ট কালকে—লৌকিক পরিবর্তিত অবস্থার মধ্যে থাকিয়াই—সর্বদা অনুভব করিতে পারা যায়।

এখানে অনুরূপ গতিশীলতা দ্বারা সবিশেষ কালের নিত্যতা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ইহার মধ্যে আরও সূক্ষ্ম রহস্য আছে। 'ক' স্বীয় যোগশক্তির দ্বারা ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে বিদ্যুৎ বেগে উপস্থিত হইবে একথা বলা হইল কিন্তু জগৎব্যাপী সত্তার সহিত 'ক' যদি নিজেকে যুক্ত করিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে ইউরোপে যাইতে হইবে কেন? কারণ ব্যাপক সত্তা সেখানেও আছে। এবং 'ক' ঐ ব্যাপক সত্তার সহিত যুক্ত বলিয়া ইচ্ছামাত্রই অন্যান্য স্থানের পশ্চিম ইউরোপেও স্ফুরিত হইতে পারে। যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে 'ক' প্রাতঃকালের অনুভব করিবে তাহতে সন্দেহ কি অথচ তাহাকে ইউরোপে যাইতেও হইবে না। এইরূপ অখণ্ড ব্যাপক সত্তাকে আশ্রয় করিয়া সকল প্রকার সবিশেষ কালকেই আস্বাদন করা যাইতে পারে। ব্যাপক সত্তার অংশবিশেষের সহিত দ্রষ্টা বিন্দুর যোগস্থাপনই কোন একটা বিশিষ্ট কালের অনুভূতির মূল।

অতীত অনাগত ও বর্তমান এই ত্রিকালের সহিত সাধারণতঃ সকলেই পরিচিত আছে, কিন্তু বস্তুতঃ এক অনন্ত বর্তমান রূপে মহাকালই আছে —অতীত ও অনাগত অব্যক্ত রূপে রহিয়াছে। বর্তমানের প্রকাশ আবরণ-শূন্য হইলে সর্বদেশ যুগপৎ অভিন্নরূপে স্ফুরিত হয় বলিয়া অতীত ও অনাগত থাকে না। একমাত্র মহাবর্তমানই বিদ্যমান থাকে। এই মহা-বর্তমানই যোগীর ক্ষণ। ইহাকেই সন্ধিক্ষণ বলে। ভূত ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলে উহাকে উপলব্ধি করিতে হয়। যোগী ভিন্ন কেহই ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে পৃথক করিয়া এই অন্তরালবর্তী ক্ষণকে গ্রহণ করিতে পারে না। বস্তুতঃ

গ্রহণ সকলেই করে কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া লক্ষ্য করিতে পারে না। ক্ষণের সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে, পরে বলিব।

২৮, ৭, ৪৪

১১

গতকল্য কালসম্বন্ধে যতটা আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে কাল-রহস্য সম্বন্ধে একটা আভাস জ্ঞান তোমার হইয়া থাকিবে।

জাগতিক সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মূলে যেমন কাল, ঠিক সেই প্রকার আমাদের জ্ঞানের মূলেও কাল। কালগত সমসূত্রতা না থাকিলে দ্রষ্টা দৃশ্যকে দর্শন করিতে পারে না এবং ভোক্তাও ভোগ্য ভোগ করিতে পারে না। কাল যে আপেক্ষিক ইহা বুঝিতে অধিক সূক্ষ্ম চিন্তার আবশ্যকতা হয় না। সুতরাং দ্রষ্টা ও দৃশ্য—একই আপেক্ষিক কালে বর্তমান থাকিলে দর্শন ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতে পারে। দ্রষ্টা শুদ্ধ অবস্থায় সর্বদাই বর্তমান কালেই স্থিতি করেন। দৃশ্য বর্তমান থাকিলে, অর্থাৎ অভিব্যক্ত থাকিলে, এবং দ্রষ্টারূপী বিন্দুর সহিত তাহার সম্বন্ধ হইলে দর্শন ক্রিয়া নিষ্পন্ন না হইয়া পারে না। দৃশ্য বর্তমান থাকিলে নিত্য বর্তমান দ্রষ্টারূপী বিন্দুর সহিত তাহার সম-সূত্রতা স্বাভাবিক। কিন্তু তাদৃশ সমসূত্রতা সত্ত্বেও গণ্ডীবদ্ধ দ্রষ্টার পক্ষে দৃশ্য দর্শন না হইতে পারে। এই জন্যই দ্রষ্টারূপী বিন্দুর সহিত সম্বন্ধ আবশ্যক। নতুবা দ্রষ্টার দৃষ্টিগোচর হইয়াও পূর্বোক্ত দৃশ্য লক্ষীভূত হয় না। অর্থাৎ দৃষ্টির সম্মুখে মহাসামান্যরূপে দৃশ্য বর্তমান থাকে—তাহার বিশিষ্ট রূপ স্ফুরিত হয় না। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে কালের পার্থক্য থাকিলে ঐ দৃশ্য দ্রষ্টার অদৃষ্ট থাকিয়া যায়। কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক ঐ দৃশ্যের সত্তাকে আভাসরূপে দ্রষ্টার দৃষ্টির নিকট উপনীত করিতে পারিলে—দৃশ্য বর্তমান হয় বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়। দৃশ্য বস্তুতঃ দ্রষ্টার নিকট আসে না, আভাসটাই আসে। পক্ষান্তরে দ্রষ্টা যদি তাহার দৃক্‌শক্তিকে আভাস-রূপে দৃশ্যের নিকট প্রেরণ করিতে পারে তাহা হইলেও দ্রষ্টার আভাস-দৃষ্টিতে আলোকিত হইয়া দ্রষ্টার নিকট দৃশ্যের স্ফুরণ হয়। দ্রষ্টা দ্রষ্টাই থাকেন এবং তাহার দৃক্‌শক্তিও বর্তমানকে ত্যাগ করে না, তথাপি বিক্ষেপ-বৃত্তির সহায়তায় দৃক্‌শক্তির আভাসটা সঞ্চারিত হইতে পারে না। এই উভয় প্রকার আভাসের সঞ্চারের মূলে ঐশী শক্তির ক্রিয়া রহিয়াছে, যাহা দ্রষ্টা এবং দৃশ্য উভয়ের অধিষ্ঠাতা।

এই প্রসঙ্গে সূক্ষ্ম আলোচনার পূর্বে দেশের সহিত কালের সম্বন্ধের আলোচনা করা একটু আবশ্যক। আমরা প্রচলিত ব্যবহারে যে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই প্রকার যুগভেদ নির্দেশ করিয়া থাকি ইহা কালের অবরোহিণী ধারার নিদর্শন। বিপরীত ক্রমে আরোহিণী ধারাও বুঝিতে হইবে। মনে কর এই অবরোহ ক্রম বুঝিবার জন্য মাত্রাগত ভেদ অনুসরণ করিয়া ১৬, ১৫, ১৪, ১৩ ইত্যাদি ক্রমে আমরা সংখ্যা বিন্যাস করিতেছি। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সত্যযুগের আদি বিন্দুতে ষোড়শমাত্রার পূর্ণ প্রকাশ ছিল। এই প্রকাশ ১৬শ হইতে ১৩শ মাত্রা পর্যন্ত সত্যযুগের সীমা বলিয়া ধরিতে হইব। ইহা অবশ্য দৃষ্টান্তের দ্বারা স্পষ্টীকরণের জন্য বলা হইতেছে। তদ্রূপ ১২শ মাত্রা হইতে ৯ম মাত্রার অন্তিম অণু পর্যন্ত ত্রেতা বলিয়া পরিগণিত হয়। ৮ম মাত্রা হইতে ৫ম এর নিম্নতম অণু পর্যন্ত দ্বাপর এবং ৪র্থ হইতে শূন্যের পূর্বাবস্থা পর্যন্ত কলি পদবাচ্য। এই যে কালের স্রোত, ইহা ১৬ হইতে অর্থাৎ পূর্ণ হইতে এক হইয়া শূন্যের দিকে নিরন্তর ধাবিত হইতেছে। কিন্তু কাল আপেক্ষিক, ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং বিশিষ্ট দেশের সম্বন্ধ বর্জন করিয়া এই কালপ্রবাহ বুঝিতে পারা যায় না। যেমন সূর্য উদয়কাল হইতে পুনরুদয় কাল পর্যন্ত আবর্তিত হইতেছে, এরূপ ধরিয়া লওয়া যায়, কিন্তু তথাপি সূর্যের উদয়কাল অথবা পূর্বাহ্ণ প্রভৃতি অন্য কোনও কালবিশিষ্ট দেশের সম্বন্ধ-মূলেই বুঝিতে হইবে। দ্রষ্টা নিরাধার নহে, সে যে আধার অথবা ভূমিকে আশ্রয় করিয়া দৃষ্টি করিতেছে তদনুসারেই উদয়কাল অথবা পূর্বাহ্ণকাল প্রভৃতির ব্যবহার সিদ্ধ হয়। কারণ, দ্রষ্টা এক ভূমিতে থাকিলে যাহা উদয়কাল, অন্য ভূমিতে থাকিলে তাহাই অস্তকাল হওয়া বিচিত্র নহে। কালের স্রোতের রহস্য বুঝিতে হইলেও বিশিষ্ট দেশের সম্বন্ধ পূর্বেই বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

পূর্বোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারিবে যেমন এইখানে যখন সন্ধ্যা তখন অন্যখানে প্রভাতাদি অন্যকাল বর্তমান। তদ্রূপ এইখানে যখন কলিযুগ তখন অন্যখানে সত্য, ত্রেতা বা দ্বাপর, অর্থাৎ অন্য কোন যুগ বর্তমান আছে। অতএব কলি বলিলেই যে সর্বত্রই সমরূপে কলির প্রভাব তাহা নহে। কোন স্থানে এখনও সত্যযুগ, কোন স্থানে ত্রেতাযুগ এবং কোন স্থানে দ্বাপরযুগ চলিতেছে। কলিযুগের মধ্যেও অবান্তর ভেদ বুঝিতে হইবে। এই বিশাল জগতের মধ্যে এমন স্থান আছে যেখানে এখন সত্য অথবা ত্রেতা অথবা দ্বাপর যুগ চলিতেছে অর্থাৎ একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন যুগ রহিয়াছে। সেজন্য এক যুগের লোক অন্য যুগের সন্ধান পায় না এবং যে সব স্থানে ঐ সকল যুগ ক্রিয়া করিতেছে সে সকল স্থানেরও সন্ধান পায় না। এইজন্যই পূর্বে বলিয়াছিলাম—দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়ে কালগত সমসূত্রতা না থাকিলে দর্শন হয় না।

উপরে লিখিত বিবরণ হইতে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা আরও বুঝিতে পারিবে যে আধারগত ভেদ অথবা বৈচিত্র্য শুধু দেশেই নিবদ্ধ নহে—ইহা প্রত্যেক ব্যক্তিতে পর্যবসিত হইয়াছে। কারণ, প্রত্যেক মনুষ্যের দেহই তাহার কর্মভূমি। একই স্থানে, একই দেশে নগরে অথবা গ্রামে দুইটি লোক ঠিক একই কালে বাস করে না। উভয়ের মধ্যে কালগত বৈষম্য থাকে। এইজন্যই প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই প্রত্যেক ব্যক্তি রহস্যময়। উভয়ের পরস্পর ব্যবধান কালসাম্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তিরোহিত হওয়া সম্ভবপর নহে। ভোগগত সমসূত্রতার কথা পরে আলোচনা করিব।

১২. ৮. ৪৪

১২

যাহা লিখিয়াছেন আমার মনে হয় তাহা সম্পূর্ণই ঠিক। তিনি যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহাও ঠিক, তবে এই বিষয়ে যে মতভেদ লক্ষিত হয় তাহার কারণ সাধকের ব্যক্তিগত সংস্কারের বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ সকল মতই ঠিক। তবে রহস্যটা ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া লইতে পারিলে সাধকের বিভিন্নপ্রকার অনুভূতির আপেক্ষিক স্থাননির্দেশ সহজসাধ্য হয়। এই সম্বন্ধে আমি নিজে যাহা সাক্ষাৎভাবে বুঝিতে পারিয়াছি তদনুসারে দু-একটি কথা বিষয়টি স্পষ্ট করিবার জন্য উল্লেখ করিতেছি।

বিন্দু হইতে নাদ উত্থিত হয় এবং প্রত্যাবর্তন ক্রমে বিন্দুতেই নাদের লয় হয়। ইহা স্বাভাবিক ক্রম। এই ক্রমকে আশ্রয় করিয়া মহাযোগিগণ নিজের পরমলক্ষ্য অনুসরণ করিয়া আপন আপন ধাম অথবা পরম পদে আপন আপন স্থিতি নিরূপণ করিয়া থাকেন। বিন্দুতে চিৎশক্তির আঘাত না পড়িলে বিন্দু কম্পিত হইতে পারে না, এবং বিন্দু কম্পিত না হইলে শব্দের উদয় হওয়া অসম্ভব। অখণ্ড দ্রষ্টার দৃষ্টির সম্মুখে যে স্বচ্ছ পরমাকাশ বিদ্যমান রহিয়াছে যখন ঐ দৃষ্টি ক্রিয়াত্মক হইয়া ঐ আকাশকে স্পর্শ করে তখন উহার যোগে আকাশ স্পন্দিত হইয়া থাকে। আকাশের স্পন্দন এবং নাদের উত্থান একই কথা। এই উত্থিত নাদই অভিব্যক্ত চৈতন্য এবং দ্রষ্টার দৃষ্টি যে সক্রিয়রূপে আকাশে পতিত হয় তাহা অব্যক্ত চৈতন্য। অব্যক্ত চৈতন্যের দুইটি দিক আছে, একটি সক্রিয় or dynamic এবং অপরটি নিষ্ক্রিয় or static, এই দুইটি দিকের অন্তরালে মহা ইচ্ছার সত্তা বিদ্যমান। ইচ্ছার প্রভাবেই নিষ্ক্রিয় শক্তি ক্রিয়ারূপে

ধারণ করিয়া থাকে। শক্তি যতক্ষণ ক্রিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ না করে ততক্ষণ বাহ্য সত্তার উপর তাহার প্রভাব অনুভূত হয় না।

বিন্দুক্ষুব্ধ হইয়া নাদের অভিব্যক্তি হয় ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। এই নাদ সৃষ্টির অন্তর্গত অথচ সৃষ্টির আদিভূত মহানাদ। ইহাই জ্যোতিস্বরূপে প্রকাশমান হইয়া পূর্ববর্ণিত বিক্ষোভের ক্রমিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পর পর বিভিন্ন স্তরের বিকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু যে ক্রিয়ারূপা শক্তি বিন্দুতে পতিত হইয়া বিন্দুকে স্পন্দিত করিতেছে অনেকে তাহাকেও নাদরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। মহানাদ হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিবার জন্য তাহাকে পরনাদ বলিয়া বর্ণনা করা চলে। উহা অব্যক্ত চৈতন্য স্বরূপ। মহানাদ জগৎ সৃষ্টির আদি এবং মূলীভূত। কিন্তু পরনাদ সৃষ্টির আদিরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য নহে। উহা অনাদি চৈতন্য প্রবাহ।

বিন্দু যখন বিভক্ত হইয়া ঊর্দ্ধবিন্দু এবং অধোবিন্দুরূপে পরিণত হয় তখন ঐ নাদরূপী অবিচ্ছিন্ন স্রোতই উভয়ের মধ্যে যোজক সূত্ররূপে বর্তমান থাকে। অধোবিন্দু হইতে যে ধারা নির্গত হয় তাহা ঊর্দ্ধবিন্দুতে পরিসমাপ্ত হয়, এবং ঐখান হইতে যে ধারা নিঃসৃত তাহা অধোবিন্দুতে পরিসমাপ্ত হয়। অধোমুখী ধারা এবং ঊর্দ্ধমুখী ধারা উভয়েই স্বরূপতঃ একই শক্তির ধারা। তথাপি উভয়ের পার্থক্য রহিয়াছে। অধোধারাতে চৈতন্যের উপলব্ধি পাওয়া যায় না অথচ এই ধারাও চৈতন্য শক্তিরই ধারা। এই ধারাকে আশ্রয় করিয়াই সৃষ্টিমুখে অনন্ত শক্তির স্তর, লোক লোকান্তর এবং দেহবিশিষ্ট জীবরাশি অবিরাম প্রবাহে নিরন্তর আবির্ভূত হইতেছে। অধোবিন্দু ভেদ করিয়া যখন এই ধারার আভাস বহিঃনিসৃত হয় তখনই সাংসারিক প্রপঞ্চ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এইটিকে অজ্ঞানের ধারা বলা চলে। কিন্তু যেটি ঊর্দ্ধমুখী ধারা সেইটি অজ্ঞানের ধারা নহে। তাহা জ্ঞানের ধারা। যদিও চৈতন্যরূপা শক্তি উভয়ত এক ও অভিন্ন তথাপি জ্ঞানের ধারাকে আশ্রয় না করিয়া ঊর্দ্ধবিন্দুকে পুনর্বার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অধোবিন্দু হইতেও যেমন ধারার বিকিরণ আছে যাহার ফলে সাংসারিক প্রপঞ্চের উদ্ভব হয় তদ্রূপ ঊর্দ্ধবিন্দু হইতেও ধারার নির্গম আছে—যাহার ফলে পরমধামের স্ফুরণ হয়। বস্তুতঃ পরমধাম এবং সংসার একই অখণ্ড পদার্থ। বিন্দুর বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছে। এই ব্যবধানের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে ঊর্দ্ধবিন্দু এবং অধোবিন্দু একত্র মিলিত হইয়া এক অখণ্ড বিন্দুরূপে স্থিত হয়। অর্থাৎ বিসর্গরূপী বিন্দুদ্বয় মহাবিন্দুরূপী অদ্বৈত বিন্দুতে পর্যবসিত হয়। তখন অখণ্ড পরমতত্ত্বে অধিষ্ঠিত তত্ত্বাতীত আত্মপ্রকাশ করেন। আপাততঃ অধোবিন্দুকে মূলাধারস্থ ত্রিকোণের মধ্যবিন্দু এবং ঊর্দ্ধবিন্দুকে সহস্রদল কমলস্থিত ত্রিকোণের কর্ণিকারূপী মধ্যবিন্দু বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুতরাং মূলাধার হইতে উত্থিত হইয়া নাদস্রোতঃ স্বভাবতঃই

সহস্রারে বিলীন হয়, ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। মূলাধারের বিন্দুটি নিজেকে বিভক্ত করিয়া খণ্ডরূপে পাঁচটি পৃথক বিন্দুর সৃষ্টি করে। এই পাঁচটি বিন্দুই সৃষ্টিপথে পাঁচটি চক্রের কেন্দ্রস্বরূপ হয়। এই পাঁচটি কেন্দ্রের সহিত শাস্ত্রীয় পঞ্চভূত এবং পঞ্চগুণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত সংস্কারের মাত্রা এবং জ্ঞানাদি শক্তির বিকাশের তারতম্যানুসারেও ৫০টি বিন্দুর আপেক্ষিক পরত্ব এবং অপরত্ব নিরূপিত হয়। সুতরাং কোন বিশিষ্ট সাধক তাঁহার আধ্যাত্মিক স্থিতি অনুসারে নিজের অনুরূপ বিন্দু বা কেন্দ্র হইতেই নাদের উত্থান অনুভব করিবেন। অধঃস্থিত চক্র এবং কেন্দ্র তাঁহার পক্ষে কার্যশীল নহে, বস্তুতঃ এইগুলি শূন্যরূপে পরিণত। বলা বাহুল্য প্রত্যেকটি বিন্দুই আধার-বিন্দু। ঐ স্থানে যে নাদরূপী চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়, তাহা নিরাধার চৈতন্য নহে। অর্থাৎ তাহা সবিকল্পক জ্ঞানেরই প্রকারভেদ। আজ্ঞাচক্রের নিম্নস্থ ৫টি চক্রই পূর্বোক্ত পঞ্চবিন্দুর প্রসার ক্ষেত্র। আজ্ঞাচক্রের সহিত পূর্বোক্ত ৫টি চক্রের প্রত্যেকটির পৃথক্ পৃথক্ সম্বন্ধ রহিয়াছে। তদ্রূপ আজ্ঞাচক্রস্থিত বিন্দু এবং পূর্বোক্ত বিন্দুপঞ্চকের প্রত্যেকটি বিন্দু পরস্পর সংশ্লিষ্ট। ৫টি চক্রের যাবতীয় ক্রিয়ার প্রতি ক্রিয়াই আজ্ঞাচক্রে পাওয়া যায়। সুতরাং এক হিসাবে আজ্ঞাচক্রস্থিত বিন্দুকে মুখ্য বিন্দুও বলা যাইতে পারে। তবে ইহা নিশ্চিত যে পঞ্চভূতের শুদ্ধি ব্যতিরেকে চিত্তশুদ্ধি হয় না এবং চিত্তশুদ্ধি ব্যতিরেকে পঞ্চভূতের শুদ্ধিও হয় না। অনুষ্ঠানকালে গুণ প্রধানভাবে থাকিলেও চরম অবস্থায় সম্যক্ ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি যুগপৎ সম্পন্ন হয়। অতএব ষট্চক্রের ছয়টি বিন্দুই বস্তুতঃ সহস্রারগামিনী মহানদীর ছয়টি পৃথক পৃথক ঘাট। কোন্ ঘাট হইতে কাহার পক্ষে ঊর্ধ্বস্রোতের আশ্রয় গ্রহণ সহজ তাহা ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও অধিকারের উপর নির্ভর করে।

এইস্থানে মুখ্য চিন্তনীয় বিষয় এই যে, যে ধারা অবতরণকালে জ্ঞানহীন জড়শক্তির ধারারূপে বর্ণিত হয় তাহাই উত্থান কালে চৈতন্যের ধারারূপে গৃহীত হওয়ার যোগ্য হয় কেন? এই প্রশ্নের মুখ্য সমাধান—মনঃসংযোগ। অজ্ঞাতসারে শব্দের যে ধারা ঊর্ধ্ববিন্দু হইতে বহিয়া চলিয়াছে তাহার সঙ্গে মনকে যুক্ত করিতে পারিলেই ঐ ধারা জ্ঞানের গোচর হয়। শুধু তাহাই নহে উহা জ্ঞান বা চৈতন্যের ধারারূপে পরিণত হইয়া পুনর্বার ঊর্ধ্বমুখে চলিতে বাধ্য হয়। এই যে মনের যোগ ইহা কোথায় অর্থাৎ কোন্ ঘাটে সম্পন্ন হইবে তাহা নির্ভর করে মনের আপেক্ষিক স্থিতির উপর। যাহার মন অত্যন্ত অধিক স্থূল সংস্কারসম্পন্ন এবং অধোদেশে অবস্থিত, সে অধো-দেশেই ঐ ধারাকে প্রাপ্ত হয় এবং ঐ স্থানেই মনের সহিত ধারার যোগ হয়। তাহার পর ধারা ঊর্ধ্বগামী হয়, সঙ্গে সঙ্গে মনও যুক্ত আছে বলিয়া ঊর্ধ্বগামী হইতে থাকে। কিন্তু যাহার মন জন্মান্তরীণ সাধনাভ্যাসের ফলে অথবা

ভগবৎকৃপায় কিম্বা মহাপুরুষের অনুগ্রহে অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ এবং ঊর্দ্ধস্তরে অবস্থিত তাহার পক্ষে ঐ ধারার সহিত সংযোগ কতকটা ঊর্দ্ধপ্রদেশেই হইয়া থাকে। মোটামুটি ইহাই সাধারণ নিয়ম। সুতরাং সাধারণ অবস্থায় সর্বনিম্ন কেন্দ্রেই যে মনের সহিত ধারার যোগ হইবে তাহা স্বাভাবিক, কিন্তু সকলেরই যে এরূপ হইবে এমন কোন কথা নাই। কারণ সকলের মন তো একঘাটে অবস্থিত নহে।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে মন যখন সকলেরই চঞ্চল এবং, একাগ্র বা স্থির, মন ভিন্ন স্রোতের সহিত যোগ হওয়া সম্ভবপর নহে তখন মনের এই আপেক্ষিক স্থিতি নির্দেশের সার্থকতা কি? ইহার উত্তর এই যে মন চঞ্চল হইলেও যখন ঐ চঞ্চলতা দূরীভূত হয় তখন মনের স্থিতি সমরূপেই সকলেরই হয় সত্য, কিন্তু উহা একস্থানে হয় না। সংস্কার বা বাসনার ক্রমশুদ্ধির প্রভাবে মনের স্থিতি ক্রমশঃ ঊর্দ্ধপ্রদেশে হইতে থাকে। অতএব চঞ্চল মন স্থির হলেই এই মনের শুদ্ধতার তারতম্য অনুসারে শূন্যের প্রদেশবিশেষে মন স্থিতি লাভ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য এই স্থিতিস্থান হইতেই তাহার ঊর্দ্ধমুখ গতি আরম্ভ হয় অর্থাৎ নাদস্রোতের সহিত মনের যোগ সিদ্ধ হয়।

মনের স্থিতি একমাত্র হৃদয়েই হইয়া থাকে। হৃদয় শূন্য প্রদেশের নাম, যেখানে বায়ুর ক্রিয়া নাই এবং মনোবহা প্রাণবহা নাড়ীর সম্বন্ধ নাই। এই বিরাট শূন্যপ্রদেশে কোনপ্রকার তারতম্য না থাকিলেও সূক্ষ্ম তারতম্য রহিয়াছে। যেটি ইহার কেন্দ্রস্থান তাহাই মহাশূন্য। তাহাতে সংস্কার বা বাসনা সূক্ষ্মভাবেও কার্য করে না। তদ্‌তিরিক্ত সমগ্র শূন্য প্রদেশ মধ্যবিন্দু হইতে ব্যবধানের মাত্রানুসারে অল্পাধিক সূক্ষ্ম সংস্কারবিশিষ্ট। অতএব যাহার মন যতটা শুদ্ধ অর্থাৎ সংস্কারমুক্ত সে মনের স্থিরতা সময়ে ঐ শূন্য প্রদেশের তদনুরূপ স্থানেই স্থিতি লাভ করিয়া থাকে। মহাশূন্যে স্থিতি মহাযোগী ভিন্ন কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। নাদের ঊর্দ্ধমুখ প্রবাহ ঐ বিশিষ্ট শূন্য প্রদেশ হইতেই উত্থিত হয়। মহানাদের প্রবাহ মহাশূন্য হইতে উত্থিত হয়। এইখানে যাহা বলা হইল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে মূলাধারাদি যে কোন ঘাটেই থাকুক না কেন, থাকে বস্তুতঃ ঐ হৃদয়াত্মক শূন্য প্রদেশের স্থল বিশেষে। অবশ্য তেমন অধিকারী হইলে কেন্দ্র বা মহাশূন্যেও যে মনের স্থিতি না হইতে পারে এমন নহে। এইজন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

> হৃচ্চক্রাদুত্থিতা সূক্ষ্মা শশিস্ফটিকসংনিভা।
> লেখাকারা নাদরূপা প্রশান্তা চক্রপংক্তিগা।
> দ্বাদশান্তে নিরূঢ়া সা সৌষুম্নে ত্রিপথান্তরে।
> তত্র হৃচ্চক্রমাপূর্য জপেন্মন্ত্রং জ্বলৎপ্রভম্॥

শক্তির ধারাটি যেখান হইতে উত্থিত হয় পুনর্বার সেইখানে যাইয়া উহা লীন হয়। ইহা স্বভাবের নিয়ম। কিন্তু মনের সঙ্গে যোগ না হইলে এই প্রত্যাবর্তনটি অলক্ষ্যপথে সম্পন্ন হয়। সৃষ্টি ও তদনন্তর সংহার অজ্ঞানের রাজ্যে এইভাবেই পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতেছে। কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে এই সৃষ্টি-সংহার চক্রের অতীত হইয়া সাক্ষীস্বরূপে অবস্থান করা যায়। কিন্তু তাহা চৈতন্যের উপলব্ধি ব্যতিরেকে হইতে পারে না। অর্থাৎ শক্তিধারার সঙ্গে মনের যোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধারা উজানে বহিতে থাকে। নাদরূপে ঐ ধারার উপলব্ধি হয়। নাদাবস্থা প্রাপ্তি বিন্দু ভাবের পূর্ব সূচনা। বিন্দুর বিক্ষিপ্ত অংশই নাদ। সুতরাং যখন এই বিক্ষিপ্ত অংশরূপী নাদ ঊর্দ্ধ আকর্ষণের প্রভাবে ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া অর্থাৎ একাগ্রতার পূর্ণ বিকাশে বিন্দুরূপ ধারণ করে তখনই চৈতন্য বা উপলব্ধি কেন্দ্র প্রাপ্ত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই আত্মজ্ঞানের নামান্তর। নাদের যেমন তারতম্য আছে অথচ মহানাদরূপে সবই এক তদ্রূপ আত্মজ্ঞানেরও তারতম্য আছে—তথাপি সকল তারতম্যের মধ্যেও স্বয়ংপ্রকাশ শুদ্ধ আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধি এক ও অভিন্ন। এই জন্যই মহাশূন্য হইতেই মহাজ্ঞানের মার্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং মহানাদই এই মার্গে ঊর্দ্ধগতির সূচনা করিয়া থাকে।

19. 8, 44

১৩

স্থূলভাবে অধ্যাত্ম বিকাশের ক্রম এই: (১) কর্মাভ্যাস—ইহার বিস্তারিত বিবরণ এখানে দিলাম না।

(২) যথাবিধি কর্ম করিতে করিতে চিত্তক্ষেত্র অর্থাৎ হৃদয় শুদ্ধ হয়। আকাশ হইতে মেঘ সরিয়া গেলে যেমন শুদ্ধ নীলাকাশ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় ঠিক তদ্রূপ হৃদয় হইতে সংস্কারমল তিরোহিত হইলে হৃদয়টিও স্বচ্ছ আকাশের ন্যায় প্রকাশমান হয়।

(৩) ইহার পর স্বচ্ছ হৃদয়াকাশে সূর্যোদয়ের ন্যায় ইষ্টস্বরূপ উদিত হয়। তখন ইষ্টের আলোকে সমগ্র আকাশ আলোকিত হয়। ইহারই নাম হৃদয়ে ইষ্ট দর্শন।

(৪) নিরন্তর এই ইষ্ট দর্শন হইতে থাকিলে দীর্ঘকাল পরে ইহা হৃদয়ে স্থিতিলাভ করে। বস্তুতঃ এই অবস্থা সাধকের ইষ্টলোকে স্থিতিরই নামান্তর।

(৫) এই স্থিতির পর হৃদয়স্থিত ইষ্ট হইতে তাহার একটি আভাস স্ফুরিত হইয়া বাহিরাকাশে প্রকাশিত হয়। তখন অন্তরাকাশের ন্যায় বাহিরাকাশেও অবাধিত রূপে ইষ্টদর্শন হইয়া থাকে। এই ইষ্টরূপ বাহ্য কোন পদার্থের সহিত সংসক্ত অর্থাৎ জড়িত রূপে প্রকাশিত হয় না। ইহা নির্লিপ্তভাবে বাহ্যাকাশে দৃশ্যমান হয়। কোন বস্তুর সহিতই ইহার যোগ আছে বলিয়া প্রতীতি হয় না।

(৬) ইহার বাহ্যপদার্থের প্রত্যেকটিতেই জড়িতরূপে ইষ্ট সাক্ষাৎকার হয়। তখন দেখিতে পাওয়া যায় যে কোন দিকে দৃষ্টি পতিত হউক্—তাহাই যেন ইষ্টের আসন অথবা অধিষ্ঠান। ইষ্টরূপই তখন মুখ্য, পদার্থের রূপটি তখন গৌণ। 'যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে।'

(৭) ইহার পর বাহ্যরূপটির গৌণভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং সেই অনুপাতে ইষ্টের রূপ প্রাধান্য লাভ করে। চরমাবস্থায় শুধু ইষ্টের রূপই থাকে, বাহ্যরূপ আর থাকে না। ইহাই কৈবল্যাবস্থা। সাধক দ্রষ্টারূপে স্থিতি লাভ করেন।

(৮) এই ইষ্টরূপ দৃক্‌শক্তির দ্বারা ভিন্ন হইলে ইহার মধ্যে জগতের যাবতীয় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাকে বিশ্বরূপ দর্শন বলে। একমাত্র ইষ্টরূপেই অনন্ত জগৎ প্রতিভাসমান হয়। তখন বুঝিতে পারা যায় ঐ এক ইষ্টই যেন ইষ্ট থাকিয়াও অনন্ত আকারে প্রকাশমান হইয়াছেন। বলা বাহুল্য এই অনন্তরূপ চিন্ময়। কারণ ইহা ইষ্টের স্বরূপ-দর্শনের পর আবির্ভূত। ইষ্টের স্বরূপ দর্শন হইলে অচিদংশ অবশিষ্ট থাকিতে পারে না।

(৯) ইহার পর ইষ্টরূপ তিরোহিত হইয়া যায়। তখন অনন্তরূপেই ইষ্ট থাকেন। ইষ্টের পৃথক সত্তা থাকে না। ইহাই পূর্ণত্ব বা নির্গুণ ব্রহ্মাবস্থা। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে। দ্রষ্টা কিন্তু সূক্ষ্মভাবে তখনও থাকে।

(১০) ইহার পর ইষ্ট বা ব্রহ্ম সাধকের আত্মস্বরূপে প্রতিভাসমান হন। ইহাই সর্বাত্মভাব। এই অবস্থায় সর্বত্রই নিজেকে দেখা যায়। বেশ অনুভব করিতে পারা যায় আমিই সব হইয়া আছি এবং খেলা করিতেছি। ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলিয়া কোন পৃথক বস্তু তখন থাকে না।

(১১) ইহার পর সবের বোধ থাকে না। একমাত্র আমিই আছি—অখণ্ড অব্যক্ত অনন্ত আমি। ইহাই থাকে—দ্বিতীয় কিছুই নাই। এইটি চিদানন্দঘন অবস্থা।

(১২) ইহার পর এই মহান্ আমিও থাকে না। সে অবস্থাকে চিদানন্দ বলা যায় না, পূর্ণ অহং বলা যায় না, পরব্রহ্ম বলা যায় না। কারণ উহা

অনন্তের অতীত, ভাষা দ্বারা তাহার প্রকাশ করা চলে না। ইহাও স্বয়ং-প্রকাশ অবস্থা। এই অবস্থার বিশ্লেষণ এখানে করা হইল না। ইহারও অনন্ত বৈচিত্র্য আছে। ইহাই প্রকৃত অদ্বৈতাবস্থা।

(১০) ইহারও পরাবস্থা আছে।

৩০. ৯, ৪৪

১৪

জপ সম্বন্ধে আপনার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে দিতেছি। উত্তর লিখিবার পূর্বে আনুষঙ্গিক দুই একটি বিষয়ে আলোচনা আবশ্যক।

জপ ও ধ্যান এ দুইটির পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে সাধকের অধিকারভেদ-বশতঃ মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও পক্ষে জপের পর ধ্যান অনুষ্ঠেয়, আবার অন্যের পক্ষে ধ্যান না করিয়া জপে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে। জপের উদ্দেশ্য আমন্ত্রণপূর্বক আকর্ষণ। অর্থাৎ ইষ্টকে ভাবনা। জপের বিষয় নাম অথবা বীজ যাহাই হউক না কেন, উহা যে সিদ্ধ শব্দের অন্তর্গত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নাম ও নামীর সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য। এইজন্য প্রাচীন ঋষিগণ শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধকে বাচ্য ও বাচক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নামকে আশ্রয় করিতে পারিলে নামীর আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। এই যে নামের আশ্রয়ের কথা বলা হইল, বীজ সম্বন্ধেও ঐ একই তত্ত্ব জানিতে হইবে। নাম ও বীজের পরস্পর পার্থক্য সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিবার নাই।

নাম অথবা বীজ যাহাই হউক উভয়ই শব্দাত্মক। এই শব্দ কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে উত্থিত হয়। কুণ্ডলিনী শক্তি চিদাকাশ স্বরূপ মহামায়ার নামান্তর। যখন সদ্‌গুরুর কৃপাকটাক্ষপাতবশতঃ অর্থাৎ চিৎশক্তির উন্মেষবশতঃ কুণ্ডলিনী ক্ষুব্ধ হন, অর্থাৎ স্পন্দিত হন, তখন মহানাদের আবির্ভাব হয়। মন্ত্রাদি শুদ্ধ শব্দমাত্রই মহানাদের প্রকারভেদ অর্থাৎ এক মহানাদই ব্যক্তিগত সংস্কার ও বাসনারূপ উপাধির তারতম্যবশতঃ বিভিন্ন মন্ত্র এবং নামরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই শুদ্ধ শব্দ কুণ্ডলিনী হইতে উত্থিত হয় বলিয়া কুণ্ডলিনী শক্তিকে শুদ্ধ সৃষ্টির জননী বলা হয়।

কুণ্ডলিনী শক্তির এক নাম বিন্দু। ইনি জীবদেহে মূলাধার চক্রে অথবা ত্রিদলের আধারকমলে অনাদি কাল হইতে সুষুপ্তভাবে বর্তমান রহিয়াছেন। এই সুষুপ্তি মধ্যে জীবের অনন্তপ্রকার স্বপ্নদর্শন হইতেছে। ইহাই জাগতিক জ্ঞানের স্বরূপ। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলে নিদ্রাভঙ্গ হয় বলিয়া স্বপ্নদর্শন আর থাকে না। অর্থাৎ তখন সত্যবস্তুর সাক্ষাৎকার হয় বা হইবার উপক্রম হয় এবং সেই অনুপাতে মিথ্যাজ্ঞান ও মিথ্যাদর্শন ক্রমশঃ তিরোহিত হইতে থাকে। সত্যদর্শন পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে, মিথ্যাদর্শন ও তাহার কার্য চিরদিনের মত অস্তমিত হইয়া যায়। ইহাকে জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ বলে। সাধকগণ যে অবস্থাকে ষট্‌চক্রভেদ বলিয়া বর্ণনা করেন, তাহা বস্তুতঃ জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন ভিন্ন অন্য কিছু নহে।

জপের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন। যে কুণ্ডলিনী শক্তির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, তাহাকে উদ্বুদ্ধ করাই জ্ঞানের বিকাশ। ইহা ক্রমশঃ হইতে পারে এবং তেমন উচ্চ অধিকারী হইলে মুহূর্তের মধ্যে হইতে পারে। যাহাদের হঠাৎ অর্থাৎ একটি মাত্র ক্ষণের মধ্যে জ্ঞানচক্ষুর স্ফুরণ হয় তাহাদের ক্রমবিকাশ অবস্থা থাকে না বা জানিতে পারা যায় না। ইহাদের বিষয় না বলিয়া সাধারণ সাধকের বিষয় সংক্ষেপে বলিব।

ভ্রূমধ্য বিন্দুস্থান। চিত্ত একাগ্র হইলে ইহার রশ্মি চারিদিক হইতে উপসংহৃত হইয়া বিন্দুতে ফিরিয়া আসে। সূর্যমন্ডল হইতে যেমন কিরণধারা চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, সেই প্রকার চিত্তবিন্দু হইতে তাহার রশ্মিমালা ছড়াইয়া পড়ে। ইহাকে বিক্ষিপ্ত অবস্থা বলে। সাধক সাধনবলে গুরুকৃপায় এই বিক্ষিপ্ত রশ্মিসমূহকে ফিরাইয়া আনে এবং কেন্দ্রস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। ইহারই নামান্তর একাগ্রতা। একাগ্রতার সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতি প্রকাশিত না হইয়া পারে না।

কিন্তু এই একাগ্রতা লাভ সাধারণ সাধকের ক্রমশঃ সিদ্ধ হয়। এই ক্রমের অনুসন্ধানপূর্বক যথাবিধি তাহার অনুসরণ করাই যোগীর কর্তব্য। মূলাধার হইতে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত যে ছয়টি চক্র আছে তাহারা যন্ত্রস্বরূপ। এই যন্ত্রে বহির্মুখ গতিতে যেমন সৃষ্টির বিস্তার হয়, তেমনি অন্তর্মুখ গতিতে সৃষ্টির উপশম হয়। নিবৃত্তি মার্গের সাধক সৃষ্টিমুখে না যাইয়া লয়ের পথে অগ্রসর হয়। মূলাধার চক্রে চারিটি পৃথক পৃথক দলরূপে চারিটি রশ্মি বা বর্ণ বিকীর্ণ হইয়া আছে। এই চক্রের মধ্যবিন্দুটি চক্রেশ্বর বা চক্রের কেন্দ্রশক্তির অধিষ্ঠান, প্রকারান্তরে বলিতে পারা যায় মূলাধার চক্ররূপ রাজ্যের রাজসিংহাসনই ঐ মধ্যবিন্দু। যে চারিটি বর্ণ বা রশ্মি এই রাজ্যকে আলোকিত করিয়া রাখিয়াছে তাহাদিগের সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে কিছু বলিবার আবশ্যকতা নাই। কারণ একটি রশ্মিকে সংকোচ করিলেই তাহার আশ্রিত

অন্যান্য রশ্মি অর্থাৎ উপরশ্মিগুলি আপনিই সংকুচিত হইয়া যায়। মূলাধার যেমন চতুর্দল, তদ্রূপ স্বাধিষ্ঠান ষড়দল, মণিপুর দশদল, অনাহত দ্বাদশদল, বিশুদ্ধ ষোড়শদল এবং আজ্ঞাচক্র দ্বিদল। দলসংখ্যার সমষ্টি পঞ্চাশ। এই পঞ্চাশটি দলে আকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণমালার পঞ্চাশটি বর্ণ। ইহাই অক্ষমালা—ইহাই যোগীর জপের মালা।

১৫. ১০. ৪৪

১৫

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ইত্যাদি—

এই শ্লোকটিতে ঈশ্বরতত্ত্ব, জীব ও জগৎতত্ত্ব এবং জীব ও জগতের সহিত ঈশ্বরের সম্বন্ধতত্ত্ব নির্দেশ করা হইয়াছে। সর্বভূতের মধ্যে ঈশ্বরের সত্তা বিরাজমান রহিয়াছে কিন্তু এই সত্তার উপলব্ধি সহজসাধ্য নহে। যতক্ষণ পর্যন্ত ভৌতিক সত্তা দেহরূপে পরিণত না হয় ততক্ষণ ভগবৎসত্তা সর্বত্র ব্যাপ্ত থাকিলেও উপলব্ধিগোচর হইতে পারে না। ভৌতিকসত্তা যখন দৈহিক পিণ্ডরূপে পরিণত হয় তখন চৈতন্যশক্তি ঐ দেহকে আশ্রয় করিয়া দুইভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ দেহসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই চৈতন্য তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহাতে আত্মাভিমানপূর্বক জীবভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তখন ঐ দেহ বা দেহাশ্রিত ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে অবলম্বন করিয়া আমিত্বের বিকাশ হয়, এই অভিমান বা আমিত্বের ক্রিয়াই জীবভাবের খেলা। পক্ষান্তরে চৈতন্যশক্তি জীবভাব গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই দেহের সঙ্গে কোনপ্রকার লিপ্তভাব বা সংশ্লেষ না রাখিয়া দেহ এবং দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়াদির দ্রষ্টারূপে দেহমধ্যে অবস্থান করে। এই দ্রষ্টা বা সাক্ষী পরমাত্মারই একটি দিক, যাহা শুদ্ধ এবং অভিমান শূন্য। জীবাত্মা ভোক্তা আর এই দেহস্থ নির্লিপ্ত পরমাত্মা শুধুই দ্রষ্টা। এই যে দেহস্থ নির্লিপ্ত পরমাত্মার কথা বলা হইল, ইহাকেই অন্তর্যামী পুরুষ বলা হয়। ইনি দেহমধ্যেই আছেন অথচ সাক্ষাৎভাবে দেহের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই—ইনি শুধু দ্রষ্টা। ইনি ভিতর হইতে শুধু দৃষ্টি দিতেছেন এবং সেই দৃষ্টির প্রভাবে দেহরূপ যন্ত্র চালিত হইতেছে। অন্তর্যামী পুরুষের দৃষ্টি ভিন্ন জড়দেহ ক্রিয়াশীল হইতে পারে না। দেহের ও মনের যাবতীয় বৃত্তির মূলে অন্তর্যামীর দৃষ্টিরূপ রশ্মির যোগ রহিয়াছে। ইহা সত্ত্বেও অন্তর্যামীকে দৈহিক কার্যের কর্তা এবং ঐ কার্যের ফলের

ভোক্তা বলিয়া বর্ণনা করা চলে না। কারণ একদিকে যেমন তাঁহার কর্তৃত্বের অভিমান নাই অপরদিকে তেমনি তাঁহার ভোক্তৃত্বেরও অভিমান নাই। তিনি আমিত্বহীন চিদাত্মক সাক্ষী-পুরুষ। কিন্তু তিনি কর্তা না হইলেও সকল কর্তৃত্বের মূলে তাঁহাতেই রহিয়াছে। এই যে দৃষ্টিরূপ রশ্মিটির কথা বলা হইল উহা দ্বারাই দেহের সমস্ত ক্রিয়া বিভিন্ন আধার এবং উপাধির বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নিষ্পন্ন হইতেছে। এই অন্তর্যামী পুরুষই দৈহিক প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা কিন্তু অহংকারমুগ্ধ জীব নিজেকেই সর্বকার্যের কর্তা মনে করিয়া কর্মফল ভোগে বাধ্য হয় এবং সংসারে বদ্ধ হয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই অন্তর্যামী পুরুষরূপ ঈশ্বর দেহের মধ্যে কোন্ স্থানে আছেন এবং জীব তাঁহাকে কোন্ প্রকারে পাইতে পারে? সমস্ত দেহের মধ্যে যেটি শূন্যস্থান যেখানে কোনপ্রকার বাসনারূপী বায়ুর তরঙ্গ উত্থিত হয় না, যাহা স্থির, যাহা আকাশসদৃশ নির্মল ও নিষ্কম্প, সেই শূন্য স্থানেই পরমাত্মার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। এই স্থানটিকে হৃদয় বলে। "যতো নির্যাতি বিষয়ো যস্মিংশ্চৈব প্রলীয়তে। হৃদয়ং তদ্ বিজানীয়াৎ মনসঃ স্থিতিকারণম্।" —যে স্থানে বিষয় নাই, যেখান হইতে বিষয়ের উদ্গম হয়—যেখানে বিষয় লীন হইয়া যায়, যেখানে গেলে মন আর মন থাকে না—উন্মনীভাব প্রাপ্ত হয় সেই নির্মল শূন্য স্থানটি হৃদয় পদবাচ্য। এই স্থান হইতে পরমাত্মার শক্তি দেহের সর্বত্র নাড়ীসংযোগে স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে সঞ্চারিত হয় এবং দেহকে চালনা করে।

ইহাই মায়াযন্ত্রের ব্যাপার। মায়াযন্ত্রের সূক্ষ্মরহস্য এখানে প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে ঐ যে অন্তর্যামী ঈশ্বরের কথা বলা হইল উনিই ঐ মায়াযন্ত্রের যন্ত্রী।

যে অনাহত ধ্বনি অথবা নাদ নিরন্তর চিদাকাশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং যাহা যোগিমাত্রই অন্তর্মুখ হইয়া শ্রবণ করিয়া থাকেন তাহা পূর্বোক্ত নাড়ীসকলের মধ্য দিয়া সঞ্চরণশীল অন্তর্যামী পুরুষের দৃষ্টিরূপ রশ্মির অনন্ত ধারা মাত্র। অর্থাৎ ঐ রশ্মিটি একদিকে জ্যোতিরূপে এবং অপরদিকে শব্দরূপে সাধকের নিকট অন্তর্মুখ অবস্থায় অনুভূত হয়। সাধক নাদ-রূপী ঐ ধারা অবলম্বন করিয়া তাহাতে গা ভাসাইয়া দিতে পারিলে ঐ ধারার প্রবাহে যথাসময়ে উহার উৎপত্তিস্থানে উপনীত হইতে সমর্থ হয়। নাদকে আশ্রয় করিতে না পারিলে ভৌতিক দেহের অভিমান হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া সাক্ষীস্বরূপে শূন্যরূপে হৃদয়স্থানে প্রবেশ করিতে সামর্থ্য জন্মে না। নাদের বিকাশ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনের অভিভব সম্ভব হইলে কর্তা এবং ভোক্তা জীব কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্বহীন হইয়া শুধু দ্রষ্টারূপে নিরালম্বভাবে অবস্থান করে। শূন্যে স্থিতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জীবচৈতন্য অবলম্বনশূন্য

হইয়া জীবভাব পরিত্যাগ করে এবং তাহার সকল অভিমান বিগলিত হইয়া যায়। আপাততঃ এই ব্রহ্মটি বিন্দুস্থান বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিন্দুতে নাদের অবসান হইলে যখন আত্মজ্ঞানের বিকাশ হয় তখন আত্মা দ্রষ্টারূপে সেই মহাশূন্য হইতে সূক্ষ্মরূপে দেহরূপ অখণ্ড জগৎকে দেখিতে পায়। শুধু ইহাই নহে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে পায় যে ঐ বিন্দুস্থান হইতে রশ্মিরূপী শক্তিপ্রবাহ সঞ্চারিত হইয়া সমগ্র যন্ত্রটিকে চালিত করিতেছে। বুঝিতে পারা যায় যে আত্মা স্বয়ং এই বিশাল যন্ত্রের কেন্দ্রমধ্যে অবস্থিত। সাধনার প্রথম অবস্থায় সাক্ষীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে এই বিরাট দর্শনটি খুলিয়া যায়। তখন জীবভাব থাকে না। আত্মা নিজেই দ্রষ্টারূপে স্থিত হয়—এই পর্যন্ত মন্ত্রভক্তের অনুভূতি বুঝিতে হইবে। ইহার পর দ্রষ্টা হইতেই যে রশ্মি নির্গত হইয়া সমগ্র যন্ত্রটি চালনা করিতেছে তাহা উপলব্ধিগোচর হয়। তখন সাক্ষী থাকিয়াও সে ঐশ্বর্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্রষ্টা তখন শুধুই দ্রষ্টা নহে স্বয়ং অন্তর্যামী পুরুষ। এই দেহযন্ত্রের সেই একমাত্র যন্ত্রী। সে নিজেই তখন গুরুর আসনে উপবিষ্ট। যে নাদ অবলম্বন করিয়া সে ঐ অবস্থায় আসিয়াছে তাহা যেমন ছিল তেমনই আছে। সে তাহা আর প্রাপ্ত হয় না—সে তখন নাদাতীত।

২৪. ১০. ৪৪

১৬

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

এই শ্লোকটি শ্রীগুরুর নমস্কার শ্লোক। লক্ষ্য করিতে হইবে এই স্থলে গুরুকে শ্রীগুরু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রীশব্দ পরাশক্তির বাচক, সুতরাং শ্রীসহিত বা শ্রীযুক্ত গুরুই শ্রীগুরু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। গুরু শক্তিহীন হইলে তাঁহাদ্বারা জীব বা জগতের কল্যাণসাধন সম্ভবপর হয় না। বস্তুতঃ তিনি জীবের উপাস্য নন, এমন কি নমস্কারের বিষয়ীভূত নন। কারণ শক্তিহীন শিব অব্যক্ত ও জীবের পক্ষে অনধিগম্য। হঠযোগ এবং তন্ত্রশাস্ত্র উভয়স্থলেই স্বরূপভূতা শক্তির সঙ্গে নিত্যমিলিত গুরুকে লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্ররহস্য বর্ণিত হইয়াছে। কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত হইয়া যাবতীয় আধারকমল বিদ্ধ এবং অতিক্রম করিতে করিতে উত্থিত হইয়া সহস্রদলের

বিন্দুস্থানে পরমশিবের সহিত মিলিত হন। এই মিলন নিত্য মিলন। এই মিলনে শিবরূপী গুরু শক্তিযুক্তরূপে সাক্ষী জীবের নিকট নিরন্তর অপরোক্ষভাবে প্রকাশিত হন। জীব সাধনবলে অথবা ভগবৎকৃপায় কোন শুভ মুহূর্তে এই মহামিলনের অবস্থা লাভ করে। কিন্তু শ্রীগুরু নিত্যই নিজশক্তি দ্বারা আলিঙ্গিত থাকেন। তাই তিনি নমস্য।

'তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ' বলিতে এই চৈতন্যরূপা শক্তিসংযুক্ত পরম গুরুতত্ত্বই জীবের নমস্কারের বিষয়রূপে লক্ষিত হইয়াছে। নমঃ বলিতে বুঝায় ন মম অর্থাৎ আমার নয় অর্থাৎ তোমার বা তাঁহার। আমি ভাব এবং তন্মূলক মমত্বভাব যাঁহাকে অর্পণ করা যায় তাহাই আমির পক্ষে নমস্য। এই নমস্কার শ্লোকে শ্রীগুরুতে আত্মসমর্পণের কথা বলা হইয়াছে। শুধু গুরুমাত্র নহে।

শ্রীগুরুর স্বরূপটি বুঝাইবার জন্য শ্লোকের পূর্বাংশ উপদিষ্ট হইয়াছে। এই স্থানে পরমতত্ত্ব উপেয়রূপে এবং উপায়রূপে দুইভাবেই স্পষ্টভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। যিনি উপেয় তাঁহাকে পরমপদ বলিয়া অর্থাৎ বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহা ভগবদ্ভাবেরও অতীত পরমাবস্থা। যিনি এই পরমপদকে জীবের নিকট প্রকাশিত করেন তিনিই গুরু। বস্তুতঃ উপেয়রূপ পরমপদ এবং উপায়রূপ গুরু মূলতঃ অভিন্ন। কারণ উভয়ে স্বরূপগত ভেদ থাকিলে একটির দ্বারা অপরটির প্রাপ্তি বা প্রকাশন সম্ভবপর হইত না। যে যাহা নয় সে তাহা জানে না এবং জানাইতেও পারে না। সুতরাং যিনি পরমপদ স্বরূপ তিনিই যে বস্তুতঃ গুরুতত্ত্ব তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি স্বপ্রকাশ বলিয়া নিজেকে নিজে সদাই জানেন এবং পরপ্রকাশক বলিয়া নিজেকে জগতের নিকট প্রকাশ করেন। এই যে প্রকাশক রূপ ইহাই গুরুর রূপ। এই যে স্বপ্রকাশরূপ ইহাই পরমপদের স্বরূপ। বস্তুতঃ জীব বা জগতের নিকট সেই পরম বস্তুর প্রকাশ হইতেই পারে না। সুতরাং বুঝিতে হইবে গুরু যখন স্বীয় স্বরূপকে অর্থাৎ পরমতত্ত্বকে পরের নিকট প্রকাশিত করেন তখন পরকে আপন করিয়াই তাহা করেন নতুবা তাহা সম্ভবপর হইত না। এইজন্য যতক্ষণ জীবের তৃতীয় নেত্র অথবা জ্ঞান নেত্র উন্মীলিত না হয়—ততক্ষণ পরমপদ স্বপ্রকাশ হইলেও তাহার নিকট প্রকাশিত হয় না। শ্রীগুরুই এই জ্ঞাননেত্র-উন্মেষের কারণ। অনাদি অজ্ঞান পাশে আবদ্ধ জীব যতক্ষণ শ্রীগুরুর কৃপায় এই জ্ঞাননেত্রের উন্মীলনের সৌভাগ্য লাভ না করে ততক্ষণ তাহার পক্ষে মিথ্যাদর্শন ব্যতিরেকে পরমার্থ দর্শনের সম্ভাবনা কোথায়? স্বপ্রকাশ জ্ঞেয় বস্তু নিত্যই সন্নিহিত রহিয়াছে কিন্তু অন্ধ জীব সন্নিহিত পদার্থও দেখিতে পায় না। সুপ্তজ্ঞান জাগিয়া উঠিলে পরমসত্য বা পরমপদের অন্বেষণ করিতে হয় না। তাহাকে নিত্যপ্রাপ্তরূপেই উপলব্ধি করা যায়।

এই যে পরমপদের কথা বলা হইল ইহাই মুখ্য বিষ্ণুপদ বা বিষ্ণুর পরমপদ যাহা নিত্যমুক্ত পুরুষ সর্বদা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন—সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। বিষ্ণু কাহাকে বলে?—যিনি ব্যাপক, যিনি সম্যকরূপে সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন তিনিই বিষ্ণু অর্থাৎ পরমাত্মা এবং বিষ্ণু একই অভিন্ন সত্তা। সর্বভূত বলিতে স্থাবর এবং জঙ্গম, চর এবং অচর সকল পদার্থই বুঝাইতেছে। এই যে অখিল পদার্থ এবং তাহার সমষ্টি তাহাই কার্য ও কারণ উভয়াত্মকরূপে অখণ্ডমণ্ডলভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ চরাচর অখণ্ডমণ্ডলের আকারে দীপ্তিমান্। তাই মণ্ডলের ব্যাপকরূপে যে অনন্ত মহাসত্তা রহিয়াছে তাহাই বিষ্ণু অর্থাৎ বিষ্ণু বা পরমাত্মার অতি ক্ষুদ্র বা পরিচ্ছিন্ন এক অংশে স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বিষ্ণু বা পরমাত্মা ব্যাপক—জীব বা জগৎ তাহার ব্যাপ্য। উভয়ে মিলিয়া চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর এই ত্রিবিধ তত্ত্বের মহাসমষ্টিতে পরিণত হয়। পরমাত্মার পদ বলিতে বুঝিতে হইবে সেই পরম-স্থিতি যাহাকে আশ্রয় করিয়া জীব ও জগতের অধিষ্ঠাতৃস্বরূপ স্বয়ং পরমাত্মাও প্রকাশিত হন। ইহাই তৎপদ বা বিষ্ণুপদ অথবা পরমপদ। গীতাতে 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্' বলিয়া এই তৎপদকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যিনি এই তৎপদকে প্রত্যক্ষ ফুটাইয়া তুলেন বা প্রকাশিত করেন তিনিই গুরু। জীবের জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনের দ্বারাই ইহা নিষ্পন্ন হইতে থাকে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। শ্রীগুরু ভিন্ন এই প্রকার অঘটন ঘটাইবার সামর্থ্য আর কাহারও নাই। এখানে আমরা বুঝিতে পারিলাম অচর হইতে চর শ্রেষ্ঠ, চর হইতে বিষ্ণু বা পরমাত্মা শ্রেষ্ঠ, বিষ্ণু বা পরমাত্মা হইতে তৎপদ, বিষ্ণুপদ বা পরমপদ শ্রেষ্ঠ এবং বস্তুতঃ পরমপদ হইতেও এক হিসাবে শ্রীগুরু শ্রেষ্ঠ। গুরু এবং পরমপদ বস্তুতঃ অভিন্ন তথাপি যখন ঐ গুরু বা পরমপদ শ্রীসংযুক্ত হন তখনই তাঁহার উৎকর্ষ কারণ শ্রীগুরু ভিন্ন পরমপদ জানিয়া জানাইবার ক্ষমতা আর কাহারও নাই, থাকিতে পারে না। শ্রীরহিত গুরু বস্তুতঃ গুরুপদ বাচ্যই নহেন, যদিও তিনি পরম সত্যের সহিত অভিন্ন তাহাতে সন্দেহ নাই।

পূর্ব বর্ণনায় অচর বলিতে অচিৎ, চর বলিতে চিৎ, এবং বিষ্ণু বলিতে পরমাত্মা বা ঈশ্বর এবং তৎপদ বলিতে ব্রহ্মস্বরূপ বুঝাইতেছে, শ্রীগুরু এই চারিটি তত্ত্ব হইতেই উচ্চতর তত্ত্ব। গুরুর এই প্রকার মাহাত্ম্য অনুভব করিয়া তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য। 'নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্' এই প্রাসঙ্গ বাক্যেও গুরুভাবের শ্রেষ্ঠতাই সূচিত হইয়াছে।

৭. ১১. ৪৪

১৭

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্ ॥

মায়াবদ্ধ জীব ভোক্তা সাজিয়া সমগ্র জগৎকে নিজের ভোগের বিষয় রূপে মনে করিয়া থাকে। যতদিন তাহার কর্তৃত্বাভিমান থাকিবে ততদিন তাহাকে কর্ম করিয়া তাহার ফলভোগ করিতেই হইবে এবং ততদিন সংসারকে ভোগস্থান বলিয়া মনে না করিবার কোনই উপায় নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন—জগৎকে এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে জগতের প্রকৃত স্বরূপ দর্শন হইবে না এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবের আবরণও শুদ্ধ হইবে না। এই জন্য সর্বপ্রথমে আবশ্যক—জীবের নিজের দৃষ্টির সংস্কার। অজ্ঞান দৃষ্টিতে যাহা যেরূপ প্রতীত হয় জ্ঞান দৃষ্টিতে তাহা ঠিক সে প্রকার প্রতিভাত হয় না। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইলে সর্বত্র সেই জ্ঞানই অখণ্ড ও ব্যাপকরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। জ্ঞানই ভগবানের পরমস্বরূপ। এইজন্য জগৎকে ভগবৎস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে দৃষ্টিকে চিন্ময়ী করিয়া লইতে হয়। জগতের সকল পদার্থ—এমন কি শুধু ভাব নহে, অভাবও—একমাত্র অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরমসত্তা বা ঐশ্বরিক সত্তা দ্বারা ব্যাপ্ত আছে তাহা অনুভব করিতে হইবে। 'জগতী' বলিতে পরিবর্তনশীল মায়িক প্রপঞ্চ বুঝিতে হইবে। তাহার অন্তর্গত প্রত্যেকটি বস্তুই 'জগৎ'—অর্থাৎ ক্ষণ-পরিণামী চঞ্চল। আধারও চঞ্চল, আধেয়ও চঞ্চল। আধার ও আধেয় একসঙ্গেই মায়িক প্রপঞ্চ। অতএব এই প্রপঞ্চ ভোগের বস্তু নহে। কারণ ইহা ভগবৎসত্তারই সাক্ষাৎ স্ফুরণ। জীব যতক্ষণ অজ্ঞানের অধীন ও অহংকারের আশ্রয়ে থাকিতে বাধ্য হয় ততক্ষণ সে কর্তা ও ভোক্তা বলিয়া নিজেকে জানে, সেইজন্য জগৎও তাহার কর্ম ও ভোগের ক্ষেত্র বলিয়া তাহার প্রতীতি হয়। ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রুতির আদেশ-জীবকে দৃষ্টি শুদ্ধ করিয়া অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বের অভিমান হইতে মুক্ত করিয়া জগতের দিকে প্রেরণ করিতে হইবে, যাহার ফলে জগৎও ভগবৎসত্তাময় বলিয়া বোধগম্য হইবে—শুধু কর্ম ও ভোগের স্থান বলিয়া বোধ হইবে না। আত্ম-শুদ্ধির প্রভাবে জগতের শোধন সিদ্ধ হইলে দ্রষ্টা ও দৃশ্য উভয়ই চৈতন্যময় স্বরূপে স্থিতিলাভ করিবে :

তখন ত্যাগ ও ভোগের পরস্পর বিরোধ কাটিয়া গিয়া ত্যাগের দ্বারাই ভোগ সিদ্ধ হইবে। ত্যাগ না করিয়া ভোগ, ত্যাগরহিত ভোগ,—বস্তুতঃ কর্মফল ভোগমাত্র, তাহা ভগবৎস্বরূপানন্দ ভোগ নহে। কারণ ত্যাগ ব্যতিরেকে

অমৃতত্ব বা পরমানন্দের আস্বাদন জীব লাভ করিতে পারে না। যতক্ষণ অহংভাবের বিসর্জন না হয়, যতক্ষণ আত্মসমর্পণ পূর্ণ না হয়, ততক্ষণ ত্যাগ সম্পন্ন হইতে পারে না। ত্যাগ না করিলে শুদ্ধ ভোগের অধিকার কোথায়? শুদ্ধ ভোগের ভোক্তা সাক্ষী আত্মা—অশুদ্ধ ভোগের ভোক্তা অভিমানী আত্মা। শ্রুতি বলিয়াছেন—ভোগ কর, আপত্তি নাই, কিন্তু তৎপূর্বে ভোগ করিবার অধিকার লাভ করিয়া লও। এই অধিকার লাভ ত্যাগ হইতে হয়। অহন্তা ও মমতা বিসর্জনই ত্যাগের তত্ত্ব। ত্যাগীর ভোগ—উপভোগ নহে, পরমানন্দ ভোগ। তাহাতে বন্ধন ত হয়ই না, বরং বন্ধনের বীজ দগ্ধ হইয়া যায়। কারণ ইহাই প্রসাদ গ্রহণ।

ত্যাগ কাহাকে বলে? আমি বা আমার—এই ভাবের পরিহারই ত্যাগ। তাহা সত্য। কিন্তু আমি নই ত কে? আমার নয়, ত কাহার? ইহার উত্তরে শ্রুতি বলিতেছেন—এ স্থলেও 'ঈশা বাসাম্'—ঐশ্বরিক সত্তা দ্বারা ঢাকিয়া লও। অর্থাৎ 'আমি' ভাবকে বিসর্জন দিয়া ঈশ্বরকে স্থাপন কর, আমার ভাবকে ত্যাগ করিয়া 'ঈশ্বরের'—এই ভাবকে স্থাপন কর, তাহা হইলেই প্রকৃত ত্যাগ হইবে। বস্তুতঃ ইহাই ইষ্টরূপী ঈশ্বরকে ভোগ-নিবেদন। ইহার পর তিনি এই জীবদত্ত ভোগ গ্রহণ করেন। তখন জীব তাহা ভোগ করিতে অধিকারী হয়। ইহাই প্রসাদ গ্রহণ। ইহাই 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ', তখন জগতের প্রতি পদার্থই পবিত্র, ব্রহ্মময়, নির্মল অপ্রাকৃত ভাবাপন্ন হয়—তাহা শুদ্ধ বিষয় নহে।

কাহারও ধনে লোভ করিতে শ্রুতি নিষেধ করিয়াছেন—'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্'। যাহাতে কাহারও মমত্ব বা আসক্তিবোধ জড়িত থাকে, তাহাই তাহার পক্ষে ধন। যে বস্তুতে কাহারও মমতা আছে, তাহা তাহার। ব্যক্তিগত ভাবে দেখিতে গেলে জগতের সকল পদার্থই কাহারও না কাহারও—অর্থাৎ যে উহা চায় উহা তাহারই। শ্রুতি বলিতেছেন—উহা তাহারই থাকুক, তুমি উহা লোভ করিও না, উহা আপন করিতে ইচ্ছা করিও না, তুমি অকিঞ্চন হও—মনে রাখিও তোমার কিছুই নাই। সবই অন্যের। বস্তুতঃ অন্যের নহে—যখন ঐশ্বরিক সত্তা ব্যাপ্তরূপে সকল পদার্থে দেখিবে তখন জানিবে সবই ভগবানের, সবই তোমার ইষ্টদেবের। তোমার কিছুই নাই। তাঁহার জিনিষে তুমি লোভ করিও না। উহা নিজের বলিয়া মনে করিও না বা নিজের করিতে ইচ্ছা করিও না। করিলে কর্মফলের ভোগ হইবে—আনন্দময় সর্বত্র ব্যাপক ভগবান্‌কে পাইবে না। না করিলে দেখিবে ইহাই তোমার ভোগ নিবেদন হইয়া গিয়াছে।

তখনই যথার্থ ভোগের সামর্থ্য তোমার আসিবে। যে লোভহীন, বৈরাগ্যবান্, অকিঞ্চন, নিষ্কাম, যে সর্বত্র তাঁহাকেই দেখে, সকল জগৎ তাঁহার

বস্তু যাঁহারা অনুভব করে ও নিজের দাবী চিরদিনের জন্য পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে—সেই আনন্দের অধিকারী, সেই যথার্থ ভোক্তা। পরমেশ্বর যেমন নির্লিপ্ত হইয়াও ভোক্তা, সেও তখন ভোগহীন হইয়াই অনন্ত ভোগের আনন্দে সমৃদ্ধ হয়।

৯. ১১ ১৯৪৪

১৮

পরমতত্ত্বের অনুভূতি

অধিকার ভেদে পরমতত্ত্বের অনুভূতি বিভিন্ন প্রকারে হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি অনুভূতির আনুষঙ্গিক ভাবে এক একটি স্থিতিও আছে। উহাও অধিকারভেদে পৃথক্ পৃথক হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ জ্ঞানপথে পরমতত্ত্ব ব্রহ্মরূপে অনুভূত হয়। বিশুদ্ধ যোগমার্গে ঐ অনুভূতি পরমাত্মার আকার ধারণ করে। বিশুদ্ধ ভক্তিপ্রভাবে পরমতত্ত্ব ভগবৎরূপে স্ফুরিত হয়। ব্রহ্মানুভূতির ফলে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতিলাভ হয়। তদ্রূপ পরমাত্ম-দর্শন ও ভগবৎদর্শনের ফলে চরম অবস্থায় তত্তৎ স্বরূপে স্থিতিলাভ হয়। যাঁহারা ক্রম অবলম্বন করিয়া চলেন তাঁহারা একটি অনুভূতির পর পরবর্তী অনুভূতিমার্গ আশ্রয় করেন। চরম অনুভূতির পর তাঁহাদের স্থিতিলাভ হয়। কোন বিশেষ অনুভূতির পর স্থিতি লাভ হইলে অন্য অনুভূতি পাওয়া সহজ হয় না। তবে ভগবৎকৃপাতে সবই সম্ভবপর হয়। এইজন্য কোন স্থিতিতে কেহ আবদ্ধ হইয়া থাকিলেও সেখান হইতে তাহাকে উঠাইয়া অন্যত্র নিয়া যাইবার ব্যবস্থা আছে।

ব্রহ্মানুভূতি অভেদাত্মক। জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, জীব ও জীবের ভেদ, জীব ও জগতের ভেদ, ঈশ্বর ও জগতের ভেদ, জাগতিক পদার্থের পরস্পর ভেদ এই পাঁচপ্রকার ভেদের অনুভূতি ব্রহ্মাবস্থায় থাকে না। উহা বিজাতীয়, সজাতীয় ও স্বগত ভেদ রহিত। ব্রহ্মানুভূতিতে কোন দৃশ্য বস্তুর ভান হয় না। স্বপ্রকাশ শুদ্ধচৈতন্য আপনাতে আপনি প্রকাশমান থাকে। একই চৈতন্য দ্রষ্টা দৃশ্য ও দৃষ্টিভেদে পৃথক্কৃত হয় না। যেখানে দৃশ্যের দর্শন থাকে সেখানে ঐ দৃশ্য বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ, এই প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু যেখানে পৃথক্ দৃশ্যের সত্তাই নাই সেখানে দর্শন ভিতরে হয় অথবা বাহিরে, এই প্রশ্নের কোন অর্থই হয় না। ব্রহ্ম নিরাকার নির্বিশেষ, নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ও অব্যক্ত। ইহা চিরস্থির অপরিণামী ও কূটস্থ নিত্য। ইহা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। এই স্বরূপে সৎ চিৎ ও আনন্দ এই তিন অংশের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই।

পরমাত্মার অনুভূতি এইপ্রকার নহে। একই দেহকে আশ্রয় করিয়া ব্যষ্টিভাবেই হউক বা সমষ্টি ভাবেই হউক জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই অবস্থান করে। জীবাত্মার দুইটি অবস্থা। একটি বদ্ধাবস্থা, একটি মুক্তাবস্থা। মুক্তাবস্থায় জীবকে পুরুষ বলে। বদ্ধাবস্থায় জীব দেহ প্রভৃতিতে অভিমানযুক্ত হইয়া দেহাশ্রিত প্রকৃতির সমস্ত কার্য আপনাতে আরোপ করিয়া লয় এবং নিজে কর্তা সাজিয়া বসে। ইহার দণ্ডস্বরূপ তাহাকে সুখ-দুঃখরূপ কর্মফল ভোগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। এই কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব সাংসারিক জীবের ধর্ম। জীব মুক্ত হইলে বুঝিতে পারে সে কর্তাও নয়, ভোক্তাও নয়; সে দ্রষ্টামাত্র। প্রকৃতির ক্রিয়া দর্শন করাই তাহার স্বভাব। তাই স্বভাবে স্থিত হইলে আত্মা সাক্ষীরূপে নিজপ্রকৃতির খেলা দর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ করে। মুক্ত পুরুষ যে প্রকার সাক্ষী, পরমপুরুষ পরমাত্মাও ঠিক সেই-প্রকার সাক্ষী। ইহাই উভয়ের সাধর্ম্য। কিন্তু পরমপুরুষ ক্রিয়াশক্তিরও আশ্রয়, শুধু জ্ঞানশক্তির নহে। মুক্ত পুরুষ শুধু জ্ঞানশক্তির আশ্রয়। মুক্তপুরুষ পরমপুরুষের উপাসনা করিতে করিতে ক্রমশঃ পরমপুরুষের ধর্ম প্রাপ্ত হয় এবং নিজেও কূটস্থ অবস্থা লাভ করে। বদ্ধ জীব দেহকে আশ্রয় করিয়া কর্ম করে এবং ফল ভোগ করে। কিন্তু মুক্ত পুরুষ দেহস্থিত হৃদয়-প্রদেশে অবস্থান করে, পরমাত্মাও তদ্রূপ দেহস্থিত শূন্যপ্রদেশে প্রকাশমান হইয়া থাকে। যেখানে দেহসম্বন্ধ মোটেই নাই সেখানে জীবাত্মা পুরুষরূপে নিজের সত্তা কিংবা পরমাত্মারূপে পরমপুরুষের সত্তা অনুভব করিতে পারে না। এইজন্যই ব্রহ্মানুভূতিতে এই উভয়ের সত্তা প্রকাশিত হয় না। কারণ যথার্থ ব্রহ্মানুভূতি দেহবোধের অতীত অবস্থায় হইয়া থাকে। পরমাত্মাদর্শন জ্যোতিরূপে হইয়া থাকে। পুরুষরূপে জীবাত্মার স্বরূপ দর্শনও ঠিক সেই-প্রকারই হয়। পরমাত্মা ব্যাপক জ্যোতি, মুক্তপুরুষ তাহারই অন্তর্গত খণ্ডজ্যোতি। উপাসনার প্রভাবে এই উভয় জ্যোতিতে যোগ হয়—ইহাই জীবাত্মার সাযুজ্য। ইহা যোগের অবস্থা, জ্ঞানের অবস্থা নহে।

ব্রহ্মানুভূতিতে যেমন ভিতর বাহির ভেদ নাই, পরমাত্মার অনুভূতি সেই প্রকার নহে। এই অনুভূতি ভিতরেই হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবৎ অনুভূতি ইহা হইতে বিলক্ষণ। ভগবৎস্ফূর্তি ভিতরে হয় না, বাহিরে হয়। পরমাত্মদর্শনে শুধু জ্যোতি দৃশ্যরূপে পাওয়া যায়। ব্রহ্মদর্শনে দৃশ্য কিছুই থাকে না। কিন্তু ভগবৎদর্শনে দৃশ্যের পূর্ণ প্রকাশ থাকে। তাহা জ্যোতি নহে 'রূপ'। ভগবান্ সাকার, ব্রহ্ম নিরাকার, পরমাত্মা জ্যোতি মাত্র। তাহা ঠিক সাকারও নহে অথচ ব্রহ্মবৎ নিরাকারও নহে। কারণ জ্যোতিও ত একটা আকার। ভগবৎস্ফূর্তিতে ভাবদেহময় অথবা ভাবদেহাবিষ্ট স্থূলদেহের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ই কার্য করিয়া থাকে। অর্থাৎ ভগবানের রূপ আছে, শব্দ আছে, তদ্রূপ রস-গন্ধাদি সকল ধর্মই অপ্রাকৃত চৈতন্যময় তাহাতে সন্দেহ নাই

কিন্তু সকল বৈচিত্রাই বিদ্যমান রহিয়াছে। বস্তুতঃ ভগবৎস্বরূপে দেহ ইন্দ্রিয় ও আত্মার কোন পার্থক্য নাই, অথচ অনুভূতিতে সবই পাওয়া যায়। ভগবৎ-স্বরূপ চিন্ময় বলিয়াই স্থূলদৃষ্টিতে তাহা স্থূলবৎ, সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তাহা সূক্ষ্মবৎ, কারণ দৃষ্টিতে তাহা কারণবৎ, মহাকারণ দৃষ্টিতে মহাকারণবৎ এবং কৈবল্য বা শূন্যদৃষ্টিতে তদ্বৎ প্রতীত হইয়া থাকে। অথচ তাহা যাহা আছে তাহাই থাকে। ইহাই নিত্যসিদ্ধ দেহ বা আত্মার সিদ্ধ স্বরূপ। এই অবস্থার প্রাপ্তি না হইলে পরমপদে প্রবেশ হইতে পারে না।

রূপ অথবা আকারের স্ফূর্তি ভক্তি হইতে হইয়া থাকে। শুদ্ধ জ্যোতির স্ফূর্তি চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ যোগ হইতে হইয়া থাকে। অরূপ অর্থাৎ নিরাকার নির্গুণ সাম্যময় চৈতন্যের অভেদ রূপে স্ফূর্তি বিশুদ্ধ জ্ঞান হইতে হইয়া থাকে। জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি তিনটি যখন পৃথক পৃথক ও অমিশ্র ভাবে থাকে তখন পরম-তত্ত্বের সাক্ষাৎকার পূর্বনির্দিষ্ট প্রণালীতে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু যেখানে মার্গগত সাংকর্য বিদ্যমান থাকে সেখানে অনুভূতিতেও বিশুদ্ধতা থাকে না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যোগ যদি ভক্তিমিশ্র হয় তাহা হইলে যোগীর দর্শন হয় জ্যোতির্ময় আকারের, ভক্তি বা ভাব অনুসারে আকার যেরূপই হউক না কেন সে আকার জ্যোতিরই আকার ইহা বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা এইরূপ দর্শন পান তাঁহাদিগকে ভক্তযোগী বলে, এই দর্শন ধ্যানাবস্থায়—হৃদয়ে হইয়া থাকে। ইহা ভক্ত পথের দর্শন নহে, ভক্তিযুক্ত যোগপথের দর্শন। কিন্তু ভক্ত-যোগীর ন্যায় যোগীভক্তও আছে অর্থাৎ যে ভক্ত বিশুদ্ধ ভক্ত নহে, যাহার ভক্তিতে যোগ মিশ্রিত থাকে সে জ্যোতি দর্শন পায় না সে বাহিরে নিজের ইষ্টরূপই দর্শন পায় কিন্তু জ্যোতির দ্বারা বেষ্টিত। বিশুদ্ধ ভক্ত হইলে এই জ্যোতির বেষ্টন দেখা যাইত না। ইহা ভক্তির সঙ্গে যোগাংশের মিশ্রণের ফল।

জ্ঞান যোগ ও ভক্তির ক্রম সম্বন্ধেও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যাহারা সাধক ও শুদ্ধ জ্ঞানমার্গের উপাসক তাহারা চরমাবস্থায় নির্বিশেষ ব্রহ্মানুভূতি প্রাপ্ত হইয়া ঐ ব্রহ্মে স্থিতিলাভ করে। তাহাদের পক্ষে সাকার দর্শন বা জ্যোতি দর্শন পথের অনুভূতি মাত্র। চরমে ইহা থাকে না। ইহার মধ্যে একটি ক্রম লক্ষিত হয়। কেহ সাকার দর্শন করিয়া পরে দেখিতে পায় ঐ আকার জ্যোতিতে লীন হইয়া গেল, এবং জ্যোতিও নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে তিরোহিত হইল। আবার কাহারও কাহারও প্রথমে জ্যোতি দর্শন হইয়া তাহার পর জ্যোতির মধ্যে রূপ বা আকার দর্শন হয়। চরমে শুদ্ধ জ্ঞানের পূর্ণতায় আকার থাকে না। একমাত্র নিরাকার সত্তাই চৈতন্যরূপে অবশিষ্ট থাকে।

যাহারা যোগী ও পরমাত্মার উপাসক তাহারা চরম অবস্থায় পরমাত্মার অনুভূতি প্রাপ্ত হইয়া তৎস্বরূপে স্থিতিলাভ করে। পরমাত্মাই যোগেশ্বর।

অনন্ত বৈচিত্র্য ধারণ করিয়া অনন্ত প্রকার রসের আস্বাদনের সূত্রপাত করে। স্বপ্রকাশ আনন্দে এই যে লীলার বা ক্রীড়ার উন্মুখতা, ইহা হইতেই ঐ আনন্দ নিজে যেমন আছে তেমন থাকিয়াও নিজে হইতে বাহির হইয়া পড়ে। বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ স্বপ্রকাশ আনন্দটি একটি অভাবের আবরণে ঢাকা পড়িয়া যায়, অর্থাৎ স্বপ্রকাশ আনন্দটি থাকে 'পাই' হইয়া এবং যেটি বাহির হয় সেটি থাকে 'চাই' হইয়া। এই যে 'পাই' এর 'চাই চাই' ভাব ইহারই নাম রতি বা ভাব। ইহা নিত্য সিদ্ধ বস্তু। কারণ ইহাই পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে ফিরিয়া গিয়া 'পাই'কে আস্বাদনরূপে পরিণত করিবে। এই 'চাই' যতক্ষণ 'চাই' থাকে ততক্ষণ উহা রতি পদবাচ্য। ইহা অত্যন্ত তীব্র হইলে 'পাই'কে ফুটাইয়া তুলে। অর্থাৎ ইহা ফিরিয়া নিজের উৎপত্তি স্থানে প্রবেশ করে। এই যে 'পাই' কে ফুটাইয়া তোলা ইহারই নাম ভগবৎ সাক্ষাৎকার। এবং এই যে 'চাই' এর তীব্রতা ইহারই নাম প্রেম। অর্থাৎ রতির গাঢ় অবস্থাই প্রেম। প্রেমের তরল অবস্থাই রতি। রতি অবস্থায় ভগবৎ দর্শন হয় না। তখন ভগবানের অভাব বোধই তীব্র থাকে। প্রেম অবস্থায় ভগবৎ সাক্ষাৎকার হওয়ার ফলে অভাব স্বভাবে প্রবেশ করিবার অবকাশ পায়। যতক্ষণ প্রেমের উদয় না হয় ততক্ষণ বিলাস কোথায়? বিলাসই লীলা। অতএব লীলারম্ভের পূর্বে ভগবৎ প্রাপ্তি অত্যাবশ্যক। ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য প্রেমই একমাত্র উপায়। প্রেম রতিরই পরিপক্ক অবস্থা। রতি অনাদিকাল হইতে নিত্যধামে স্বপ্রকাশ আনন্দ হইতে 'চাই' রূপে নিঃসৃত হইতেছে। উদ্দেশ্য পরিণত অবস্থায় রসের আস্বাদন। সাধনার দ্বারা এই 'চাই' কে পাওয়া যায় না। তবে জীবের স্বরূপ দেহের অন্তঃস্থলে নিত্যসিদ্ধ-রূপে 'চাই' বর্তমান আছে। সাধনা উহাকেই ফুটাইয়া তোলে। মায়ার আবরণে 'চাই' আবৃত থাকে। সাধনা শুধু ঐ আবরণটিকে সরাইয়া দেয়। কখনও কখনও ভগবৎ কৃপা হইতেও সাক্ষাৎ বা পরম্পরাভাবে এই আবরণটি সরিয়া যায় বলিয়া জীব হৃদয়ে 'চাই' এর উদয় হয়। যে কোন ভাবেই হউক নিজের অন্তর্নিহিত 'চাই' কে না ফুটাইতে পারিলে 'পাই' এর সন্ধান পাওয়া যায় না। 'পাই' এর সঙ্গে যোগ না হওয়া পর্যন্ত নিত্যানন্দের বিলাস কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে?

১৫. ১. ৪৫

প্রকৃতির পরিণাম সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিতেছি। সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহা হইতে তত্ত্ব-বিষয়ে দিগ্দর্শন হইতে পারিবে।

সাংখ্য মতে প্রকৃতি নিত্য পরিণামিনী অর্থাৎ পরিণাম প্রকৃতির স্বভাব। প্রকৃতি পরিণত না হইয়া ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিতে পারে না। প্রকৃতির পরিণাম প্রতিক্ষণই হইতেছে। কিন্তু এই পরিণাম হইতে সৃষ্টির উদয় হইবেই এমন কোন কথা নাই। সৃষ্টি অবস্থাতেও পরিণাম আছে, প্রলয় অবস্থাতেও পরিণাম আছে। কারণ, প্রকৃতি সর্ববিধ অবস্থায়ই পরিণাম-যুক্ত। কিন্তু এই দুইপ্রকার পরিণামে পরস্পর পার্থক্য আছে। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থারূপ। সৃষ্টি প্রকৃতির বিকারস্বরূপ। যতক্ষণ গুণক্ষোভ হইয়া বিকারের উৎপত্তি না হয় ততক্ষণ প্রকৃতি সাম্যাবস্থাতেই অবস্থিত থাকে। কিন্তু এই সাম্যাবস্থাতেও তাহার পরিণাম অব্যাহত থাকে। এই পরিণামের কোন উদ্দেশ্য নাই কারণ, সৃষ্টিরচনা ইহার উদ্দেশ্য নহে। ইহা প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ। সত্ত্বগুণ সত্ত্বরূপে, রজোগুণ রজোরূপে এবং তমোগুণ তমোরূপে পরিণত হওয়ার নাম সদৃশ পরিণাম। এই অবস্থায় তিনটি গুণের পরস্পর সংমিশ্রণ হয় না। এইপ্রকার সংমিশ্রণ না হইলে সৃষ্টি কার্যের উদ্ভব হইতে পারে না। এই পরিণামকে সদৃশ পরিণাম বলে। পরস্পর বৈষম্যযুক্ত পরিণামকে বিসদৃশ পরিণাম বলে। বিসদৃশ পরিণামে তিনটি গুণ স্বতন্ত্র বা পৃথক্ থাকিতে পারে না—পরস্পর মিলিত হইয়া একটি কার্য উৎপন্ন করে এবং মিলিত হওয়ার সময় উহাদের সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হয়। তখন একটি গুণ প্রধান হইয়া কেন্দ্রস্থান অধিকার করে ও অপর দুইটি গুণ অপ্রধানভাবে ঐ প্রধান গুণের আশ্রিতভাবে তাহাকে আবর্তন করিতে থাকে। প্রধান গুণে শুধু যে গুণগত প্রাধান্য থাকে তাহা নহে, গুণে মাত্রাগত প্রাধান্যও থাকে। অপ্রধান গুণের মধ্যেও মাত্রাগত উৎকর্ষ অপকর্ষ প্রভৃতি রহিয়াছে। শুধু ইহাই নহে। যে সকল গুণ কোন কার্যের আকর্ষণে উদ্রিক্ত হইয়া পরস্পর সংশ্লিষ্ট হয় তাহাদের পরস্পরের উপর পরস্পরের ক্রিয়া, পরস্পর ব্যবধান, দিক্ সম্বন্ধীয় স্থিতি, পরস্পর আভিমুখ্যের তারতম্য—এই সকল নানা কারণে কার্যের বৈশিষ্ট্য হইয়া থাকে। প্রত্যেকটি বিকার বা কার্যের উপাদান একই প্রকৃতি ইহা সত্য, তথাপি জগতে অনন্তপ্রকার কার্য পরস্পর বিভিন্নরূপে বর্তমান রহিয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ গুণত্রয়ের সংখ্যা ও মাত্রাগত ভেদ এবং পরস্পর অবস্থানের ও কার্যকারিতার বৈশিষ্ট্য। সৃষ্টির

মূলে ইচ্ছা বর্তমান, কারণ ইচ্ছা ব্যতিরেকে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা চ্যুত হইতে পারে না। ইচ্ছা নির্বিষয় হয় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে ইচ্ছার যাহা বিষয় তাহাই দ্রষ্টব্য ভাব। অর্থাৎ তিনটি গুণ ক্ষুব্ধ হইয়া ঐ ভাবে পরিণাম প্রাপ্ত হয়, ইহাই সৃষ্টির উদয়। এই যে ক্ষোভের কথা বলা হইল ইহা পরিণামাত্মক ব্যাপার নহে কারণ, পরিণাম তো প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম। ক্ষোভ হইতে পরিণাম হয় না। ক্ষোভ হইতে পরিণামের বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয় অর্থাৎ কি প্রকার পরিণাম হইবে তাহাই ক্ষোভের উপর নির্ভর করে। ক্ষোভের মূল ইচ্ছা। পরিণামের মূল ইচ্ছা নহে কিন্তু প্রকৃতির স্বভাব।

সদৃশ পরিণামের সময় প্রকৃতির অবয়বগুলি নিরন্তর নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। অর্থাৎ সত্ত্বগুণ প্রতিক্ষণেই সত্ত্বগুণ-রূপেই স্ফুরিত হইতে থাকে। ইহার জন্য ইচ্ছার আবশ্যকতা হয় না। এই-প্রকার অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। ইহাই প্রকৃতির কার্যোন্মুখতা। এই অবস্থা নিরুদ্ধ হইলে প্রকৃতি হইতে কোন কার্য উৎপন্ন হইতে পারে না। তখন প্রকৃতি জননীরূপ ধারণ করেন না। করিলেও স্বয়ং নির্বিকার থাকিয়াই কার্যোৎপাদন করিতে সমর্থ হন। ইহাই প্রকৃতির কুমারী অবস্থা।

প্রকৃতি হইতে এই সদৃশ পরিণাম অপগত হইলে প্রকৃতির স্বরূপ বিলুপ্ত হইয়া যায়। তখন প্রকৃতি শুধু অব্যক্ত নহেন, পুরুষের সহিত অভিন্নতা প্রাপ্ত হন। যাঁহারা প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেন না তাঁহাদিগের পক্ষে প্রকৃতির এই নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক পরিণাম মানিবার আবশ্যকতা নাই। তাঁহাদের প্রকৃতি পুরুষে অস্তমিত হইয়া পুরুষের স্বশক্তিরূপেই বর্তমান থাকে। কিন্তু প্রচলিত সাংখ্য মতানুসারে প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার সদৃশ পরিণামও স্বীকার করিতে হয়। অর্থাৎ পরিণামটিকে প্রকৃতির স্বভাব বলিয়াই গণনা করিতে হয়।

জীবের ইচ্ছা উদ্ভূত হইয়া সংস্কাররূপে প্রকৃতিগর্ভে নিহিত থাকে। অনাদিকাল হইতে বহু ইচ্ছা এইপ্রকার উদ্ভূত হইয়া প্রকৃতিগর্ভে সুপ্তভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল ইচ্ছা বীজস্বরূপ। ইহারা কালশক্তি দ্বারা নিরন্তর পরিপক্ক হইতেছে। যখন এই পরিপাক ক্রিয়াপ্রভাবে কোন ইচ্ছা সম্পূর্ণ পরিণতি লাভ করে তখন উহা ফলরূপে অর্থাৎ কার্যরূপে উদ্বুদ্ধ হয়। দীর্ঘকাল মাতৃগর্ভে সন্তানের দেহ পুষ্ট হইতে হইতে যেমন পরিপূর্ণ পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঐ দেহ বহিষ্কৃত হয় তদ্রূপ যে কোন ইচ্ছারূপ সংস্কার বীজ কালশক্তির প্রভাবে যথার্থভাবে পরিপক্কতা লাভ করিলেই ফলরূপে ফুটিয়া বাহির হয়। তখনই উহা অর্থাৎ ঐ ফল ইচ্ছার আশ্রয়ভূত কর্তৃত্বসম্পন্ন জীবের ভোগ্যরূপে উপস্থিত হয়। এই যে ইচ্ছা হইতে ভোগ্য পদার্থের উদ্ভব ইহার জন্যই প্রকৃতির বিসদৃশ পরিণাম আবশ্যক। সদৃশ পরিণামবিশিষ্ট প্রকৃতি ফলোন্মুখ ইচ্ছার

প্রভাবে উক্ত ফলের আকার ধারণ করে। ফলাবস্থা—ভোক্তা জীবের ইন্দ্রিয়ের ভোগ্যাবস্থা। ত্রিগুণের পরস্পর মিশ্রণ না হইলে এই বিশিষ্ট ভোগ্য পদার্থের উদ্ভব হইতে পারে না।

ভোগ্যপদার্থ সৃষ্টির মূলে ভোগ্যপদার্থেরই সত্তা স্বীকার করিতে হইবে যদিও ঐ সত্তা অব্যক্ত। পতঞ্জলি যোগশাস্ত্রে প্রতি পদার্থের পাঁচটি অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন। এই পাঁচটি অবস্থার নাম – স্থূল, স্বরূপ, সূক্ষ্ম, অন্বয় ও অর্থবত্ত্ব। ইহাদের মধ্যে অর্থবত্ত্বই সর্বাপেক্ষা মৌলিক। এই অর্থবত্ত্ব আকারে ভোগ্যপদার্থের সত্তা সদৃশ পরিণাম বিশিষ্ট মূল প্রকৃতিকে স্পর্শ করিয়া থাকে। অর্থবত্ত্ব না থাকিলে প্রকৃতিতে বিসদৃশ পরিণাম উৎপন্ন হইবার অন্য কোনও বিশেষ কারণ পাওয়া যায় না।

অর্থবত্ত্ব কাহাকে বলে? চাই এই ভাব ইহাকেই অর্থবত্ত্ব বলে। যখন এই 'চাই' ভাব অর্থাৎ যাহাকে পূর্বে জীবের সুপ্ত ইচ্ছা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে পরিপক্কতা বশতঃ স্ফুরিত হয় তখনই এই 'চাই' ভাবের অনুকরণ করিয়া প্রকৃতিতে তদনুরূপ পরিণামের আবশ্যকতা হয়। যাহা idea ছিল তাহা এইভাবে actual রূপে পরিণত হয়। অর্থাৎ অর্থবত্ত্বটি একটি ছাঁচ বা mould, প্রকৃতি রসরূপে তাহাতে ঢলিয়া পড়ে এবং তাহার আকার ধারণ করে। পরিপূর্ণ স্থূল অবস্থা পর্যন্ত উপনীত হইতে মাঝে আরও তিনটি অবস্থা ভেদ করিয়া যাইতে হয়। এই সকল অবস্থার নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। পুরুষ নিষ্কাম হইলে প্রকৃতিতে অর্থবত্ত্ব থাকে না বলিয়া বিসদৃশ পরিণাম হইতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টি স্থগিত থাকে। এই যে অর্থবত্ত্ব ইহা ইচ্ছাত্মক হইলেও ভাবগত একটি আকার মাত্র। প্রকৃতিতে ইহার যোগ হইলে প্রকৃতি এই আকার ধারণ করিয়া থাকে। তাহাই সৃষ্ট পদার্থরূপে অর্থাৎ বিকৃতরূপে প্রকৃতির আত্মপ্রকাশ। প্রকৃতি তখনই কোন আকার গ্রহণ করিতে পারে যতক্ষণ ইহাতে দ্রুতি আছে। কারণ গলা বস্তুই আরোপিত আকার ধারণ করিতে সমর্থ হয়। প্রকৃতির এই গলা ভাবটি প্রকৃতির নিত্যসিদ্ধ সদৃশ পরিণামের দ্যোতক। প্রকৃতির কঠিন অবস্থা বা কাঠিন্য কোন ভাবকে অর্থাৎ সাকার সত্তাকে আপন করিয়া নিতে পারে না। সদৃশ পরিণাম শব্দে প্রকৃতির এই গলিত ভাবটাই লক্ষিত হইয়া থাকে।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে সদৃশ ও বিসদৃশ পরিণাম উভয়ই প্রকৃতির ধর্ম এবং সৃষ্টির জন্য উভয়ই আবশ্যক।

হৃদয় শব্দে কোন্ বস্তুটিকে বুঝায় তাহা সাধক মাত্রেরই জানিয়া রাখা আবশ্যক। কারণ, জ্ঞান ভক্তি প্রভৃতি সকল মার্গেই হৃদয় সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে ঠিক ভাবে সাধন পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। প্রাচীন কালে বৈদিক ঋষিগণ দহরবিদ্যা নামে এই হৃদয়-বিজ্ঞানেরই অনুশীলন করিতেন। হৃদয়টি যে আকাশস্বরূপ তাহা দহরাকাশ এই শব্দ দ্বারাও তাঁহারা ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। ইহাই অন্তরাকাশের নামান্তর। বাহিরে যেমন বিশাল অপরিচ্ছিন্ন আকাশ প্রতীতিগোচর হয় তেমনি দৃষ্টি অন্তর্মুখ হইলে ভিতরেও বিশাল অনন্ত আকাশের স্ফুরণ হইয়া থাকে। এই আকাশটিই হৃদয় নামে পরিচিত। দৃষ্টি যখন বহির্মুখ থাকে তখন ইন্দ্রিয়-গোচর জগৎ যে আকাশে প্রতিভাসমান হয় তাহাই বাহ্যাকাশ। তদ্রূপ দৃষ্টি অন্তর্মুখ হইলে দৃশ্য প্রপঞ্চ যে আকাশে পরিস্ফুরিত হয় তাহাই অন্তরাকাশ বা হৃদয়রূপী আকাশ। বস্তুতঃ এই দুই আকাশ যে একই আকাশ তাহা দৃষ্টির উভয়মুখী গতির সাম্য না হইলে বুঝিতে পারা যায় না।

এই হৃদয় আকাশে ইষ্টের স্ফুরণ হইয়া থাকে। যতদিন চিত্ত শুদ্ধ না হয় ততদিন অন্তরাকাশ তমসাচ্ছন্ন থাকে। চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার দূরীভূত হয় এবং স্বচ্ছ প্রকাশরূপে আন্তরদৃষ্টির সম্মুখে হৃদয়াকাশ উদ্ভাসিত হয়। ইহার পর স্বচ্ছ আকাশে জ্যোতির আবির্ভাবই জ্ঞানের সূচনা করে। বহিরাকাশে যেমন সূর্যের উদয় হয় অন্তরাকাশেও তেমনি দেবতা-রূপী সূর্যের আবির্ভাব হয়। সেই আলোকে তখন আকাশ আলোকিত হইয়া উঠে।

এই যে অন্তরাকাশের কথা বলা হইল, উপনিষদ্ ইহাকে পুণ্ডরীক অথবা কমল বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যতদিন এই কমল প্রস্ফুটিত না হয় ততদিন অন্তঃকরণ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে। যাহাকে ইষ্টদেবতার আবির্ভাব বলা হয় বস্তুতঃ তাহাই ভাবের বিকাশ। ভাবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পদ্ম উন্মীলিত হয়—অর্থাৎ হৃদয়াকাশ আলোকিত হয়। এই হৃদয়রূপী আকাশ অথবা পদ্মই ইষ্টদেবতার অর্থাৎ ভগবানের আসন। গীতাও অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন ঃ ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়াণি মায়য়া। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে সকলেরই হৃদয়ে অর্থাৎ অন্তর্যামী পুরুষরূপে পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। তিনি ঐ শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আপন অচিন্ত্য মায়াশক্তি দ্বারা দেহকে নিরন্তর চালনা করিতেছেন। দেহের প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির মূলে হৃদয়স্থিত পুরুষোত্তমের

প্রেরণা ভিন্ন অন্য কোন কারণ বর্তমান নাই। অহংকারে আবিষ্ট জীব তাহার যাবতীয় জ্ঞান ও ক্রিয়াতে অভিমান করে। জানিবার কর্তা সে এবং করিবার কর্তাও সেই অর্থাৎ সেই জানে এবং সেই করে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা তাহার অভিমান মাত্র। প্রকৃত কথা এই যে সে জানেও না বা করেও না। সে শুধু দ্রষ্টামাত্র। জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তির খেলা। এই শক্তি মায়ারূপিণী—যাহার আশ্রয় এবং অধিষ্ঠাতা তাহার হৃদয়স্থিত অন্তর্যামী পুরুষ। এই সিদ্ধান্তটি স্পষ্টভাবে ধরিতে পারিলেই জীব কর্মবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করে।

এই হৃদয়কে উপলব্ধি করিবার জন্য অথবা প্রাপ্ত হইবার জন্য অসংখ্য পথ রহিয়াছে। যোগ্যতা এবং ব্যক্তিগত স্থিতি অনুসারে যে কোন পথ ধরিয়া এই হৃদয়রূপী শূন্যে উপনীত হওয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র হইতে দেহের বহির্ভাগে বাহ্য বায়ুমণ্ডলে অসংখ্য নাড়ী বা রশ্মি বিস্তৃত রহিয়াছে। জীব দেহত্যাগ করিয়া বাহিরে সঞ্চরণ করিবার সময় ঐ সকল মার্গ অবলম্বন করিয়াই চলিতে থাকে। তদ্রূপ ঐ ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্র হইতে দেহের অন্তঃপ্রদেশেও অসংখ্য নাড়ী বা রশ্মি জালের মত বিকীর্ণ রহিয়াছে। সাধারণতঃ আভ্যন্তরীণ বায়ুর প্রকোপ এবং বৈষম্য-বশতঃ এই সকল নাড়ী জটিল এবং কুটিল আকার ধারণ করিয়া পরস্পর কাটাকাটি করিয়া চারিদিকে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এইজন্যই এই জালটিতে অসংখ্য গ্রন্থি দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলিকে চিত্তগ্রন্থি বলে। ঐ জালের তারগুলিও সরল এবং সমসূত্র নহে। এইজন্যই চিত্তে নানা প্রকার বিক্ষিপ্ত বৃত্তির উদয় হয়। যখন ক্রিয়াকৌশলে অথবা ভাবনার প্রভাবে অথবা জ্ঞান বা ভক্তিতে নিষ্ঠার ফলে ভিতরে তীব্র তেজের আবির্ভাব হয় তখন ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্র রশ্মি সংযত হইয়া এবং বক্রতা পরিহারপূর্বক একাকার ধারণ করে। ক্রমশঃ গ্রন্থিগুলিও শিথিল হইয়া মুক্ত হইয়া যায়। এই প্রক্রিয়ার পরিণামে গ্রন্থিহীন, জটিলতা এবং কুটীলতাহীন, বক্রতাহীন—একটি সরল পথ খুলিয়া যায়, যাহাতে ভীম বেগে গর্জন করিতে করিতে শক্তিপ্রবাহ উত্থিত হইতে থাকে। এই শক্তির ধারা যেখানে পর্যবসিত হয় তাহাই শূন্য স্থান বা হৃদয়াকাশ। সমস্ত শক্তিপ্রবাহ নিঃশেষ হইয়া গেলে বায়ুর ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয় এবং মনেরও ক্রিয়া নিরুদ্ধ হয়—ইহাই হৃদয়ে স্থিতি। এখান হইতেই মন্ত্ররূপে চৈতন্যশক্তি উত্থিত হইয়া ক্রমশঃ ভগবদ্ধামের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। ইহা উর্ধ্বগতির অবস্থা।

পূর্বকথিত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে মনুষ্যের বৃত্তিসকল অন্তর্মুখ হইয়া যেখানে উপরত হয় তাহাই হৃদয়। যদি সেই অবস্থায় জাগ্রৎভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখা যায় তাহা হইলেই মন্ত্রচৈতন্য উপলব্ধি হয়, নতুবা উহা সুষুপ্তির নামান্তর।

২৫. ৯ ৪৪

২২

আপনি যে নাদধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন যদি কোন প্রতিবন্ধক না হয় তাহা হইলে ঐ ধ্বনিই আপনাকে ক্রমশঃ উঠাইয়া লইয়া যাইবে এবং সত্য বস্তুর সন্ধান দান করিবে। নাদ হইতে মহানাদে উপস্থিত হইতে না পারিলে গুরুদর্শন হয় না। নাদ হইতে ক্রমশঃ উর্ধ্বগতি অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন স্তরসমূহ ভেদ করিতে করিতে নাদের মূল প্রস্রবণ মহানাদের সাক্ষাৎকার হয়। নাদ ভিন্ন মনকে শুদ্ধ করিবার দ্বিতীয় কোন উপায় নাই। অসংখ্য কর্মসংস্কার ও বাসনা শুদ্ধ মনে জড়িত হইয়া মনকে আবর্জনাযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। মনের স্থূলত্বের ইহাই কারণ। এই স্থূলতাবশতঃই মন ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া নিরন্তর বহির্মুখে প্রধাবিত হয় এবং বিষয় গ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। নাদের প্রভাবে মনের আবর্জনা ক্রমশঃ দূর হইতে থাকিলে মন ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম অবস্থা লাভ করিতে থাকে, এবং তদনুরূপ মনের অন্তর্মুখ গতিও সিদ্ধ হয়। মনের নির্মলতা সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হইলে মনকে ইন্দ্রিয়বর্গ আকর্ষণ করিয়া বাহির করিতে পারে না। বস্তুতঃ ঐ সময় মন ইন্দ্রিয়ের অধীন থাকে না। মনের যেটা স্থিতিভূমি সেখানে ইন্দ্রিয়স্রোত প্রবিষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং মনের ঐ অবস্থায় রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময় বাহ্যজগৎ মনকে বিচলিত করিতে পারে না—ইহাই মনের স্থিরতা। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইলে উর্ধ্ব আকর্ষণের প্রভাবে মন ক্রমশঃ উর্ধ্বদিকে উন্নীত হয়। মনের উর্ধ্বগতির অনুপাতে চৈতন্যশক্তির বিকাশ ক্রমশঃ সম্পন্ন হয়। প্রথমে শোধন তাহার পরে বোধন—ইহাই নিয়ম। মন শুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ প্রবুদ্ধ হইতে থাকে। অন্তর্মুখী গতি দ্বারা মন ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ হইতে অব্যাহতি লাভ করে এবং অচল অবস্থায় স্থিত হয়।

উর্ধ্বমুখী গতি দ্বারা স্থির মন ক্রমশঃ চৈতন্যশক্তিরূপে পরিণত হইতে থাকে। যে স্থানে উর্ধ্বগতির অবসান ঐখানে মন নিবৃত্ত হইয়া একমাত্র চৈতন্য-শক্তিই বিরাজমান থাকে। ইহাই মনের উন্মনী অবস্থা। এইখান হইতেই ভগবদ্দর্শনের পথের সন্ধান লাভ করা যায়। মনোরাজ্যে অবস্থান করিয়া যথার্থ ভগবদ্দর্শন সম্ভবপর নহে। আপনি যে নাদধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন যদি উহা অখণ্ডিতভাবে চলিতে থাকে তাহা হইলে উহা হইতে মনের অন্তর্মুখী এবং উর্ধ্বমুখী উভয় গতিই সিদ্ধ হইবে এবং চরম অবস্থায় আত্মাতেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ফুটিয়া উঠিবে। বিন্দু অর্থাৎ মহামায়া স্পন্দিত

হইয়া নাদরূপে পরিণত হয়। মহামায়া কুণ্ডলিনী শক্তিরই নামান্তর। দ্বৈতবাদিগণ ইহাকে চিদাকাশ বলিয়াও বর্ণনা করিয়া থাকে। চিৎশক্তির সংঘর্ষে চিদাকাশ স্পন্দিত হইয়া যখন চৈতন্যরূপে শব্দ অথবা নাদে পরিণত হয় তখনই সদ্গুরুর অনুগ্রহশক্তির কিরণ বিকীর্ণ হইতে থাকে। কারণ, এই নাদরূপে চৈতন্য জ্যোতিঃকে আশ্রয় করিয়াই জীবকে পরমপদে পৌঁছিতে হইবে। নাদানুসন্ধানকে লয়ের প্রধান উপায় বলিয়া শাস্ত্রকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাই তাহার তাৎপর্য। যতক্ষণ নাদ স্বতঃসিদ্ধভাবে স্ফুরিত না হইতেছে ততক্ষণ মনকে সংলগ্ন করিবার কোন আধার পাওয়া যায় না। কিন্তু যাহার নাদ খুলিয়া গিয়াছে তাহার পক্ষে মনের সংস্কার করিবার জন্য পৃথক্ প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না। গঙ্গোত্রী হইতে গঙ্গাপ্রবাহ অবতীর্ণ হইয়া যেমন সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইতে থাকে ঠিক সেইপ্রকার বিন্দু হইতে নাদ উত্থিত হইয়া মহাজ্যোতির দিকে নিরন্তর প্রবাহিত হইতে থাকে। নাদাভ্যাসই বস্তুতঃ কর্ম। ইহাই ক্রমশঃ জ্ঞানে পর্যবসিত হয়। কারণ প্রবৃত্তিমুখে যাহা ধ্বনি, নিবৃত্তিমুখে তাহাই জ্ঞান। যে চিদাকাশ হইতে নাদরূপে ধ্বনি উত্থিত হইতেছে মনঃসংযোগের সঙ্গে সঙ্গে যখন সেই ধ্বনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পুনর্বার স্বীয় উৎপত্তিস্থান চিদাকাশে উপনীত হইবে তখন আর ধ্বনি শ্রুত হইবে না এবং মনের সত্তাও অনুভব করিতে পারা যাইবে না—ইহাই আত্মজ্ঞানবিকাশের সন্ধিক্ষণ। বস্তুতঃ শব্দ তখন থাকে না এমন নহে। কিন্তু মনের গতি নিরুদ্ধ হওয়ার দরুন ইহা নিরুদ্ধ হয়। সেইজন্য চৈতন্যক্ষেত্রে আত্মস্বরূপ ভাসিয়া উঠে। কারণ, শব্দ হইতেই জগতের সৃষ্টি। যখন শব্দের গতি রোধ হইয়া যায় তখন জগৎ দর্শন থাকে না বলিয়া নিত্যসিদ্ধ একমাত্র আত্মস্বরূপই স্বপ্রকাশে বিরাজ করে। এই বিষয়ে অন্যান্য সূক্ষ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ হইলে বলিব।

১৬.৮.৪৩

২৩

চিত্ত শুদ্ধ না হইলে উপাসনায় অধিকার জন্মে না। চিত্ত অনাদি সংস্কার ও বাসনার আবরণে নিরন্তর আচ্ছন্ন রহিয়াছে। এইসকল সংস্কার ভৌতিক খণ্ডসত্তার ছায়ামাত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত চিত্ত হইতে এই ভৌতিক আবরণ অপসারণ করা না যাইবে ততক্ষণ পর্যন্ত চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না। সংস্কার সকল বৃত্তি হইতে উৎপন্ন হয়। আমরা এখানে ক্লিষ্ট সংস্কারকেই সংস্কার বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। অক্লিষ্ট সংস্কারও সংস্কার পদবাচ্য। তাহাও চিত্তের আগন্তুক ধর্ম। চিত্ত যখন বৃত্তিরূপে পরিণত হয়, তখন ঐ বৃত্তির সম্মুখে যে আত্মা উপস্থিত থাকে তাহাদ্বারা ঐ বৃত্তি রঞ্জিত হয়। বৃত্তির উপশম হইলেও রং-এর কিঞ্চিৎ আভাস রেণুরূপে চিত্তে বর্তমান থাকে। এইগুলি চিত্তকে জালের মতন জড়াইয়া রাখে এবং পুনর্বার ইহাদের সজাতীয় বৃত্তি উৎপাদনের জন্য প্রণোদিত করে। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে এইসকল সংস্কার কুয়াসার ন্যায় চিত্তকে ঢাকিয়া ফেলে। যতদিন এইসকল কুয়াসারূপী বাষ্প চিত্ত হইতে দূর না হইতেছে ততদিন চিত্তশুদ্ধি অসম্ভব। পূর্বে বলা হইয়াছে অন্তঃকরণ বৃত্তির যাহা বিষয় তাহাই বিক্ষিপ্ত হইয়া চিত্তক্ষেত্রে সংস্কাররূপে আহিত হয়। ইহা বস্তুতঃ বিষয়েরই অংশ-স্বরূপ। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, চিত্তমধ্যে পঞ্চভূত অথবা ভৌতিক সত্তার যে অংশ রহিয়াছে তাহাই চিত্তের আবরণ। পক্ষান্তরে ভৌতিক সত্তা সম্বন্ধেও ঐ একই নিয়ম বুঝিতে হইবে। সকাম পুরুষের চিত্ত, বৃত্তিরূপে যে পদার্থ উপস্থিত হয় সেই পদার্থে কিঞ্চিৎ অংশে প্রবিষ্ট হয় এবং উহা ঐ পদার্থের অংশরূপে সর্বদার জন্য বর্তমান থাকে। এইপ্রকারে আমাদের দৃষ্টি অথবা ভোগবৃত্তির তারতম্যানুসারে দৃশ্য ও ভোগ্য পদার্থমাত্রেই চিত্তের কিঞ্চিৎ অংশ নিহিত থাকে। চিত্তের অংশ ভূতে থাকিবার দরুণ ভূত অশুদ্ধ থাকে এবং ভূতের অংশ চিত্তে থাকিবার দরুণ চিত্ত অশুদ্ধ থাকে। চিত্ত স্বচ্ছ পদার্থ, ইহাতে ভৌতিক পদার্থের অংশ পড়িলেই ইহা মলিন হইতে থাকে। যে ভৌতিক পদার্থের অংশ ইহাতে থাকে ঠিক তাহাতেই এই চিত্তের কিঞ্চিৎ অংশ পতিত হয়। এইজন্য চিত্ত হইতে ভৌতিক অংশ অপসারণ করিলে উহা আপনাপন আশ্রয়ে প্রত্যাগমন করে। ইহার ফলে ঐ সকল আশ্রয়ে বিদ্যমান চিত্তের অংশ ফিরিয়া আসে এবং পুনর্বার চিত্তে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে বিক্ষিপ্ত চিত্ত একাগ্রতা লাভ করে। কারণ, চিত্তের যাবতীয় অংশ যাহা বিক্ষিপ্তভাবে চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছিল, চিত্তে ফিরিয়া আসিলে চিত্তের দুর্বলতা বিদূরিত হয় এবং উহা পূর্ণ হইয়া

অখণ্ড বিন্দুরূপে একাগ্র অবস্থা লাভ করে। পক্ষান্তরে, পঞ্চভূত হইতে চিত্তের অংশ চলিয়া যাওয়ার ফলে একদিকে যেমন পঞ্চভূত শুদ্ধ হয়, অপরদিকে তেমনি ভৌতিক অংশ ফিরিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চভূতের পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে। এই দেহ পঞ্চভূতে নির্মিত, মূলাধার প্রভৃতি পঞ্চচক্রের কেন্দ্রে পঞ্চভূতের অধিষ্ঠান। যতক্ষণ ভূতশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধি না হয় ততক্ষণ ভূত ও চিত্তের পরস্পর সম্বন্ধ নষ্ট হয় না। ভূত শুদ্ধ হইয়া গেলে শুধু যে পঞ্চভূত হইতে চিত্তের অংশ দূর হয় তাহা নহে, পঞ্চভূতের মধ্যেও পরস্পরের অংশ দূর হইয়া যায়। পঞ্চভূতের অশুদ্ধি নষ্ট হইলে শুদ্ধভূতের দেহ অবশিষ্ট থাকে। ইহাতে চিত্তের অংশ থাকে না এবং পঞ্চভূতের মধ্যে পরস্পর সাম্যভাব থাকে। বস্তুতঃ ইহা বিশুদ্ধ দেহ তাহাতে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে চিত্তশুদ্ধি সম্পন্ন হইলেও তাহা হইতে ভৌতিক অংশ অপসৃত হয় বলিয়া উহা শুদ্ধ চিত্তরূপে প্রকাশমান থাকে। এইভাবে চরম অবস্থায় ভূত এবং চিত্ত উভয়ের মধ্যেই সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাম্যময় দেহই শুদ্ধ দেহ। ইহাতে সবই আছে অথচ একের উপর অন্যের প্রাধান্য নাই। শুদ্ধদেহ প্রাপ্তিরূপ এই সাম্যাবস্থা উপলব্ধি করিয়া উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। তখন এই সাম্যময় আধারে মহাজ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইলে জ্ঞানের বিকাশ সম্পন্ন হয়।

সাধারণতঃ লোকে চিত্তশুদ্ধি বলিতে যাহা বুঝে, প্রকৃত চিত্তশুদ্ধি তাহাপেক্ষা অনেক অধিক। প্রকৃত ভূতশুদ্ধিও তাহাই। উপাসনার জন্য সর্বপ্রথমে শুদ্ধ আধার আশ্রয় করা একান্ত আবশ্যক, নতুবা দিব্যজ্ঞানরূপ অমৃত ধারণ করিতে পারা যায় না।

যখন ভৌতিক সত্তা হইতে চিত্তের অংশ দূরীভূত হয় তখন উহা শুদ্ধিলাভ করে। বস্তুতঃ চিত্ত যেমন স্বভাবতঃ শুদ্ধ তেমনি ভূতও স্বভাবতঃ শুদ্ধ। ভৌতিক দেহ যতক্ষণ ভূতসমষ্টির সাম্যাবস্থারূপে বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ উহা শুদ্ধ দেহ, উহা নির্বিকার। উহাতে গুণপ্রধান ভাব নাই। উহা লৌকিক দৃষ্টির অলক্ষ্য হইলেও অত্যন্ত সত্যবস্তু। সাম্যাবস্থার দরুণ একমাত্র উহাই চৈতন্য শক্তি ধারণের যোগ্য। এই শুদ্ধ দেহ লৌকিক ইন্দ্রিয়গোচর নহে। ঐ সাম্যময় আধারটিকে একপক্ষে যেমন শুদ্ধ দেহ বলা চলে অপরপক্ষে উহাকে শুদ্ধচিত্তও বলা চলে। বস্তুতঃ শুদ্ধ দেহ ও শুদ্ধ চিত্তে কোন ভেদ নাই। আধার শুদ্ধ না হইলে তাহাতে অমৃত ঢালা যায় না।

৩. ৮. ৬৪

কোন একটি দৃশ্যকে সর্বদার জন্য দর্শন করিতে পারা যায় কিনা? ইহার উত্তর এই, নিশ্চয়ই যায়। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে 'সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ' এই কথার কোন অর্থই থাকিত না। সর্বদা দর্শন করিতে হইলে কিপ্রকার যোগ্যতা আবশ্যক? আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি দৃশ্য পরিণামী অর্থাৎ পরিবর্তনশীল অর্থাৎ সর্বদা একরূপ লইয়া বর্তমান থাকে না। দৃশ্য নিরন্তর পরিবর্তিত হইতেছে। সুতরাং দ্রষ্টা স্থির থাকিলেও একই দৃশ্য নিরন্তর দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। এইপ্রকার সংশয় বস্তুতঃ অমূলক সংশয়। যাঁহারা রহস্যবিদ্ তাঁহারা এইপ্রকার সংশয়কে অমূলক বলিয়া মনে করেন না। ইহার কারণ পরে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে একটিকে স্থির ধরিয়া অপরটিকে গতিশীল মানিয়া লইলে গণনার কার্যে বাধা হয় না। দুইটিই যদি স্থির হইত অথবা দুইটিই যদি গতিশীল হইত তাহা হইলে স্থিতি ও গতি কোনটাই উপলব্ধি হইত না। ঠিক তদ্রূপ দৃশ্যকে পরিণামী মানিয়া লইয়া দ্রষ্টাকে স্থির মানিয়া নিলে বিশিষ্ট দৃশ্যের নিত্যদর্শন সম্ভবপর হয় না। কারণ, দৃশ্য পরিবর্তনশীল বলিয়া যে ক্ষণে যে দৃশ্যটি প্রকট সেইক্ষণে সেই দৃশ্যের দর্শন হইয়া থাকে। কিন্তু একই বিশিষ্ট দৃশ্যকে সর্বদা দর্শন এইভাবে হয় না। কালের চক্র আবর্তনশীল। এই আবর্তনে যে বৃত্ত রচিত হয় তাহাতে স্বভাবতঃ ৩৬০টি কলা আছে। দ্রষ্টা যখন এই ৩৬০ কলার সমষ্টিরূপ বিন্দুকে আশ্রয় করিয়া দর্শন করে তখন দৃশ্য নিত্যরূপে দৃশ্যমান হয়। এই পূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে দৃশ্যের তিরোধান হয় না। বিন্দুতে অধিষ্ঠিত হইয়া দ্রষ্টা অখণ্ডমণ্ডলাকার দৃশ্য দর্শন করে। প্রত্যেকটি দৃশ্যই এই দর্শনে নিত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে।

ক্ষণিকের দ্রষ্টা দৃশ্যের ক্ষণিকরূপই দর্শন করিয়া থাকে। দৃশ্যের নিত্যরূপ তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না ইহার কারণ এই যে দ্রষ্টা আবর্তমান কালচক্রে অধিষ্ঠিত। দ্রষ্টা যদি পরিধি হইতে না দেখিয়া কেন্দ্র হইতে দর্শন করে অর্থাৎ বিন্দুতে আসীন হইয়া দর্শন করে অর্থাৎ ৩৬০ কলার সমষ্টিতে অধিষ্ঠিত হইয়া দর্শন করে তাহা হইলে সে দৃশ্যের নিত্যরূপ দর্শন পাইবেই। এই অবস্থায় সর্বদা দর্শন স্বভাবসিদ্ধ।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারিবে কালিক দর্শন মাত্রই ক্রমবদ্ধ

দর্শন। মধ্য বিন্দুতে অধিষ্ঠিত হইয়া যে দর্শন তাহা কালিক দর্শন নহে। এইজন্য এই দর্শনে ক্রম থাকে না। উহাতে একই সঙ্গে দৃশ্যের সমস্ত অংশের বিশিষ্ট দর্শন নিহিত থাকে। দৃশ্যের পূর্ণরূপ পাইতে হইলে দ্রষ্টাকেও পূর্ণ আধারে আসন গ্রহণ করিতে হয়। পরিধি ও কেন্দ্রের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ এই, পরিধি বহু বিন্দুবিশিষ্ট। এই বহু সংখ্যা বস্তুতঃ অনন্তেরই বাচক। কেন্দ্র অভিন্ন এক বিন্দু অথচ এক হইয়া তাহা বহু অর্থাৎ অনন্ত। তদ্রূপ পরিধি বহু হইয়াও এক, কারণ ইহা একই বৃত্তরূপে কল্পিত হয়। বিন্দু সংখ্যা অনন্ত হইলেও বৃত্তিরূপে এই অনন্ত সংখ্যা ঐ একেরই অন্তর্গত। উভয়ে অর্থাৎ কেন্দ্র ও পরিধিতে অনন্ত আছে বলিয়াই পরিধির প্রত্যেক বিন্দুর অনুরূপ অংশ কেন্দ্রে বর্তমান আছে এবং এই উভয়ের সহিত যোগসূত্রও বিদ্যমান। ইহাকে ব্যাসার্ধ অথবা Radius বলে। পরিধি হইতে কেন্দ্রে যাইবার ইহাই সরল মার্গ। পক্ষান্তরে কেন্দ্র হইতে সৃষ্টিক্রমে ইহাই বিকীর্ণ হইয়া পরিধিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং কেন্দ্র এক হইয়াও অনন্ত এবং পরিধির প্রতিরূপক। তাই ইহাতেও ৩৬০ কলা বর্তমান আছে স্বীকার করিতে হয় অথচ এই ৩৬০ কলা এক মহাকলারূপে অদ্বৈতভাবে প্রকাশমান। কেন্দ্রের একত্ব এই অদ্বৈতভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত সুতরাং কেন্দ্র বা মধ্যবিন্দু হইতে যখন দ্রষ্টা দৃশ্যকে দর্শন করেন তখন দৃশ্যের একদেশ দর্শন হয় না। এক অখণ্ড দর্শনেই সমগ্র দৃশ্যটি দৃষ্টিগোচর হয়। অর্থাৎ এক অভিন্ন দৃশ্য দর্শনের মধ্যে অনন্ত বিশিষ্ট দৃশ্যের বিশিষ্ট দর্শন যুগপৎ বর্তমান থাকে। ইহারই নাম দ্রষ্টার কাললঙ্ঘন।

দ্রষ্টা যখন কালের অতীত, তখন দৃশ্য যে অপরিণামী তাহাতে আর সন্দেহ কী? অতএব দৃশ্যও ব্রহ্মই। ইহারই নাম ব্রহ্মদর্শন—যাহা কালের প্রভাবে প্রভাবিত হয় না। এই অখণ্ড দর্শন দ্রষ্টা দৃশ্য এবং দৃষ্টির অভেদাত্মক স্বপ্রকাশ চৈতন্য।

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব ত্বমেব সর্বং মম দেব।"

এই শ্লোকটি জ্ঞানোদয়ের পরে ভক্তি সঞ্চারের মুখে যে ভাব প্রকট হয় তাহারই বর্ণনাভাস। জ্ঞানের উদয় হইলে জগতে একমাত্র আত্মা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কোন বস্তু থাকে না। আত্মা স্বয়ংপ্রকাশ আনন্দময় চৈতন্যস্বরূপ। এক এবং অখন্ড চৈতন্যরূপে আত্মাই তখন বিদ্যমান থাকেন। তখন দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি বা বস্তু তো থাকেই না। তাছাড়া এমন কি দ্বিতীয় ভাবও থাকে না। প্রকৃত প্রস্তাবে তখন আমিত্বের বিকাশও থাকে না। এই অবস্থা ভাবাতীত অর্থাৎ আমি ও তুমি ভাবের অতীত। বিশুদ্ধজ্ঞানের পরিণতিতে এই অবস্থাতে স্থিতি হইয়া থাকে। কিন্তু যখন ভগবানের অথবা ভগবৎ ভক্তের অনুগ্রহ বশতঃ আত্মাতে মুক্ত অদ্বৈতভাবাপন্ন আত্মারূপে ভক্তির বীজ বপন হয় অর্থাৎ ভক্তিভাবের সঞ্চার হয় তখন এই অখন্ড অদ্বৈত সত্তা আপনাতে আপনি দুলিতে থাকে। ইহাই ভাবাবেশ, যাহার পূর্ণ উৎকর্ষ হইতে মহাভাবের বিকাশ পর্যন্ত হইতে পারে। এই আন্দোলনের ফলে যে ভাবের উদয় হয় তাহা ভগবৎ কৃপালব্ধ ভক্তিবীজের অংকুর। এই সময় ভাবাতীত সত্তা ভাবরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যে কোনপ্রকার খন্ডভাবে প্রকাশিত হইয়া পূর্বে সর্বপ্রথম একটি অখন্ডভাব উত্থিত হয়। এই অখন্ডভাব আশ্রয় এবং বিষয়রূপ দুইটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই ভাবের যে আশ্রয় সে আমি, এবং এই ভাবের যে বিষয় সে তুমি। পূর্বোক্ত বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে মহাসত্তাতে পূর্বে আমি এবং তুমি কোন ভাবই ছিল না। সেই মহাসত্তাই ভগবৎ কৃপার প্রভাবে ভাবাবেশের ফলে আমি এবং তুমিরূপে পরস্পর অভিমুখ হইয়া প্রকটিত হয়। আমি = ভাবের আশ্রয়, অর্থাৎ ভক্ত, তুমি = ভাবের বিষয়, পাত্র অর্থাৎ ইষ্ট।

সর্বপ্রথম এই ইষ্ট, ভাবের বিষয়রূপে এক হইয়াও অনন্তরূপে প্রতিভাসমান হন। এই অখন্ড ব্যাপক ইষ্টভাবই তুমি পদের বাচ্যার্থ। অর্থাৎ শ্লোকে যে তুমি শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা শুদ্ধজ্ঞানের অনন্তর ভক্তির উন্মেষের ফলে উত্থিত এই ব্যাপক ইষ্টভাবকে উদ্দেশ্য করিয়া করা হইয়াছে। ইনি এক হইলেও অনন্ত, এইজন্যই মাতৃভাব পিতৃভাব সখ্যভাব গুরুভাব প্রভুভাব প্রভৃতি

যাবতীয় ভাব এই এক বিরাট ভাবের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। অতএব বুঝিতে হইবে এই ভক্তি শুদ্ধা ভক্তি নহে। ইহাতে জ্ঞানের মিশ্রণ রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এই ভক্তির মুখ্য পাত্র পিতা নহে মাতা নহে সখা নহে প্রভু নহে কেহই নহে অথচ তুমিরূপে পিতাও বটে মাতাও বটে সখাও বটে প্রভুও বটে। জগতে যত প্রকার সম্বন্ধ সম্ভবপর সকল ভাবেতে সমন্বয় এই তুমিতেই হইয়া থাকে।

২৬

বৈন্দব দেহের অবসান হয় না, তবে অতিক্রম হইতে পারে। কারণ বৈন্দব দেহ বিশুদ্ধ বলিয়া প্রাকৃত দেহের ন্যায় ইহার ধ্বংস হয় না, কিন্তু ধ্বংস না হইলেও সংকোচ অবশ্যই হইয়া থাকে। যে বস্তুর ধ্বংস হয়, তাহা সান্ত। যাহার ধ্বংস হয় না তাহা অনন্ত। ইহা সংকুচিত ও প্রসারিত হইতে পারে। যখন আত্মা শিবত্ব লাভ করে তখন ইহার সংকোচ হয়। এক হিসাবে ইহাকে অবসান মনে করা চলে। বাস্তবিক পক্ষে ইহা অবসান নহে।

আত্মা চিৎস্বরূপ এবং নিত্য চিৎশক্তিসম্পন্ন—তাই শিবত্বই ইহার স্বভাব। আত্মার এই স্বভাবে স্থিতিই পূর্ণত্ব। পূর্ণত্ব অখণ্ড। সেইজন্য ইহা বিকল্পাতীত পরমপদ নামে পরিচিত। এই অবস্থা বা পদকে লক্ষ্য করিয়া কোন প্রকার প্রশ্নের উদয় হইতে পারে না—যেখানে প্রশ্নই উঠে না, সেখানে সমাধানের সম্ভাবনা কোথায়?

কিন্তু বিকল্পাশ্রয়ে প্রশ্ন ও সমাধান উভয়ই সম্ভবপর। বস্তুতঃ পূর্ণ ও অখণ্ডকে সৎ বলা চলে না, অসৎও বলা চলে না, সদসৎ উভয়াত্মকও বলা চলে না এবং সৎ-অসৎ উভয়ের অতীতও বলা চলে না। আবার সবই বলা চলে। উভয়ই যুগপৎ। এইজন্যই ইহার ভাষা নাই—ইহা যুক্তি ও বিচারের অনধিগম্য।

* * * *

তথাপি মনোভূমিতে বিকল্প উঠিবেই। এইজন্য মনোভূমিতে অবস্থানকালে শুধু বিমর্শরূপে যখন পূর্ণত্বের বিচারধারা প্রবর্তিত হয় তখন পৃথক্ পৃথক পক্ষের অস্তিত্ব ও যুক্তি-যুক্ততা অপরিহার্য। এখানে যাহা কিছু বলিব তাহা এই পক্ষাবলম্বনপূর্বক জানিবে।

চিন্ময়দেহ লাভের কথা যে বলিয়াছ তাহা চিতের স্বাতন্ত্র্যমূলক। যেখানে দেহ আছে, সেখানে ভোগ্য আছে, দৃশ্য আছে, জগৎ আছে সবই আছে। মহামায়ার অতীত অবস্থায় জড় সম্বন্ধ থাকে না। তাহা বিশুদ্ধ চৈতন্যের অবস্থা। এই অবস্থা প্রাপ্ত অচিৎ হইতে বিবিক্ত হইয়া ভগবতী শক্তির অভিব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন হয়। অচিৎ হইতে পৃথক্‌কৃত চিৎ শুদ্ধ চিন্মাত্র —তাহা ভগবান নহে। পূর্বে চিৎ ও অচিতে অভেদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিবেক শুধু ভেদ সম্পাদন করিয়াই নিবৃত্ত হয়, অভেদ সাধন করে না। এই জন্যই চিৎশক্তির উন্মেষের এত মহিমা।

চিৎশক্তি উদ্রিক্ত হইয়া ক্রমশঃ অচিৎকে চিদ্রূপে পরিণত করে। এই অবস্থায় পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট হইয়া একত্ব লাভ করে। ইহা উভয়মুখী গতি দ্বারা পৃথক্ রূপে পুরুষের ও প্রকৃতির অদ্বয়ত্ব সাধনপূর্বক সিদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ পরাপ্রকৃতি আত্মবিসর্জন করিতে করিতে পরপুরুষের স্বরূপ গ্রহণ করে। এই পরপুরুষই তখন থাকে। পক্ষান্তরে পরমপুরুষও উক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা পরাপ্রকৃতিরূপে অদ্বয়ভাবে বিরাজ করে। চরমাবস্থায় উভয়ই সামরস্য বা পরমাদ্বৈত স্থিতি প্রাপ্ত হয়। ইহাই পূর্ণত্বের পরাকাষ্ঠা।

ইহার ফলে সাকার ও নিরাকারের, কাল ও কালাতীতের, জড় ও চেতনের, আমি ও তুমির ভেদ চিরতরে নিবৃত্ত হইয়া যায়। অথচ ভেদ নিত্যসিদ্ধ রূপেই থাকে।

সাধারণতঃ চিৎ নিরাকার ও জড় সাকার—ইহা বলা যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু যখন চিৎ স্বীয় শক্তির প্রভাবে অচিৎকে জয় করিয়া আত্মসাৎ করিয়া নেয় তখন নিরাকার থাকিয়াও তাহা সাকাররূপে আত্মপ্রকাশ করে। কারণ, অচিৎকে আত্মরূপে গ্রহণ করাতে অচিতের বৈশিষ্ট্যও তাহার আত্মধর্মরূপেই প্রতীত হয়। বস্তুতঃ উহাই পরম সত্য। চিৎ ও অচিৎ রূপে যে কল্পনা তাহা মিথ্যা। ঠিক এইপ্রকার যে অনন্ত আকার জড়ধর্মরূপে এখন প্রতীত হইতেছে তাহা তখন চিতেরই আকার বলিয়া প্রতীতিগম্য হয়। আসল কথা, চিৎ ও অচিৎ তখন থাকিয়াও থাকে না। চিৎ = তত্ত্ব; অচিৎও তত্ত্ব। চিৎ এক, অচিৎ অনন্ত। কিন্তু যখন চিৎ ও অচিৎ বস্তুতঃ তত্ত্বাতীত তখন এক ও অনন্ত যুগপৎ প্রকাশিত হয়।

বুদ্ধিতে ধারণা করিবার জন্য আমাদিগকে বিশ্লেষণ করিয়া আলোচনা করিতে হয়। এই প্রকার বিশ্লেষণ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে পূর্ণ স্থিতিতে যেমন বিদেহ ও নির্বিশেষ সত্তা অঙ্গীকৃত হয়, তদ্রূপ সবিশেষ সত্তাও অঙ্গীকার করা আবশ্যক। সবিশেষ ভাব থাকিলেই তর-তম ভাব থাকিবেই। আবার প্রত্যেকটিই স্বতঃপূর্ণ, নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র—ইহাও সত্য। যে ভাবেই

হউক, অংশাংশিভাব থাকিলেই অংশীতে ব্যাপকতা এবং অংশে ব্যাপ্যতা না মানিয়া চলে না। সংখ্যাম্বের সহিত সংখ্যাতীতের এই ব্যাপ্য-ব্যাপক সম্বন্ধ আছেই। চিন্ময় রাজ্যের অদ্বৈত সত্তার মধ্যেও এইপ্রকার অনন্ত বৈশিষ্ট্য আত্মার পরম স্বাতন্ত্র্যবশতঃই সম্ভবপর হয়। অবশ্য ইহা বিকল্পদৃষ্টি হইতে বলা হইতেছে।

একদিকে দেখিতে গেলে ভগবান্ই রস—তিনিই আস্বাদয়িতা। নিজেকেই নিজে আস্বাদ করিতেছেন। তাঁতে অনন্ত বৈশিষ্ট্য আছে—অথচ তিনি নির্বিশেষ। বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া তিনি অনন্তপ্রকারে নিজেকে আস্বাদন করেন। আবার সর্বদা একরস বলিয়া নিরন্তর একপ্রকারেই করেন। তিনিই আবার নির্বিশেষ বলিয়া তিনি আস্বাদনের অতীত—কখনই আস্বাদন করেন না। শক্তির ক্রীড়ারূপে আস্বাদন হইয়া যাইতেছে—তিনি শুধু দ্রষ্টা মাত্র। আরও গভীর ভাবে প্রবেশ করিলে জানা যায় তিনি দেখেনও না। যাহা দেখিবেন তাহাও যে তিনিই স্বয়ম্। দ্রষ্টা ও দৃষ্টিগত বিকল্প পরিহার হইলে একটি দৃষ্টিমাত্র থাকে। তাহাই তিনি। কিন্তু পরে জানা যায় দৃষ্টিরও অতীত অবস্থা আছে। তাহা সন্মাত্র। কিন্তু সৎকেও সৎ বলিলে বা সৎ বলিয়া ভাবিলে তাহা অসৎকল্প হয়। বস্তুতঃ তিনি সৎ ও অসৎ—এই বিকল্পেরও ঊর্ধ্বে। তিনি বলিলাম—বস্তুতঃ তিনি তিনি হইয়াও তুমিরূপে আমার সম্মুখীন। তুমি আবার তুমি হইয়াও আমিরূপে প্রকাশমান। আমিও আর আমি থাকি না। আমি নই, অথচ আমি। আমি থাকিয়াও আমি নাই। আছি অথচ নাই। কি বলিব জানি না। আছে, আছ, আছি—অথচ কিছুই নাই, কোন কালেই ছিল না, থাকিবেও না। আবার সবই সত্য।

ইহাই পূর্ণ। ইহার বিশ্লেষণ মানবীয় ভাষার অতীত।

অগ্নীষোম বিদ্যা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার পূর্বে অগ্নি ও সোম তত্ত্ব সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বৈদিক দৃষ্টি অনুসারে জগতের মূল ভোক্তা এবং ভোগ্য যথাক্রমে অগ্নি এবং সোম পদবাচ্য অর্থাৎ অগ্নিই একমাত্র ভোক্তা এবং সোমই একমাত্র ভোগ্য। যিনি নিজেকে ভোক্তা মনে করেন তিনি বস্তুতঃ অহঙ্কারে মোহ বশেই করিয়া থাকেন। কর্তৃত্বাভিমান বিগলিত হইলে তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে তিনি যেমন কর্তা নন, কর্তৃত্ব তাহাতে আরোপিত হয় মাত্র, ঠিক সেইপ্রকার তিনি বস্তুতঃ ভোক্তাও নন, ভোক্তৃত্বও তাহাতে আরোপিত হয়। যিনি জগতের একমাত্র ভোক্তা তিনিই সকল আধারে থাকিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। ঐ সকল আধারেব অভিমানী পুরুষ নিজেকে বৃথাই ভোক্তা বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। জগতের এই মূল ভোক্তাকে বৈদিক ঋষিগণ অগ্নি বলিয়া বর্ণনা করিতেন। ঠিক এই প্রকার ভোগ্য সম্বন্ধেও বিচার করিলে দেখা যাইবে যিনি যখন যাহাই ভোগ করুন না কেন, ভোগ্য মূল বস্তু একই। দেশ-ভেদে কালভেদে, আধারভেদে এবং যোগ্যতার ভেদ অনুসারে ঐ একই ভোগ্য বস্তু বৈদিকগণ সোম বলিয়া বর্ণনা করিতেন। সোমের অপর নাম অমৃত। সুতরাং বুঝিতে হইবে এই সোম অথবা অমৃতকণাই জীবমাত্রের ভোগের বিষয়। সকলেই একমাত্র ইহারই আহরণ করিয়া থাকে। এইজন্য ইহাকে আহার বা আহার্য বলে। যে যেমন জীব যে কোনপ্রকার খাদ্যবস্তু গ্রহণ করুক তাহার সার সত্তাটি সোম। সোম-হীন খাদ্য হইতে পারেনা, সকলপ্রকার খাদ্যের মধ্যেই মাত্রাভেদে এই সোম অংশ বিদ্যমান রহিয়াছে। পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে সমগ্র জগৎ অগ্নি এবং সোম এই দুই ভাগে বিভক্ত। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এবং কর্তা ও কর্ম যে প্রকার পরস্পর সংশ্লিষ্ট সেইপ্রকার ভোক্তা ও ভোগ্যও পরস্পর সংশ্লিষ্ট। ভোক্তা ভিন্ন ভোগ্য এবং ভোগ্য ভিন্ন ভোক্তা বিদ্যমান থাকিতে পারে না। শিব ও শক্তির মধ্যে যেমন নিত্য সম্বন্ধ স্বীকার করা হয় ঠিক সেই প্রকার ভোক্তা-ভোগ্যের মধ্যেও নিত্য সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহাকে আমরা প্রচলিত ভাষায় যজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করি তাহা বস্তুতঃ এই নিত্যসিদ্ধ পরম ভোক্তার নিকট ভোগ্য পদার্থের অর্পণ ভিন্ন অপর কিছু নহে। অগ্নিতে সোমের আহুতি প্রদানই যজ্ঞের তত্ত্ব। তিল, তণ্ডুল, আজ্য, সমিধ্ প্রভৃতি যাহাই কিছু অগ্নিতে হবন

করা হউক, ফলে সোমপ্রধান পদার্থ বলিয়াই হবনের যোগ্য। সোমাংশ না থাকিলে অগ্নি তাহা গ্রহণ করেন না। সাক্ষাৎ ভাবে সোম অর্পণ করিবার যোগ্যতা সাধারণ লোকের নাই বলিয়া সোমপ্রধান বস্তু সোমের প্রতীকরূপে অর্পণ করা হইয়া থাকে। দেবতামাত্রই ভোক্তা, এইজন্য সকল দেবতাই সোম বা অমৃতের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বেদে আছে 'অগ্নির্বৈ দেবানাং মুখং' অর্থাৎ অগ্নিকে সকল দেবতারই মুখরূপে গণনা করা হয়। এইজন্য অগ্নিতে আহুতি অর্পণ করিলে তাহা সকল দেবতার নিকটেই ভোগার্থ উপনীত হইয়া থাকে। দেবগণ আত্মরূপী মহাসবিতার রশ্মিস্বরূপ—ইহা নিরন্তর আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন। অগ্নিতে যখন আহুতি অর্পণ করা হয় তখন উহা অগ্নির দাহিকা শক্তির প্রভাবে বিগলিত হইয়া যায়। উহার অশুদ্ধাংশ দগ্ধ হয় এবং শুদ্ধাংশ বা সোমাংশ অমৃতরূপে ঊর্ধ্বে উন্নীত হইয়া আদিত্য মণ্ডলে প্রবেশ করে তাহার পর উক্ত মণ্ডল হইতে সোমাংশ রশ্মিযোগে চতুর্দিকে বিকীর্ণ হয়। এইভাবে দেবগণ সোমাংশ প্রাপ্ত হইয়া আপ্যায়িত হইয়া থাকেন। এইজন্যই শাস্ত্রে আছেঃ 'অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।

মনুষ্য যাহাকিছু যে কোন কোষে আশ্রয় করিয়া ভোগ করিয়া থাকে তাহাও ঐ প্রকার অমৃতস্বরূপ এবং তাহা তৎতৎ কোষস্থ অগ্নি গ্রহণ করিয়া থাকেন। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই পঞ্চকোষের সহিত ৫টি অগ্নির সম্বন্ধ রহিয়াছে। ইহার সম্যক্ পরিজ্ঞানই পঞ্চাগ্নি বিদ্যার রহস্য উদ্ঘাটন। অগ্নি যেমন ৫ প্রকার অগ্নির ভোগ্য সোম বা অমৃতও তদ্বৎ ৫ প্রকার। ইহারই নাম পঞ্চামৃত। প্রথম অগ্নিতে প্রথম সোমাংশের আহুতি হয়, দ্বিতীয় অগ্নিতে হয় অমৃতের, এই প্রকার শেষ পর্যন্ত বুঝিতে হইবে।

জীব যখন যাহাই কিছু ভোগ করুক না কেন, বস্তুতঃ সে কিছুই ভোগ করেনা, কারণ স্বরূপতঃ সে ভোক্তা নহে, সাক্ষী মাত্র, সে শুধু ঐ ভোগের দর্শন করিয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, শুদ্ধ দেবগণ দর্শনের দ্বারাই তৃপ্তি লাভ করেন। জীবও যখন সাক্ষীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন শুধু দর্শন হইতে তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। অভিমান ত্যাগ না হওয়া পর্য্যন্ত এই দ্রষ্টা ভাবে স্থিতি লাভ করা যায় না এবং এইরূপে স্থিতি লাভ না করা পর্যন্ত দৃষ্টিজনিত তৃপ্তি লাভ হওয়া অসম্ভব। সাধনার সুকৌশলে ভোগকালেও নিজেকে ভোক্তা না মনে করিয়া দ্রষ্টা রূপে অবস্থিত মনে করা, ইহাই অগ্নিষোম বিদ্যার তাৎপর্য। অর্থাৎ ভোগকালে উপলব্ধি করিতে হইবে যে আমি ভোক্তা নহি। যিনি নিত্য ভোক্তা, সর্ব যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর সর্ব ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনিই এই আধারে অগ্নিরূপে উপবিষ্ট থাকিয়া সোমরূপী ভোগ্য বস্তু নিরন্তর ভোগ করিতেছেন। আমি তটস্থ এবং উদাসীন সাক্ষীরূপে উহা দর্শন করিতেছি মাত্র।

এই দর্শন হইতে যে তৃপ্তি তাহাই বিশুদ্ধ আনন্দ। ভোগজনিত আনন্দ জীবের পক্ষে কাম্য নহে।

যাঁহারা উপাসক এবং ভক্ত তাঁহারা সূক্ষ্মতর কৌশলে অবলম্বন করিয়া ঈশোপনিষদের প্রক্রিয়া অনুসারে ভোগ করিলেও ঐ ভোগের দ্বারা তাঁহারা লিপ্ত হন না। উহা তাঁহাদের পক্ষে প্রসাদ গ্রহণ মাত্র, উপভোগ নহে। ঐ জাতীয় ভোগের দ্বারা ভোগবাসনা নিবৃত্ত হইয়া যায়। বস্তুতঃ উহা ভোগ হইয়াও ভোগের নিবর্তক। শাস্ত্রকারগণ উহাকে বৈধ ভোগ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহার রহস্য সংক্ষেপে এই ভাবে বুঝিতে চেষ্টা করিবেন: ভোগ্য বস্তু প্রকৃতিস্বরূপ। ভোক্তা যিনি তিনি পরম পুরুষ বা পুরুষোত্তম। জীব প্রকৃতির ভোক্তা নহে। প্রকৃতির ভোগ্যসত্তার স্বাভাবিক স্রোতে নিরন্তর পরম পুরুষের দিকে ধাবিত হইতেছে। অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দময় বাহ্য জগৎ হইতে উত্থিত হইয়া দেহস্থিত নাড়ী অবলম্বনপূর্বক নিরন্তর ঊর্ধ্বমুখে সহস্রদল কমলের কর্ণিকাস্থিত পরমপুরুষের অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, এবং তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া অর্থাৎ তাঁহার দৃষ্টিতে পবিত্রীকৃত হইয়া অধোমুখে অথবা বহির্মুখে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। এই ব্রহ্মচক্রে আবর্তন নিরন্তর হইতেছে। কিন্তু তটস্থ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত জীব আজ্ঞাচক্রে অবস্থানপূর্বক ঐ অধোমুখে সঞ্চালিত শুদ্ধ অমৃতধারা পান করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে। কিন্তু যতক্ষণ জীব ঊর্ধ্বমুখী হইয়া ঐ ধারাকে গ্রহণ করিতে সমর্থ না হয় ততক্ষণ ঐ প্রসাদরূপী ধারা তাহার ভোগে আসে না। সাধারণতঃ জীব অধোদৃষ্টিসম্পন্ন। প্রকৃতির ঊর্ধ্বমুখী আনন্দধারাকে সে মধ্যস্থান হইতে পূর্বে অপহরণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ ভোক্তা সাজিয়া পরমেশ্বরের ভোগ্যবস্তুকে পরমেশ্বরে অর্পিত হইবার পূর্বেই নিজে উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই চৌর্য প্রকৃতির জন্য জীব নিরন্তর বদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার ফলে যে ভোগ্য বস্তু জীব প্রাপ্ত হয়, তাহা অশুদ্ধই থাকিয়া যায়। অশুদ্ধ ভোগ্যের ভোগকে উপভোগ বলে, ভোগ বলে না। কিন্তু জীব যদি লোভদৃষ্টি এবং তৃষ্ণা বর্জনপূর্বক অনাসক্ত ভাবে ঊর্ধ্বনেত্র হইয়া একমাত্র পরমপুরুষের দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ রাখিতে পারে, তাহা হইলে ভোগ্যবস্তু না চাহিলেও পরমেশ্বর হইতে প্রত্যাবৃত্ত আনন্দধারা সে স্বভাবতঃই প্রাপ্ত হয়। ইহা শ্রীভগবানের করুণা বা প্রসাদ। ইহা ভোগ করিলে তাহার ভোগতৃষ্ণা মিটিয়া যায় এবং পরমানন্দের আস্বাদন প্রাপ্তি ঘটে। ইহারই নাম প্রসাদ গ্রহণ। ইহাও অগ্নীষোম বিদ্যারই একটি অঙ্গ, অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথা লিখিলাম। প্রয়োজন হইলে বিস্তারিত বিষয় পরে লিখিব।

সমগ্র জগতের আধ্যাত্মিক শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে সর্ব্বত্রই সৃষ্টির মূলে শব্দের মহিমা স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বৈদিক তান্ত্রিক এবং অনান্য সাধনার চরমসিদ্ধান্ত ইহাই এবং অন্বেষণ করিলে জানিতে পারা যাইবে খৃষ্টীয়, মোহাম্মদীয় প্রভৃতি অন্যান্য দেশের সাধনতন্ত্রেরও ইহাই সারকথা। এই সম্বন্ধে প্রত্যেক সাধনার সিদ্ধান্ত লইয়া বিশ্লেষণ করিবার আবশ্যকতা নাই—মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে ২।১টি কথা বলিতেছি। সৃষ্টির অতীত স্পন্দহীন যে মহাসত্তা স্বপ্রকাশভাবে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা একদিক হইতে দেখিলে যদিও স্পন্দের অতীত, তথাপি অন্যদিক হইতে দেখিতে গেলে তাহাকেও স্পন্দময় বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। এই মূল স্পন্দনই আত্মার স্বাতন্ত্র্যরূপ পরাশক্তি। স্বাতন্ত্র্য বা মহাশক্তি সর্বদাই আত্মার সহিত অভিন্নরূপে একরসভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের মাহাত্ম্যই এই যে উহা আত্মার সহিত নিত্য অভিন্নরূপে থাকিয়াও ভিন্নবৎ প্রতীত হইতে পারে, এক থাকিয়াও অনেকবৎ প্রকট হইতে পারে এবং নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও অনন্ত ক্রিয়াবিলাসরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। এই যে মূল স্বাতন্ত্র্য ইহাকে অদ্বৈত তান্ত্রিকগণ বিমর্শশক্তিরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। যে পরম-সত্তার সহিত উহা অভিন্ন তাহাকে তন্ত্রশাস্ত্রে প্রকাশ নামে অভিহিত করা হয়। প্রকাশ এবং বিমর্শ দুইই এক, অথচ এক হওয়া সত্ত্বেও উভয়ে অনির্বচনীয় বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। কারণ, প্রকাশ বিমর্শহীন অবস্থায় স্বরূপতঃ প্রকাশ থাকিলেও স্বপ্রকাশ বলিয়া পরিগণিত হন না। বিমর্শ ব্যতিরেকে প্রকাশ এবং অপ্রকাশ উভয়ে কোন পার্থক্য থাকে না। বিমর্শের প্রভাব-বশতঃই প্রকাশ স্বয়ংপ্রকাশরূপে স্বানুভূতিগোচর হন। এই বিমর্শই আত্মার মহিমা—ইহাই মহাশক্তির স্বরূপ। এই বিমর্শের নামান্তর অহং ভাব। বিমর্শহীন প্রকাশে অহংভাবের স্ফুরণ থাকে না। এইজন্যই উহাকে অপ্রকাশ বা জড় বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। অহন্তাবর্জিত প্রকাশ জড়, অহন্তাবিশিষ্ট প্রকাশ চৈতন্য। জড় ও চৈতন্যের ইহাই নিদর্শন। মনে রাখিতে হইবে জড় এবং চৈতন্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, কারণ প্রকাশাংশ উভয়ে একই। কেবল বিমর্শের স্ফুরণ-অস্ফুরণবশতঃই জড়-চৈতন্যে পার্থক্য নিরূপিত হয়। এই যে অহন্তার কথা বলা হইল ইহার কোন প্রতিযোগী নাই। ইহা অপরিচ্ছিন্ন

অহংভাব। ইহার প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে ইদংভাবের সত্তা এখনও প্রকটিত হয় নাই। এইজন্য ইহাকে পূর্ণাহন্তা বলে। পূর্ণাহন্তাই পরমেশ্বরের স্বরূপ। অদ্বৈতবাদী তান্ত্রিকগণ ইহাকেই পরাবাক্ বা শব্দের আদিরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে সৃষ্টির পূর্বে নিত্যসত্তারূপে শব্দ বিদ্যমান রহিয়াছে, এই শব্দই প্রজ্ঞা। খণ্ড প্রজ্ঞা হইতে পৃথক করিয়া বুঝিবার জন্য ইহাকে পূর্ণ প্রজ্ঞা বা মহাপ্রজ্ঞা বলিলেও ক্ষতি হয় না। বৌদ্ধগণ ইহাকেই প্রজ্ঞা-পারমিতা বলিতেন। ইনিই সমগ্র জগতের প্রসূতি, শুধু জগৎ কেন, বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, সিদ্ধবর্গ এমন কি ঈশ্বরভাবেরও প্রসূতি। কারণ, এই পূর্ণাহন্তাই মূল ঐশ্বর্য। ইহাই পরমেশ্বরের অথবা আত্মার স্বভাব। বস্তু স্বভাব বিরহিত থাকে না, সুতরাং আত্মা স্বরূপস্থিতিকালে কখনই পূর্ণাহন্তা-বিরহিত হইয়া থাকেন না। St. John-এর Gospel-এ যে বিবরণ আছে তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অর্থাৎ The Word was with God and the Word was God। "Word" শব্দে এখানে এই মূল শব্দকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। শব্দ ব্রহ্ম ইহা ছাড়া অতিরিক্ত কিছুই নহে।

সৃষ্টিকালে এই শব্দ হইতেই অর্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে। 'অনাদি-নিধনং ব্রহ্ম' শব্দের পরমতত্ত্ব। উহা হইতে অর্থ আবির্ভূত হয়। তারপর ঐ অর্থ জগৎরূপে দেশ ও কালগত অনন্ত বৈচিত্র্যের প্রতিভাসপূর্বক প্রকট হইয়া থাকে। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন 'অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরং বিবর্ততে অর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ।' ইহা সর্বথা সমীচীন।

অদ্বৈত তন্ত্রমতে পরাবাক্ বা স্বাতন্ত্র্যবশতঃ আত্মা সর্বপ্রথম পশ্যন্তীভূমিতে অবতীর্ণ হন। এই ভূমিতে বাচ্য এবং বাচকের পরস্পর অভেদ সম্বন্ধ বর্তমান থাকে। পরাবস্থায় বাচ্যবাচকভাব মোটেই থাকে না। সুতরাং সেখানে সম্বন্ধের কল্পনা নিরর্থক। উহা অদ্বৈত ভূমিরও অতীত। কিন্তু পশ্যন্তী অবস্থায় বাচ্য ও বাচক এই দুইটি ভাব থাকে। কিন্তু উভয়ের অভেদ সম্বন্ধ বর্তমান থাকে। এই বাচ্য-বাচকই অর্থ ও শব্দের স্বরূপ। শব্দ বাচক, অর্থ বাচ্য, অথচ উভয়ই অভিন্ন। মধ্যমা ভূমিতে বাচক ও বাচ্যের অভেদ থাকিলেও একটা ভেদের আভাস স্ফুরিত হয়। এই অবস্থায় শব্দ হইতে অর্থ পৃথক বস্তুরূপে পরিগণিত হয় না অথচ উভয়ে সর্বথা অভিন্নভাও থাকে না। ইহা ভেদাভেদের অবস্থা। এই অবস্থাতেই শব্দ অর্থরূপে প্রতীয়মান হয় এবং কি ভাবে উহা ঘটিয়া থাকে তাহা যোগের প্রত্যক্ষ গোচর। শব্দের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উহার বাচ্য অর্থের আবির্ভাব হইয়া থাকে। লৌকিক শব্দের অর্থ-বোধের জন্য যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম বর্তমান আছে উহার কোনটিই সেখানে প্রযোজ্য হয় না। শব্দের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থাৎ তাহার অব্যবহিত পরেই

অর্থের উদয় হইয়া থাকে। তদ্রূপ সংহারকালেও অর্থের উপশম শব্দের মধ্যেই হইয়া থাকে। এই মধ্যমাভূমি অত্যন্ত রহস্যময়। এই ভূমিতে অবস্থিত হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় শব্দ এবং অর্থ এই দুইটি অবিনাভাব সম্বন্ধ। শব্দ আরম্ভ হইলে তাহা হইতে যেমন অর্থকে ফুটাইয়া তোলা যায় তদ্রূপ অর্থ আরম্ভ হইলে তাহা হইতে তাহার মূল শব্দ আবিষ্কার করা যায়। উভয়ে ভেদাভেদ সম্বন্ধ থাকার দরুণ একটিকে ছাড়িয়া অপরটি থাকিতে পারে না। শব্দ ও অর্থই বস্তুতঃ নাম ও রূপ। বৈখরীভূমিতে শব্দ হইতে অর্থের পৃথককরণ সুসম্পন্ন হয়। তখন বিস্মৃতির উদয় হয় এবং তাহার ফলে শব্দ হইতে অর্থকে এবং অর্থ হইতে শব্দকে স্বাভাবিক নিয়মে ফিরাইয়া পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় শব্দ এবং অর্থের মধ্যে ভেদ সম্বন্ধ থাকে। জগতের অধিকাংশ লোক সাধারণতঃ এই বৈখরীভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে। এইজন্য তাহাদিগকে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া শব্দের সহিত অর্থকে যোজনা করিতে হয়। এই ভূমিতে সংকেত অথবা convention অঙ্গীকার করিয়া শব্দ হইতে অর্থবোধের প্রক্রিয়া উপপাদন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। যেখানে শব্দ অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ লুপ্ত না হইয়াছে সেখানে এই convention আবশ্যক হয় না। পরাভূমি হইতে বৈখরীভূমিতে অবতরণই সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ইতিহাস। এইভাবে মূল পরমশব্দ জাগতিক অর্থরূপে ক্রমশঃ এক এক ভূমি অতিক্রম করিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। ফিরিবার সময় বিপরীত ক্রমে জাগতিক অর্থ হইতে ক্রমশঃ মূল শব্দে উপনীত হইতে থাকে। মূল শব্দের আবিষ্কার হইলেই জীবের জীবত্ব চিরদিনের জন্য অপগত হইয়া যায়। জীব পরমশিব রূপে নিজের নিত্যস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হয়। তখন এই মূল মহাশব্দ তাহার স্বভাবরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

দ্বৈতবাদিগণ বলেন চিৎশক্তি অথবা পরমেশ্বরে নিত্যসমবেতা পরমাশক্তি বিন্দু নামক শুদ্ধ অচিৎ পদার্থকে স্পর্শ করিলে বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া সৃষ্টির সূচনা করে। তাই পারমেশ্বরী শক্তি ক্রিয়াশক্তি রূপেই বিন্দুকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে ইহা মনে রাখিতে হইবে। ইহার মোট নিষ্ক্রিয়াবস্থা তাহাতে বিন্দুর ক্ষোভ্য-ক্ষোভকভাব থাকে না। বিন্দুর নামান্তর মহামায়া অথবা কুণ্ডলিনী। যখন বিন্দু ক্ষুব্ধ হয় তখন ঐ ক্ষোভের ফলে নাদের ধারা প্রবর্তিত হয়। এই প্রসঙ্গে কলা, তত্ত্ব ও ভুবন এই তিনটি এবং বর্ণ, মন্ত্র ও পদ এই তিনটি—মোট ছয়টি অধ্বার আবির্ভাব বুঝিতে পারিলে বিন্দু হইতে কিভাবে শব্দের ধারা এবং অর্থের ধারা প্রকটিত হয় তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। বিন্দুতে যে সকল জীব বা পশু বিবেকজ্ঞান প্রাপ্তি দ্বারা মায়া অতিক্রমপূর্বক বিলীন-ভাবে সুষুপ্তবৎ বর্তমান রহিয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহাদের মলরূপী আবরণ পরিপক্ক হইয়াছে তাহারা সৃষ্টির আদিতে পরমেশ্বরের অনুগ্রহ শক্তি প্রাপ্ত

হইয়া জাগিয়া উঠে। ইহাই তাহাদের চৈতন্যের বিকাশ। এই বিকাশ বৈন্দবদেহ প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া থাকে। বৈন্দবদেহ বিন্দু অথবা কুণ্ডলিনী হইতে উদ্ভূত। বিজ্ঞানাকল নামক অণুসকল ভগবৎদত্ত দীক্ষার ফলে এই শুদ্ধদেহ প্রাপ্ত হইয়া নিজের যোগ্যতানুরূপ অধিকার এবং ভোগ লাভ করিয়া থাকে। বৈন্দব রাজ্যের সৃষ্টি, ওখানকার দেহ সৃষ্টি এবং তাহাদের অধিকারাদি সম্প্রাপ্তি সবই ভগবৎদত্ত কৃপার ফল। এই অবস্থাটি মায়াতত্ত্বের উপরে, ইহা মনে রাখিতে হইবে। ইহার সহিত মায়া অথবা কর্মের কোন সম্পর্ক নাই। ইহাদের মধ্যে প্রধান ৮ জন অষ্ট মন্ত্রেশ্বররূপে ঈশ্বরতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। উহার নিম্নবর্তী পরিপক্কমল ৭ কোটি বিজ্ঞানাকল মন্ত্ররূপে শুদ্ধ বিদ্যাতত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। ভগবানের মায়িক জীবের উদ্ধাররূপ মহাকার্যের ইহারাই প্রধান সহায়ক। ইহার মধ্যে মন্ত্রেশ্বরগণ গুরুরূপে এই অনুগ্রহকার্যের কর্তা হন এবং মন্ত্রগণ বিদ্যারূপে এই অনুগ্রহকার্যে গুরুবর্গের অধীন করণ হয়। ইহাই অপরামুক্তির অবস্থা। প্রলয়াকল নামক যে সকল জীব প্রলয়কালে মায়াতত্ত্বে সুষুপ্ত থাকে তাহাদের মধ্যেও যাহারা মলের পরিপাকবশতঃ অধিকতর যোগ্য তাহারাও পূর্ববৎ ভগবদনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া মন্ত্রেশ্বর রূপে আবির্ভূত হন। ইহাদের মায়াভেদ হয় নাই বলিয়া ইহাদের মায়িক দেহও বর্তমান থাকে। অথচ দীক্ষার ফলে বৈন্দব দেহও আরব্ধ হয়। ইহারা উভয় দেহবিশিষ্ট। ইহারা মায়াগর্ভস্থ জগতের অধিকারিমণ্ডল। এই উভয় প্রকার মন্ত্রেশ্বরের অধীনে থাকিয়া মন্ত্রবর্গ জীব উদ্ধারকার্যে সাহায্য করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কাহারও পর বৈরাগ্যের উদয় হইলে সে তৎক্ষণাৎ পূর্ণত্ব লাভ করে এবং অধিকার হইতে অবসর প্রাপ্ত হয়। তখন নিম্নভূমিস্থ অধিকারী ঐ রিক্তপদে উন্নীত হয় এবং মায়াগর্ভ হইতে অধম পদের জন্য অধিকারী নির্বাচিত হয়। বলাবাহুল্য এই সকল অধিকারী প্রলয় পর্যন্ত অবস্থান করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা শুদ্ধাধিকারী তাহাদের স্থিতিকাল মহাপ্রলয় পর্যন্ত।

যে ৮টি ঈশ্বরের কথা বলা হইল তাহাদের মধ্যে যিনি প্রধান তাঁহার নাম অনন্ত। তিনি মায়ার অধিষ্ঠাতা। তাঁহার সংকল্প হইতেই মায়া ক্ষুব্ধ হইয়া মায়িক জগৎ প্রসব করে। শিব যেমন শুদ্ধজগতের অধিষ্ঠাতা অনন্তও তেমনি মায়িক জগতের অধিষ্ঠাতা। শুদ্ধজগৎ যেমন বিন্দুরূপ মহামায়া হইতে উদ্ভূত হয়, মায়িক জগৎ তেমনি মায়াতত্ত্ব হইতে উদ্ভূত হয়। শুদ্ধজগৎ সৃষ্টির মূলে শিবের নির্বিকল্পক চৈতন্যশক্তি কাজ করিয়া থাকে। অশুদ্ধ জগতের সৃষ্টির মূলে অনন্তাখ্য ঈশ্বরের সবিকল্পক জ্ঞানরূপ কল্পনাশক্তি কার্য করিয়া থাকে। শুদ্ধ চৈতন্যশক্তি যাহা ক্রিয়াশক্তিরূপে বিন্দুকে ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে তাহা বিন্দুর অতীত পরনাদ। ইহা বিন্দুক্ষোভজনিত নাদ নহে।

ঈশ্বরের সবিকল্পক জ্ঞান বা সংকল্প বিন্দুসমুত্থিত নাদ শব্দের দ্বারা অনুবিদ্ধ চৈতন্য। অতএব শুদ্ধ জগতের সৃষ্টির মূলে পরনাদরূপ শব্দ, শুদ্ধ জগতের সৃষ্টির মধ্যে অপরনাদরূপ বিন্দুজন্য শব্দ এবং অশুদ্ধ মায়িক জগতের সৃষ্টির মূলে অপর নাদের দ্বারা অনুবিদ্ধ চৈতন্যরূপী ঐশ্বরিক সংকল্পরূপ শব্দ। সৃষ্টির নিম্নস্তরেও এইপ্রকার শব্দ হইতেই সৃষ্টির ক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

৬.৯.৪৪

২৯

শব্দ হইতে সৃষ্টিপ্রণালী বুঝিবার পক্ষে সাধারণতঃ যে সকল বাধা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অতিক্রম করিয়া চিত্তকে যথাসম্ভব সংস্কাররহিত করিতে পারিলে রহস্যের উদ্ঘাটন সহজসাধ্য হয়। অক্ষরব্রহ্মকে শব্দাত্মক বলিয়া পূর্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইনি শব্দব্রহ্ম। ইনি স্বরূপতঃ কলাতীত হইলেও ইহাতে স্বরূপানুবিদ্ধ অনন্ত শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল শক্তি মূলে শব্দ হইতে পৃথক্ অথবা ভিন্ন নহে। ইহা স্বরূপের সহিত অভিন্ন বলিয়া ইহাদিগকে স্বরূপশক্তি বলা হয়। এই সকল শক্তিই কলা নামে অধ্যাত্ম শাস্ত্রে পরিচিত। এই সকল কলাই নিত্য কিন্তু নিত্য হইলেও ইহারাই সৃষ্টির আদি প্রবর্তক। এই সকল নিত্য কলা হইতেই বিকারাত্মক জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে। এই সকল নিত্য কলা, সমষ্টি রূপে মহাপদবীবাচ্য। এই প্রকৃতি কালশক্তিকে আশ্রয় করিয়া যোনিরূপে পরিণত হয়। যোনিবর্গ হইতে অনন্ত ভাবপুঞ্জ আবির্ভূত হয়। এই যোনিবর্গই আত্মার কলাদেহ। কলাদেহ হইতে যে সৃষ্টির উদ্ভব হয় তাহা ক্রমবদ্ধ এবং বিকারাত্মক। এই সৃষ্টিচক্র ষড়র নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম, সত্তালাভ, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং নাশ। সৃষ্টিচক্রের এই ছয়টি অর।

নিত্যকলা মহাবিন্দুকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এইগুলি নিরন্তর মার্গভেদে বামাবর্ত ও দক্ষিণাবর্ত ক্রমে ঘুরিতেছে। সাধক জপের সময় ইহারই অনুকরণ করিয়া থাকেন। ইহারই নাম কালচক্রের আবর্তন। এই আবর্তন হইতে বেগের তীব্রতা অনুসারে অহোরাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর চক্র পর্যন্ত বিভিন্ন চক্র রচিত হইয়াছে। ক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি মহাপ্রলয় পর্যন্ত কালচক্রের আবর্তনের মূলে এই নিত্যামণ্ডলের সঞ্চরণ রহিয়াছে। পঞ্চদশ নিত্যা আবরণরূপে নিরন্তর পরিক্রমা করিতেছে। যিনি

ষোড়শী তিনি বিন্দুরূপে মধ্যে অবস্থান করিতেছেন। মূল চক্রটিকে ত্রিকোণাত্মক ধরিয়া লইলে বুঝিতে হইবে এই পঞ্চদশ নিত্যাই ত্রিকোণ মণ্ডলের তিনটি ভুজ। তিনটি ভুজই পরস্পর সমান, কারণ প্রত্যেকটি ভুজ ৫টি করিয়া নিত্যা অথবা কলাদ্বারা গঠিত। এই মণ্ডলের মধ্যবিন্দুরূপে যিনি রহিয়াছেন তিনি নিত্য প্রকাশমান চিদানন্দ স্বরূপ—তিনি ষোড়শী কলা। পঞ্চদশ কলার আবর্তন আছে বলিয়া তাহা হইতে ক্ষরণ হয়। কিন্তু ষোড়শকলা হইতে অমৃতদ্বারা পঞ্চদশ কলা আপূরিত না হইলে পঞ্চদশ কলা হইতে ধারারূপে অমৃতক্ষরণ সম্ভবপর হয়না। এই অধঃপ্রবাহ হইতেই সৃষ্টির সূচনা হয়। ষোড়শী কলা হইতে ঊর্দ্ধপ্রবাহরূপে একটি রশ্মি সপ্তদশীর দিকে চলিয়া গিয়াছে। উহা কালের অতীত। উহাকেই আশ্রয় করিয়াই নিত্য জগতের আবির্ভাব হয়।

শব্দময়ী কলা কালকে আশ্রয় করিয়া ক্রম অবলম্বন-পূর্বক অর্থরূপে জগতে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ষোড়শী কলা শব্দরূপে নিজের সৃষ্টি নিজে দেখিয়া থাকেন। সংহারকালে অর্থকে শব্দে লীন করিতে পারিলে ঐ শব্দ ক্রমশঃ পঞ্চদশীতে পর্যবসিত হয়। তারপর কালচক্র ভেদ করিতে পারিলেই বিন্দুতে প্রতিষ্ঠা হয়। কালচক্র হইতে বিন্দুতে লইয়া যাওয়া ইহাই গুরুশক্তির কার্য। যে সৃষ্টি কালের অধীন তাহাতে ক্রম আছে কিন্তু নিত্য সৃষ্টি কালের অধীন নহে তাহাতে ক্রম নাই। উভয় সৃষ্টিই শব্দ হইতে উত্থিত। মন্ত্রাদি জপ হইতে দেবতাদের যে আবির্ভাব তাহা বাস্তবিক পক্ষে অনিত্য সৃষ্টিও নহে, নিত্য সৃষ্টিও নহে। বস্তুতঃ উহা কালের মধ্যে নিত্য সৃষ্টির অভিব্যক্তি। যাহা নিত্য জগতের সিদ্ধসত্তা জপাদি দ্বারা তাহার আবরণ সরিয়া গেলে কালরাজ্যে তাহার আবির্ভাব দৃষ্টিগোচর হয়। বস্তুতঃ নিত্য সৃষ্টিও সৃষ্টি বটে, যদিও তাহা অনন্ত। এই সৃষ্টির মূলেও শব্দের ক্রিয়া রহিয়াছে।

চিদাকাশ হইতে চৈতন্যরূপে শব্দের উত্থান হয়। যখন ঐ শব্দে প্রতিধ্বনি-রূপে মায়িক আকাশে ফুটিয়া উঠে তখন উহাতে মায়ার আবরণরূপে একটি পর্দা পড়িয়া যায়। চৈতন্যশব্দ জড়শব্দে পরিণত হয়, কিন্তু জড়শব্দ হইলেও যতক্ষণ বায়ুর ক্রিয়ার উন্মেষ না হয় ততক্ষণ উহাতে অবিচ্ছিন্নতা থাকিয়া যায়। এই পর্যন্তই নাদের গতি। ইহার পর বায়ুতত্ত্বকে আশ্রয় করিবার সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরাকাশে বাহ্যসত্তার আভাস একটু একটু করিয়া জাগিয়া ওঠে। আন্তরভাব তখনও দূর হয় নাই অথচ বাহ্য ভাব ক্রমশঃ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে। চরম অবস্থায় যখন আন্তরভাব লুপ্ত হয় এবং একমাত্র বাহ্য ভাবই বিদ্যমান থাকে তখন ভেদ জ্ঞানের উদয় হয় এবং আত্মবিস্মৃতি ঘটে। শব্দ এবং অর্থ উভয়ের স্বরূপে আবরণ পড়ার দরুণ শব্দ ও অর্থ তখন পরস্পর পৃথক হইয়া যায়। তখন শব্দ হইতে আর অর্থকে পাওয়া যায় না এবং অর্থ হইতেও শব্দের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই অবস্থায় শব্দ বর্ণাত্মক বৈখরীরূপে আত্ম-

প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহা কণ্ঠ হইতে ওষ্ঠ পর্যন্ত অবস্থান করে। ৪৯ বায়ুর স্বাভাবিক কম্পনের তারতম্যানুসারে নাদরূপী শব্দ ৪৯ ভাগে বিভক্ত হয়। ব্যষ্টি লইয়া ৫০ এবং সমষ্টি সহ ৫১। ইহাই বর্ণমালার সংখ্যা। উহার মধ্যে অনেক রহস্য আছে তাহা অবান্তর বলিয়া এখানে উল্লেখ করা গেল না। বর্ণমালার সৃষ্টি এবং অনন্ত জ্যোতিঃ হইতে রশ্মিউদ্‌গম সমকালীন ব্যাপার। এই সকল বর্ণ বিষদন্তবিহীন সর্পের ন্যায় অথবা জলহীন শরৎকালের মেঘের ন্যায় নামে মাত্র শব্দরূপে পরিচিত। এই সকল বর্ণের সম্যক প্রবোধনপূর্বক তাহাদের পরস্পর সংঘটন সম্পন্ন করিতে পারিলে ইচ্ছানুসারে পদার্থ সৃষ্টি করা যায়। বস্তুতঃ মন্ত্রোদ্ধার এই মহাতত্ত্বের বিজ্ঞানের উপরই নির্ভর করে।

৯. ৮. ৩৯

৩০

আপনি যে নিত্যলীলার কথা লিখিয়াছেন, তাহা চিদাকাশেরই ব্যাপার—চিত্তাকাশের নহে। চিত্তাকাশে কর্মসংস্কার সঞ্চিত থাকে—উহা ভেদ-জ্ঞানের বীজ মায়া দ্বারা কলঙ্কিত। মায়াতীত পদে আরূঢ় না হইলে নিত্যলীলার সন্ধান পাওয়া যায় না। নিত্যলীলা জড়জগতের ব্যাপার নহে। চিন্ময়ধামেই উহার স্বাভাবিক স্ফূর্তি উপলব্ধ হইতে পারে। চৈতন্য-সম্প্রদায়েও সেইজন্য মহাজনগণ স্বরূপশক্তির উল্লাসরূপেই নিত্যলীলার বর্ণনা করিয়া থাকেন। স্বরূপশক্তি যে অন্তরঙ্গা চিৎশক্তি তাহা বলা অনাবশ্যক। ইহা বস্তুতঃ ভগবৎ-স্বরূপ হইতে অভিন্ন অথচ শক্ত্যাত্মক। মায়া জড়শক্তি—তাই মায়িক প্রপঞ্চমধ্যে অথবা মায়াগর্ভে নিত্যলীলার সম্ভাব নাই। তান্ত্রিকগণও তাহাই বলেন। অনুত্তর অবস্থায় স্বাতন্ত্র্যের উল্লাসে শিবশক্তির পরস্পর ঔন্মুখ্য নিবন্ধন সংঘট্ট হইলে রসধারা উচ্ছলিত হইতে থাকে। এইখানেই রসস্ফূর্তিরূপ লীলার বিকাশ হয়। প্রাচীন আগমে ইহাকে বিসর্গভূমি বলে। শিবশক্তির 'যামল'রূপ—যাহাকে গৌড়ীয়গণ "যুগল" রূপ এবং সহজযানী বৌদ্ধগণ "যুগনদ্ধ" রূপ বলিয়া বর্ণনা করেন—এই রসধারার প্রস্রবণস্বরূপ। বলা বাহুল্য ইহা ইচ্ছাশক্তির উন্মেষের পূর্বতন অবস্থা। তন্ত্রমতে 'অ' ও 'আ'—একই সত্তার দুইদিক। ইহার হইতেই বিশ্ববীজ ইচ্ছার উদ্‌ভব। অ=অনুত্তর। আ=আনন্দ। ইহার মধ্যে অনুত্তর পরপ্রকাশ মাত্র—ইহা শিবশক্তির অদ্বয়রূপ বা তত্ত্ব। ইহাই প্রকৃত অদ্বৈত। আর আনন্দ—প্রকাশরূপী শিব ও বিমর্শরূপা।

শক্তির মিথুনীভাব বা পরস্পরানুপ্রবেশ হইতে উচ্ছ্বসিত রসধারা। এইটি শৃঙ্গার বা আদিরসকে আশ্রয় করিয়া "বিবর্তবিলাস" রূপে খেলিতে থাকে। ইহার পর ইচ্ছার বিকাশক্রমে পর পর পরা, পরাপরা এবং অপরা-শক্তি সকলের আবির্ভাব হয়। সহজভাষায় এইগুলিই ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির রূপ। এই সকল শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত হইতেই বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হয়। সুতরাং লীলা যে চিত্তাকাশের ব্যাপার নহে তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেকে মনে করেন যে শুদ্ধচৈতন্য নিষ্ক্রিয় ও লীলা ক্রিয়াত্মিকা, সুতরাং শুদ্ধ চিৎস্বরূপে লীলার কোন স্থান নাই। ইহা ঠিক নহে। লীলা স্পন্দময়ী শক্তির স্বচ্ছন্দে বিলাস মাত্র—ইহার সঙ্গে ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ নাই। ইহা ভগবৎ-স্বরূপের নিগূঢ় রহস্য। বাহ্যভাবে ইহা দেখিবার জিনিষ নহে। বাহ্যভাব থাকা পর্যন্ত ইহার সন্ধান পর্যন্ত হইতে পারে না। ইহা নিজের সঙ্গেই নিজের খেলা—এই খেলায় দ্বিতীয় কেহ নাই। তবে অনুগত দ্রষ্টা হইলে সাক্ষিরূপে এই খেলা দেখিতে পারে। সাক্ষীর এই অধিকার আছে। ইহাই মায়ামুগ্ধ ভগবদ্‌ভক্ত জীবের সঙ্গে link অর্থাৎ জীব মুক্ত হইয়া পরাভক্তির প্রভাবে এই সখীর সহিত যোগযুক্ত হইয়া যায় বলিয়াই সাক্ষী বা দ্রষ্টা হইয়া লীলাদর্শনের অধিকারী হয়। অথচ মায়া ও মহামায়ার অতীত হইয়া সে বিশুদ্ধ চিদুজ্জ্বলা ভগবানের স্বরূপভূতা মহাশক্তির অংকাশ্রিত থাকে বলিয়া সাংখ্যাদিসম্মত কেবলী দ্রষ্টার পদ হইতে ঊর্ধ্বে অবস্থান করে। ইহাকেই শ্রীগুরুদেব "মায়ের কোলে বসিয়া মায়ের খেলা দেখা" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

৭, ১, ৩৯

৩১

আপনার জিজ্ঞাসিত বর্ণগুলি যে স্বরূপের প্রতীক তাহার উল্লেখ তন্ত্রশাস্ত্রে আছে। অ=অনুত্তর। ইহার নামান্তর অকুল। আ=আনন্দ। ই=ইচ্ছা। ইত্যাদি। পরমপুরুষ ও পরমাপ্রকৃতি সর্বতোভাবে অভিন্ন হইয়া অদ্বৈত তত্ত্বরূপে যখন স্থিতিশীল তখনই অনুত্তর দশা। আর যখন পরমপুরুষ ও পরাপ্রকৃতি পরস্পর আলিঙ্গিতরূপে রসাস্বাদন করেন তাহাই আনন্দ দশা। ইহাকে শাস্ত্রে যুগলভাব, মিথুনভাব, যুগনদ্ধভাব, কমলভাব প্রভৃতি নামে নির্দেশ করা হয়। ইহা অনুত্তর বা নির্বিশেষ অদ্বয় অবস্থা না হইলেও দ্বৈত অবস্থাও নহে। ইহাই নিত্য মিলনের স্থিতিভাব। শৃঙ্গার রসের ইহাই কেন্দ্রভূত।

১৮. ৭. ৪০

৩২

আপনার প্রেরিত পুস্তকখানা ("বাংলার বৈষ্ণবধর্ম") গত বৎসরই আমি পাইয়াছিলাম, সেইজন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। পুস্তকখানা যে সুলিখিত এবং সুপাঠ্য হইয়াছে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। আপনার রচনা-শৈলীর স্বাভাবিক মাধুর্য পূর্ণভাবে ইহাতে রহিয়াছে। প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনাও সাধারণ পাঠকের বোধগম্য ভাষাতে এবং প্রণালীতে করা হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থখানি সকলেরই চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। আপনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনার বৈশিষ্ট্য আলোচনাপ্রসঙ্গে শঠকোপমুনির কামিনীত্ব প্রাপ্তি অথবা গোপীভাবের অবলম্বন সম্বন্ধে সংক্ষেপে সুন্দর কয়েকটি কথা বলিয়াছেন। রাগমার্গের ভক্তিসাধনার ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার সময় কাঠারির সাধনগত এই বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আলোচিত হইবে। আপনি 'মানস বৃন্দাবনে' সিদ্ধদেহে মহাভাবরূপিণী শ্রীরাধার সঞ্চারীভাবস্বরূপা সখীগণের আনুগত্য দ্বারা রসরাজমূর্তি রসিক রাজশেখর শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদনের জন্য জীবন উৎসর্গ করাকে (পৃঃ ৮৪) বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্ট্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অনেকাংশে সত্য, যদিও আমার মনে হয় তত্ত্বতঃ ইহা বহুপূর্ব হইতেই অর্থাৎ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব হইতেই গুপ্ত সাধকগণের মধ্যে পরিজ্ঞাত ছিল। কিন্তু এই বৃন্দাবন কি মানস বৃন্দাবন? চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বিরজার পরপারে পরব্যোমের বর্ণনা আছে—ইহা নিত্য চিন্ময় ভূমি, এখানকার লতা গুল্মাদি চিন্ময় ও আনন্দঘন। ভগবৎসন্দর্ভেও ইহার কথা আছে—ইহা নারায়ণের ত্রিপাদ বিভূতিস্বরূপ নিত্য অনন্ত শুদ্ধসত্ত্বময় দিব্য পরমপদ। বলাবাহুল্য, ইহা মায়াতীত ভূমি। তাই ইহাকে 'মানস বৃন্দাবন' না বলিয়া 'নিত্য-বৃন্দাবন' বলিয়া গ্রহণ করা উচিত মনে হয়। বৃন্দাবন তিন প্রকার, মানুষও তিন প্রকার —নিত্য বৃন্দাবনেই স্বতঃসিদ্ধ মানুষের প্রকাশ হয়, অন্যত্র নহে। অন্যত্র অযোনিসম্ভব এবং যোনিসম্ভব মানুষের স্থিতি। মানস বৃন্দাবনের সহিত নিত্য -বৃন্দাবনের ভেদ বঙ্গীয় রহস্যমার্গে প্রসিদ্ধ। যিনি 'অপ্রাকৃত নবীন মদন' বলিয়া বর্ণিত হন তিনি বিরজার এপারের বস্তু নহেন। 'প্রেমানন্দ লহরী' 'রাধারসকারিকা' 'নিগূঢ়ার্থ প্রকাশাবলী' প্রভৃতিতে রাধাকৃষ্ণ তত্ত্বের অর্থাৎ যুগলরূপের নিগূঢ় রহস্য বর্ণিত আছে। ভাবদেহের পরেই সিদ্ধদেহ লাভ হয় —ভাবদেহ সাধক অবস্থায় অভিব্যক্ত হয়, অবশ্য মন্ত্রসিদ্ধির প্রভাবে অথবা নামমাহাত্ম্য বশতঃ, কিন্তু সিদ্ধদেহ সাধক অবস্থাতে হয় না। আরেকটি কথা।

সাধকের আশ্রয় সখীর চরণ কিন্তু সিদ্ধের আশ্রয় শ্রীরাধার চরণ। সাধকের লীলা রাগ—কিন্তু সিদ্ধের প্রেম ও প্রাপ্তি রাগ। মানস বৃন্দাবনে এই সিদ্ধজন উপভোগ্য রসের আস্বাদন সম্ভবপর মনে হয় না। প্রাচীন রামায়েত সম্প্রদায়েও এই নিগূঢ় তত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। তুলসীদাসের শ্রীরামনাম-কলামণিকোষ-মঞ্জুষাতে এবং কবীরের 'রেখ্তা' প্রভৃতিতে এই তত্ত্বের পরিচয় সুষ্ঠুরূপে উপলব্ধ হয়। শুকসংহিতা, সদাশিবসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ এই বিষয়ে আলোচ্য। স্থূল সূক্ষ্ম কারণ প্রভৃতি পঞ্চদেহ অতিক্রম করিয়া হংসদেহ লাভ করিলেই শ্রীভগবানের নিত্য পার্ষদভাব উপলব্ধ হয় ইহা সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবের অতীত অথচ লৌকিক দৃষ্টিতে উভয় ভাবময়-রূপে বা ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়। ইহাই যুগল রূপের রহস্য। তান্ত্রিকগণের যামলরূপ ও বজ্রযানী বৌদ্ধগণের যুগনদ্ধ রূপ তত্ত্বতঃ ইহাই। আরও একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। মহাপ্রভু উৎকলে যে নিগূঢ় ধর্মের শিক্ষা দিয়াছিলেন যাহা অধিকার ভেদে তাঁহার পঞ্চ সখার মধ্যে আবদ্ধ ছিল তাহারও আলোচনা আবশ্যক। উৎকলীয় বৈষ্ণবগণের গ্রন্থ আছে—অতি অপূর্ব। আমাদের গোস্বামীগণের গ্রন্থাবলীর ন্যায় ঐ সকল গ্রন্থেরও প্রতিপাদ্য তত্ত্ব বিশ্লেষণ আবশ্যক। প্রেমভক্তি ব্রহ্মগীতা, গুরুভক্তি গীতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট তত্ত্ব গ্রন্থ।

১৩. ৬. ৪১

৩৩

আপনি কাল সম্বন্ধে পত্রে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ঠিকই, তবে এখানে কয়েকটি কথা বিবেচ্য। কাল বস্তুতঃ এক হইলেও দৃষ্টি ও অবস্থাভেদে তাহার ব্যবহারগত ভেদ অঙ্গীকার করা আবশ্যক। যে কাল পরপ্রমাতার দিক্ হইতে তাঁহার বিশ্বাভাসকারিণী ক্রিয়াশক্তি, তাহাই আবার মিতপ্রমাতা বা মায়াপ্রমাতার দিক্ হইতে তাঁহার স্বরূপাচ্ছাদক স্বেচ্ছাগৃহীত কঞ্চুকবিশেষ। প্রথমটি পরশিবের সহিত অভিন্ন এবং তাঁহারই স্বভাবভূত, কারণ জ্ঞানক্রিয়াত্মক স্বাতন্ত্র্য বা বিমর্শই তাঁহার স্বভাব। প্রথমোক্ত কাল এই ক্রিয়ারই স্বরূপবিশেষ। ইহা

সকল তত্ত্বের পরম রূপ, কারণ ক্রিয়াশক্তি হইতেই সংবিদের বহিরুন্মেষ হয়। বলা বাহুল্য, এই বাহ্য উন্মেষই বিশ্বের আভাসন। তাই কালকে ঈশ্বররূপ বলা হয়। বিশ্বকলনই শক্তির ক্রিয়াত্মক বহির্মুখ রূপ, তবে বহির্মুখ হইলেও ইহা স্বাত্মবিশ্রান্ত, কারণ বিশ্বাভাস 'ইদমহং' এই প্রতীতিকে অতিক্রম করিয়া উদিত হইতে পারে না। অর্থাৎ জ্ঞান ও ক্রিয়া অভিন্ন বলিয়া শক্তির ক্রিয়াত্মক রূপ বা বিশ্ব উহার জ্ঞানাত্মক রূপ বা আত্মা হইতে অভিন্ন। পরমাত্মার এই ঈশ্বররূপতা বা ক্রিয়াখ্য কালশক্তিই মায়াপ্রমাতাতে কালতত্ত্ব। শুধু ইহাই নহে, শিব হইতে শুদ্ধবিদ্যা পর্যন্ত পরমাত্মার তত্তৎ স্বরূপই পুরুষের আবরণকারী মায়াদি রাগান্ত তত্তৎ কঞ্চুকরূপে প্রকাশমান। মলরহিত পরশিবে যাহা ক্রিয়া বা কালশক্তি, মলিন পুরুষে তাহাই কালতত্ত্ব। অতএব কালকে মায়ীয় মলের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিলে উহাকে কালতত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তবে ইহা সত্য যে কঞ্চুককেও শক্তি বলা যায়, কারণ উহা মায়ার বিভূতি। সেইজন্য মহার্থমঞ্জরীতে (কারিকা ১৮) 'পঞ্চশক্তয়ঃ' বলিয়া কঞ্চুক পাঁচটির বর্ণনা করা হইয়াছে। ঈশ্বরপ্রত্যাভিজ্ঞার বিমর্শিনীর কথাও এইজন্য প্রামাণিক। পরমাত্মার যাহা স্বাতন্ত্র্যশক্তি পশুতে তাহাই পারতন্ত্র্যবিধায়িনী পাশশক্তি।

কাশ্মীরীয় শৈবাচার্যগণ দেখাইয়াছেন যে দেশ ও কাল এই উভয় অধ্বাই সামান্যস্পন্দাত্মক প্রাণে বা ভগবানের ক্রিয়াশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে কালাধ্বা উহার পূর্বভাগেও দেশাধ্বা উহার উত্তরভাগে অবস্থিত। দেশাধ্বার বিভাগ মূর্তিবৈচিত্র্যের দ্বারা এবং কালাধ্বার বিভাগ ক্রিয়াবৈচিত্র্যের দ্বারা সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ মূর্তিবৈচিত্র্য হইতে দেশক্রম এবং ক্রিয়াবৈচিত্র্য হইতে কালক্রমের আবির্ভাব হয়। এই আবির্ভাবের কর্তা ঈশ্বর। অমূর্ত সর্বগ ও নিষ্ক্রিয় সংবিদের মূর্তি ও ক্রিয়ারূপে অবভাসই দেশ ও কাল অধ্বা। এই কাল যে ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্ত্যাত্মক রূপ কালতত্ত্ব নহে তাহা অভিনবগুপ্ত তন্ত্রালোকের ষষ্ঠ আহ্নিকে আলোচনা করিয়াছেন। শৈবাচার্যগণ যেমন মূর্তি ও ক্রিয়াবৈচিত্র্য নিবন্ধন দেশ ও কালাধ্বার বর্ণনা করিয়াছেন, কতকটা সেইভাবের বিবরণ ভর্তৃহরির সম্প্রদায়েও যে না আছে তাহা নহে। তবে বৈয়াকরণদের প্রস্থান অবশ্য পৃথক।

পরমেশ্বরনিষ্ঠ জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিই তাঁহার ঐশ্বর্য বা স্বাতন্ত্র্যরূপে শাস্ত্রে বর্ণিত হয়। ভেদোন্মেষের অভাবে তাঁহার স্বাভাবিক প্রাণশক্তিই সদাশিব এবং তাঁহার স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তিই ঈশ্বর। সুতরাং প্রত্যভিজ্ঞা মতেও ক্রিয়াশক্তি যে স্বাতন্ত্র্যরূপ তাহা নিঃসন্দেহ।

৩. ৭. ৩৯

* * এখানে (৺পুরীধামে) আসিয়া এবার একজন ভাল লোকের সঙ্গে দেখা হইয়াছে—নাম 'শ্যামাদাস বাবাজী'। ইনি বাহ্যদৃষ্টিতে একজন চৈতন্য সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বৈষ্ণব, কিন্তু বস্তুতঃ উচ্চশ্রেণীর অনুভূতিসম্পন্ন জ্ঞানী। বয়সে বৃদ্ধ, (বোধহয় ৮০ বৎসর বয়স হইবে), কিন্তু শরীর এখনও বেশ সবল ও কর্মক্ষম আছে। কোন অংশে তেমনভাবে শিথিলতা দেখা দেয় নাই। ইনি পূর্বে ২৪ বৎসর পর্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে কুসুম সরোবরে ছিলেন। কিছুদিন ৺কাশীধামে পরলোকগত ব্রহ্মানন্দ ভারতী মহাশয়ের নিকটে ছিলেন এবং এখানেও প্রায় ৩০।৩৫ বৎসর যাবৎ আছেন। পূর্বে স্বর্গদ্বারে হরিদাসের সমাধি মন্দিরে থাকিতেন, সম্প্রতি নরেন্দ্র প্রান্তে সুপ্রসিদ্ধ 'জগন্নাথবল্লভ' নামক উদ্যানের এক পার্শ্বে 'বন্ধু আশ্রম' নামে একটি বাড়ী তৈয়ার করিয়া তাহাতে বাস করিতেছেন। লোকটির বাহ্য আড়ম্বর কিছু নাই, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানসম্পত্তি ভালই আছে। তিনি যৌবনের শেষ দিকে তৈলঙ্গস্বামীর কৃপা পাইয়াছিলেন। তাছাড়া সময়ে সময়ে প্রভু জগবন্ধু এবং অন্যান্য বহু সাধুপুরুষের সঙ্গ ও আশীর্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। যে ভাবেই হউক তাঁহার 'স্বভাব' জাগিয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, তিনি সর্বদা দ্রষ্টাভাবে থাকিয়া নিজের স্বভাবের খেলা দেখিতেছেন। এই দেখার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কোন ভাব জড়িত নাই। একটা শান্ত আনন্দময় নির্লিপ্তভাব এই দেখার প্রাণ। তিনি অনেক গুহ্য অনুভূতি স্বতঃপ্রেরিত হইয়া আমার নিকট কথাপ্রসঙ্গে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক স্থিতির একটা পরিচয় স্পষ্ট পাওয়া যায়। ঐ যে স্বভাবের কথা বলিলেন, উহাকে চিদাকাশ বলিয়া তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। ঐটিকে একটি নীলবর্ণ মণ্ডলাকার আকাশের মতন তিনি অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে সর্বদা দেখিতে পান। যখন বস্তুভাবে লিপ্ততা আসে তখন অবশ্য উহা দেখিতে পান না, আবার কিছুক্ষণ পরেই যেমন পূর্বে দেখিতেন তেমনি দেখিতে থাকেন। পক্ষান্তরে ঐ আকাশে অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলে বাহ্যভাবে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। নিজের প্রকৃতির—মনঃ প্রভৃতির—সব খেলাই ঐ আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা বিবিক্তদর্শন বলিয়া দ্রষ্টাকে রঞ্জিত করিয়া ভোক্তার রূপে পরিণত করিতে পারে না। তাঁহার আত্মদর্শন হইয়াছে। জগতের যাবতীয় বস্তুর মধ্যেই তিনি নিজের স্বভাবটিকে স্পষ্ট দেখিতে পান। স্বভাবের মধ্যে নিরাকার আকাশকে দেখেন, আবার ঐ নিরাকার আকাশের মধ্যে জাগতিক যত খেলা সব দেখেন—অথচ এই দেখাতে কোনপ্রকার মোহের সংস্রব নাই। মাঝে মাঝে যে লিপ্ততার আভাস আসে তাহা পূর্বসংস্কারের অভিনয় মাত্র। এই

সংস্কারটুকু শোধিত হইলে ঐ অভিনয়টাও আর থাকিবে না। প্রাক্তন "Unregenerate nature"-এর এইটুকুই অবশিষ্ট রহিয়াছে। লোকটি খুব নির্জনতাপ্রিয়। বহু লোকে তাঁহাকে জানে, কিন্তু অনেকেই তাঁহাকে চিনে না। গত মাঘ মাসে যখন আনন্দময়ী মা এখানে আসিয়াছিলেন তখন তিনি একদিন তাঁহার আশ্রমে ছিলেন।

১৪. ৭. ৩৯

৩৫

* * বাবাজী মহাশয় এখনও চিদাকাশে প্রতিষ্ঠিত হন নাই। কারণ কখনও কখনও তিনি (অল্প সময়ের জন্য হইলেও) আত্মবিস্মৃতবৎ হন ও দ্রষ্টার নিরপেক্ষ স্বরূপ হইতে যেন 'চ্যুত' হইয়া লৌকিক পুরুষের ন্যায় লিপ্ত ও বিবেকহীন ভাব প্রাপ্ত হন। অবশ্য ইহা তাঁহার পূর্বসংস্কারের উদ্দীপন জন্য সাময়িক ভাব মাত্র—ইহাতে তাঁহার বাস্তবিক কোন হানি হয় না। ক্ষণকাল পরেই তিনি বিবিক্ত সাক্ষিরূপে প্রত্যাগমন করেন। তখন স্বীয় প্রকৃতির খেলা দেখিতে থাকেন এবং কখনও কখনও (যখন সাময়িকভাবে প্রকৃতির খেলার অবসান হয়) প্রকৃতির সহিত অভিন্নভাবে অবস্থিত থাকেন। বস্তুতঃ ঐ দ্বিতীয় অবস্থায়ও তিনি আত্মপ্রকৃতিকেই দর্শন করেন। ইহা একপ্রকার আত্মদর্শনেরই নামান্তর হইলেও বিশুদ্ধ আত্মদর্শন একবার হইলে আর কখনও যায় না। ব্যুত্থানাবস্থায় জগদ্দর্শনকালেও সে আত্মদর্শন অনুস্যূত থাকে। তথাপি ইহা যে আত্মদর্শনের আভাস তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্যবহারক্ষেত্রে ইহাকেও 'আত্মদর্শন' বলা যাইতে পারে।

আসল কথা এই: বাবাজী মহারাজ চিত্তাকাশে অবস্থান করিতেছেন এবং ঐখান হইতে মধ্যে মধ্যে—এমন কি অধিক সময়ই চিদাকাশের দর্শন পাইয়া থাকেন। তিনি চিত্তকাশে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়া উহা পৃথক্‌রূপে—দৃশ্যবৎ—দেখিতে পান না। চিত্তাকাশ হইতে সত্ত্বগুণের আলোকময় পরদা মধ্যে মধ্যে অপসৃত হইলেই ঐ রন্ধ্রপথে মুক্ত চিদাকাশ দৃষ্টিগোচর হয়। এই দর্শন বিজ্ঞানচক্ষুর ব্যাপার—দিব্যচক্ষুর নহে। দিব্যচক্ষু শুদ্ধ চিত্তাকাশ ও ঐ আকাশের অনন্ত বিভূতি দর্শনই পর্যাপ্ত হয়। চিদাকাশ দর্শনে সমর্থ হয় না। চিদাকাশ দর্শন অভেদ দর্শন—চিত্তাকাশ ও উহার বিভূতি দর্শন ভেদাভেদ দর্শন, উভয়ে অনেক পার্থক্য। আর এক কথা: দিব্যদর্শনে জ্যোতির প্রাধান্য,

চিন্ময় দর্শনে জ্যোতি থাকে না—শুদ্ধ প্রকাশ থাকে। আমরা সাধারণতঃ সকলেই অন্ধকারময় ভূতাকাশে অবস্থান করিতেছি। এটা অন্ধকারের রাজ্য —আলোক এখানকার আগন্তুক ধর্ম। আলোকের জন্য এখানে চেষ্টা করিতে হয়। ইহাই অজ্ঞানের নিদর্শন। তাই হৃদয়াকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখা যায়। কিন্তু যখন ভিতরে জ্ঞানের আলো জ্বলিয়া উঠে, তখন ধীরে ধীরে ক্রমশঃ এই অন্ধকারের পরদা সরিয়া যায়। পরে এমন এক অবস্থা আসে যখন হৃদয় হইতে অন্ধকার চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করে—একমাত্র আলোকময় আকাশই তখন ব্যাপক-ভাবে প্রকাশমান হয়। ইহাই চিত্তাকাশ। শুদ্ধচিত্তে চিতের প্রতিফলন হইলেই আলোকের বিকাশ হয়—তাহারই নাম জ্ঞান। চিত্তাকাশের আলোকময় পরদা কখনও অপসৃত হইলে যেমন চিদাকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রকার ভূতাকাশের অন্ধকারময় পরদা মাঝে মাঝে সরিয়া গেলে ঐ রন্ধ্রমার্গে আলোকিত চিত্তাকাশের দর্শন হয়। চিদাকাশের দর্শন ঊর্ধ্বনেত্রে, চিত্তাকাশের দর্শন মধ্যনেত্রে এবং ভূতাকাশের দর্শন অধোনেত্রে হইয়া থাকে। প্রথম দর্শন-মার্গ ব্রহ্মরন্ধ্র, দ্বিতীয় দর্শনমার্গ ভ্রূমধ্যস্থ দিব্যচক্ষু এবং তৃতীয় দর্শনমার্গ ইন্দ্রিয়। দ্রষ্টা সর্বত্র সমভাবে পশ্চাতে অবস্থিত। ইন্দ্রিয়ের দর্শন বা ভৌতিক দর্শন ভেদময়, শুদ্ধ মনের বা দিব্য চক্ষুর দর্শন ভেদাভেদময় এবং বিজ্ঞান চক্ষুর চিন্ময় দর্শন অভেদময়। ভূতশুদ্ধির ফলে চিত্তাকাশে এবং চিত্তশুদ্ধির ফলে চিদাকাশে প্রতিষ্ঠা হয়।

চিদাকাশই বিষ্ণুর পরমপদ—যাঁহার নিকট ইহা সদা প্রকাশিত তিনি সূরি ও ব্রহ্মদর্শী। অখণ্ড মণ্ডলাকার রূপে ইহা দেহাবস্থান সময়ে প্রত্যক্ষ হয়। ইহারই একদেশে একটি ক্ষুদ্র বিন্দুর ন্যায় সমগ্র বিশ্ব অভিন্ন রূপে প্রতিভাসমান হয়। অভিন্ন হইলেও শুদ্ধ বিকল্প দৃষ্টিতে ইহা ভিন্নাভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়। অশুদ্ধ বিকল্প দৃষ্টিতে ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হয়। শুদ্ধ বিকল্প মহামায়ার স্তরে এবং অশুদ্ধ বিকল্প মায়িক জগতের স্বাভাবিক ধর্ম। বিশ্ব বিকল্পময়—সুতরাং মহামায়া এবং তদন্তঃপাতী শুদ্ধ ধামাদি স্তরসমূহ ও মায়া এবং মায়িক জগৎ—সবই বিশ্বের অন্তর্গত। ভগবৎস্বরূপে অর্থাৎ নির্বিকল্পক পরমপদে বিশ্ব তাঁহার সহিত অভিন্ন হইলেও অর্থাৎ তাঁহার স্বরূপ শক্তির বিলাসরূপে অবস্থিত হইলেও বিকল্প ভূমিতে তাঁহা হইতে বিসৃষ্ট হয়। কিন্তু বিসৃষ্ট হইয়াও তাঁহাতেই সংসৃষ্ট থাকে। কারণ তিনি পরমাশ্রয় ভূমি। বিশ্বের এই শুদ্ধ বিকল্পময়—সত্তা সংকল্পময়—জ্ঞানোজ্জ্বল ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়াত্মক শক্তিত্রয়ের স্ফুরণরূপী অংশ চিত্তাকাশের অন্তর্গত এবং অশুদ্ধ বিকল্পময় অবিদ্যাচ্ছন্ন অংশ যেখানে ইচ্ছাদিশক্তি বাধিত হয় ভূতাকাশের অন্তর্গত। জ্ঞানোদয়ে ভূতাকাশ আলোকিত হইলে যে চক্ষুর উন্মীলন হয় উহা পিণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডে গমনের যায়। ব্রহ্মাণ্ড হইতে মহাশূন্যের অব্যক্ত নিষ্পন্দ জ্ঞান নিরুদ্ধ হইলেও

গুণাতীত চিৎকলার উন্মেষ হইলে ঐ পথে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বছিদ্রপথে (অর্থাৎ সূর্যমণ্ডলের ঊর্ধ্বরশ্মি বা অমৃতরশ্মি যোগে) চিদাকাশে প্রবেশ হইয়া থাকে। সেখানে যাওয়ার আর কোন পথ নাই।

শাস্ত্রীয় পরিভাষায় এই অমৃতরশ্মি বা অমৃতনাড়ীর ক্রিয়াই পরাভক্তি নামে বর্ণিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতিরেকে চিদাকাশে অভেদস্থিতি হইতে পারে না।

চিদাকাশে প্রবেশ করিলে আর এখানকার মত উহার দর্শন হইবে না। হইতে পারেও না। উহা ব্রহ্মনির্বাণ অবস্থা। শুধু তাহাই নহে। ওখান হইতে চিত্তাকাশেরও দর্শন হয় না—ভূতাকাশ ত দূরের কথা। অর্থাৎ চিত্তাকাশ ও ভূতাকাশ, উভয়েই দর্শন হয়—কিন্তু অভিন্নভাবে, চিদাত্মকরূপে ব্রহ্মরূপে। এই ব্রহ্মদর্শন বস্তুতঃ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের স্বরূপে স্থিতি। পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্মের অভিন্নতার বোধই পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান। চিদাকাশ শব্দব্রহ্মের নামান্তর। দ্রষ্টা পরব্রহ্ম। চিদাকাশে ভগবদনুগ্রহে বা পরাভক্তির প্রভাবে (উন্মনা শক্তির উল্লাসবশতঃ বা পূর্ণতত্ত্বের বোধবশত:) প্রবিষ্ট হইলে পর ও শব্দব্রহ্মের অথবা দ্রষ্টা ও দৃশ্যের নিত্য সামরস্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই স্বাতন্ত্র্যময় বোধস্বরূপ আত্মা। ইহা অদ্বয়তত্ত্ব সকল তত্ত্বের অতীত হইয়াও সর্বতত্ত্বময় পরমতত্ত্ব।

পূর্ণব্রহ্মে স্বাতন্ত্র্যের উল্লাস হইলেই চিদাকাশের আবির্ভাব হয়। বস্তুতঃ এই স্বাতন্ত্র্য নিত্য বলিয়া চিদাকাশও এক হিসাবে নিত্যাবিভূত। অর্থাৎ দ্রষ্টা যেমন নিত্য, তাহার দৃশ্যও তেমনি নিত্য · এ দৃশ্য দ্রষ্টারই স্বভাব বা স্বরূপভূত শক্তি, উভয়ই চিদেকরস। মহাশক্তির মধুর লীলায় একই অদ্বয়তত্ত্ব অনাদি দিব্য মিথুনরূপে,যুগলরূপে, 'যুগনদ্ধ'রূপে প্রকাশমান রহিয়াছে—অথচ ইহা বিকল্পময় মনোরাজ্যের বা বিশ্বের ঊর্ধ্বে—কালের কলনাত্মক ব্যাপারের অতীত অবস্থা, a play as it were in the heart of Eternity.

চিদাকাশ দর্শনের পরে সেখান হইতে স্বেচ্ছাবশতঃ অবতরণের মুখে সম্পূর্ণ চিত্তাকাশ যুগপৎ দর্শন হয়—ইহাই বিশ্বদর্শন বা বিশ্বসৃষ্টি। ইহার মধ্যে ক্রম নাই। ইহার পর চিত্তাকাশে প্রবেশ হয় ও জীবরূপে চিত্তাকাশ মধ্যে সঞ্চরণ হয়। এখানে পর পর অবস্থাগুলি ক্রমশঃ ফুটিতে থাকে। তবে সে ক্রম অতি সূক্ষ্ম হইতে পারে, যাহা সহসা ক্রম বলিয়া ধরা যায় না। অথবা অতি স্থূলও হইতে পারে। তাই ক্রম হইতেই কালের মান নির্ণীত হয়। চিত্তাকাশ হইতে অবতরণ মুখে সম্পূর্ণ ভূতাকাশটি ঘোর অন্ধকারময় গোলক রূপে দৃশ্যমান হয়। এই অন্ধকারই মায়ার অন্ধকার—ইহার মধ্যে ঢুকিলে আত্মবিস্মৃতি পূর্ণতা লাভ করে—নিজের স্বরূপ জ্ঞান একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তাহার পর মায়াগর্ভ হইতে বাহির হইলেই ভেদজ্ঞানময় অবস্থা স্থায়ী হইয়া যায়। যতদিন ভূতাকাশে অবস্থান হইবে ততদিন এই ভেদজ্ঞান যাইতে পারে না। তবে জ্ঞানের আলোকে বা দিব্যচক্ষুর বিকাশে চিত্তাকাশ দর্শনের অবস্থায়

ভেদাভেদজ্ঞানের আবির্ভাব হইতে পারে। ঠিক ঠিক অভেদজ্ঞান চিদাকাশ ব্যতিরেকে হওয়ার উপায় নাই।

মূলে আকাশ একই। তাহা একটি অনন্ত প্রকাশময় ব্যাপকসত্তা ('আ সমন্তাৎ কাশতে')। তাহাকে কেহ ব্রহ্ম বলেন, কেহ পরাশক্তি বলেন, কেহ পরশূন্য বলেন, কেহ পূর্ণ বলেন। তাহা বস্তুতঃ অবস্থাহীন হইলেও ব্যবহারতঃ অবস্থাভেদে বিভিন্ন আকাশরূপে বর্ণিত হয়। ভূতাকাশ হইতে ভূতাবরণ সরিয়া গেলে তাহাই চিত্তাকাশ। চিত্তাকাশ হইতে গুণাবরণ সরিয়া গেলে তাহাই চিদাকাশ। চিদাকাশ নির্মল—তাহাতে আর আবরণ নাই। তবে সামরস্য অবস্থায় তাহারও ভান থাকে না। 'কুঞ্জ' তখন 'নিকুঞ্জ' রূপে আত্মপ্রকাশ করে। শৈবগণ 'চিদম্বর' বা 'উমা-হৈমবতী' বলিয়া—এই চিদাকাশকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন। যোগবাশিষ্ঠের প্রবুদ্ধ লীলা এই চিদাকাশেই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করিয়াছিলেন।

৪. ১১. ৪১

৩৬

মঠ হইতে যে ১২ খানা পুস্তক পাইয়াছিলে তাহা এতদিনে বোধ হয় পড়িয়া ফেলিয়াছ। 'যোগতারাবলী' বস্তুতঃ নাথ সম্প্রদায়ের গ্রন্থ নহে—উহা আচার্য শঙ্করের নামে প্রচলিত। তবে যোগ সম্বন্ধে আলোচনা আছে বলিয়া উহাও কাজে লাগিবে। 'ষটচক্র নিরূপণ'—তান্ত্রিক আচার্য পূর্ণানন্দ পরমহংসের 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি' নামক মূলগ্রন্থের একটি অধ্যায় মাত্র। গ্রন্থকার 'গোস্বামী' ছিলেন না। অমনস্ক, সিদ্ধসিদ্ধান্ত পদ্ধতি, সিদ্ধসিদ্ধান্ত সংগ্রহ, গোরক্ষশতক, মীনচেতন, গোরক্ষ উপনিষৎ, গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ ক্রমশঃ পড়িতে থাক। নাথধর্মের আলোচনার data খুব কম নহে। সংস্কৃত, বাঙ্গালা, হিন্দী উড়িয়া প্রভৃতি বহু ভাষাতেই বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্নিবেশ আছে—ক্রমে ক্রমে সবগুলিই দেখিতে হইবে। মধ্যযুগে নাথধর্মের উদ্ভব ও বিস্তার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকিলে বঙ্গভাষায় যে সকল নাথধর্মবিষয়ক গ্রন্থ ও গীতাদি উপলব্ধ হয় তাহাতে উক্তধর্মের বৈশিষ্ট্য কি প্রকারে নিরূপণ করিতে পারিবে? ভারতীয় ধর্মসাধনায় মৎস্যেন্দ্র ও গোরক্ষ প্রবর্তিত সম্প্রদায় ও সাধনার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তাহা বুঝিতে হইলে সমসাময়িক অন্যান্য ধর্মসাধনার সমজাতীয় ধারাগুলির অল্পবিস্তর পরিচয় রাখা আবশ্যক। সাধারণতঃ অনেকের বিশ্বাস

হঠযোগের প্রবর্তক মৎস্যেন্দ্রনাথ। এই বিশ্বাসের মূলে কতটা সত্য আছে তাহা পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতে যোগবিদ্যার বহুল প্রচার ছিল—তাহাতে এই যোগের বীজ নিহিত ছিল কি না তাহা আলোচনার বিষয়। তা ছাড়া পাতঞ্জল যোগ, বৌদ্ধদের প্রচারিত যোগমার্গ এবং জৈনগণের যোগপদ্ধতি হইতে মৎস্যেন্দ্রনাথের সম্প্রদায়ে কোন্ কোন্ বিষয়ে বৈলক্ষণ্য ছিল তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এই বৈলক্ষণ্যের মূলে তন্ত্রোপদিষ্ট যোগ-মার্গের রহস্য অথবা অন্য কিছু, তাহাও নিপুণভাবে বিচারণীয়। কায়সাধন নাথ যোগের একটি মুখ্য কর্তব্য—ইহার বিশেষ বিবরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিবে। নাথসিদ্ধ, শৈব ও শাক্তসিদ্ধ এবং বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের সাধন, আদর্শ ও আচারগত সাদৃশ্য ও বৈষম্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবে। প্রসঙ্গতঃ তিব্বতীয় লামাধর্মের তত্ত্ব ও সাধনা সংক্রান্ত বিবরণ জানিতে চেষ্টা করিবে। মাহেশ্বর সম্প্রদায়ের অন্তর্গত রসসম্প্রদায়ের সিদ্ধগণ হইতে পূর্বোক্ত সিদ্ধগণ কোনও অংশে বিশিষ্ট কি না, গোরক্ষ সম্প্রদায়েও রসসাধনার প্রাদুর্ভাব ছিল কি না, থাকিলে পূর্বে উল্লিখিত সম্প্রদায়ের সাধনা হইতে তাহার পার্থক্য কোন্ কোন্ বিষয়ে—এই সব জানিতে হইবে। নাথগণের মহাজ্ঞানের স্বরূপ কি? মৃত্যুকে জয় করিবার বিভিন্ন প্রণালীর মধ্যে কোন্ কোন্ প্রণালী নাথাচার্যগণ অবলম্বন করিতেন? এই অমরত্ব লাভের প্রক্রিয়াতে হঠযোগসম্মত অমরৌলী, বজ্রোলী ও সহজোলী মুদ্রার রহস্য কি? ইহার সঙ্গে বজ্রযান ও সহজযান নামক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অবলম্বিত যোগ সাধনার কোন সম্বন্ধ আছে কি? কুণ্ডলিনী বিজ্ঞান, অজপা রহস্য, গুপ্তচক্রের বিবরণ, আজ্ঞাচক্র হইতে সহস্রার এবং তাহারও পরবর্তী বিভিন্ন আধ্যাত্মিক কেন্দ্র সকলের তত্ত্ব—এসব বিশেষভাবে আলোচ্য এবং প্রাচীন আগম সিদ্ধান্তের সহিত তুলনীয়। নাথগণের সৃষ্টি প্রক্রিয়া ও দীক্ষাদি সংস্কার বিশেষভাবে আলোচ্য। মৎস্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কৌলধর্ম প্রচারের কোন সম্পর্ক আছে কি? মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষ, জলন্ধর, চর্পটী, বিচারনাথ, চতরঙ্গী, কন্হেরী প্রভৃতি সিদ্ধগণের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে হইবে। গোপীচাঁদ, ময়নামতী প্রভৃতির আখ্যায়িকা যেভাবে বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ, অন্যত্র তাহার প্রচার ঠিক সেইভাবে, কি বিভিন্ন ভাবে? 'কল্যাণ' নামক হিন্দী পত্রিকায় যোগাঙ্কে সিদ্ধাচার্যগণের ও নাথ সম্প্রদায়ের যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পড়িও। 'দোহাকোষ' ভাল করিয়া পড়িতে চেষ্টা করিবে—কারণ উহার ভাষা ও বিষয় উভয়ই কঠিন। দেহতত্ত্বটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। বাউল, সহজিয়া ও সন্তগণের এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। 'নাড়ীচক্র' সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। মহাযান বৌদ্ধগণের 'আশ্রয়-পরাবৃত্তি' ও 'স্কন্ধসন্ধি' বুঝিতে না পারিলে কায়সাধনের মহত্ত্ব ধরিতে পারিবে না। মহারাষ্ট্রভাষায় 'জ্ঞানেশ্বরী নামক গীতাব্যাখ্যার খুব আদর।

ইহার রচয়িতা জ্ঞানেশ্বর মহারাজ একজন উচ্চাঙ্গের সিদ্ধ ছিলেন। তিনিও নাথসম্প্রদায়ের সঙ্গে গুরুশিষ্য সম্বন্ধে জড়িত। 'জ্ঞানেশ্বরী' খানাও একবার দেখিতে হইবে।

৩. ৩. ৪২

৩৭

নাথ সম্প্রদায়ের লক্ষ্য কি এবং কালক্রমে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সাধনার সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহা কি আকার ধারণ করিয়াছে তাহা নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনার যোগ্য। এরূপ আলোচনাতে শুধু ঐতিহাসিক পদ্ধতি কার্যকরী হয় না। কারণ তত্ত্ববোধ না থাকিলে শুধু শব্দার্থ মীমাংসার দ্বারা নির্ণয় হইতে পারে না। অবশ্য তোমার পক্ষে তত্ত্ববোধ বস্তুতঃ intuitive না হইয়া intellectual হইলেও ক্ষতি নাই।

তুমি দেহজয় ও চিত্তজয়ের কথা লিখিয়াছ। এই প্রসঙ্গে নির্মাণচিত্ত ও নির্মাণকায়ের স্বরূপ ও সম্বন্ধ আলোচনার যোগ্য। সিদ্ধাবস্থায় চিত্ত ও দেহের পৃথক্ সত্তা থাকে কি? থাকিলে তাহা কি প্রকারে থাকে? সাধারণতঃ স্থূল ও লিঙ্গদেহের যে পার্থক্য তাহা প্রসিদ্ধ। এখন যদিও উভয় দেহ জড়িত হইয়া আছে তথাপি তাহা একীকৃত নহে। এইজন্যই মৃত্যু হয়। অর্থাৎ স্থূলদেহ হইতে লিঙ্গদেহ আলাদা হইলেই স্থূলদেহ প্রাণহীন—চেতনাহীন শবাকারে পরিণত হয়। তদ্রূপ লিঙ্গশক্তি স্থূলে অনুপ্রবিষ্ট হইলেই জন্ম হয়। কিন্তু যদি কোন কৌশলে উভয় সত্তাকে গলাইয়া মিলাইয়া লওয়া যায় তাহা হইলে আর পৃথক্ পৃথক্ দেহ থাকে না। তখন স্থূল ও লিঙ্গ তীব্র সংঘর্ষে একাকার ধারণ করে। মৃত্যুজয় ইহারই আনুষঙ্গিক ফলমাত্র।

সুতরাং চরম অবস্থাতে চিত্তজয় ও দেহজয় অভিন্ন হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য ইহা প্রথম অবস্থার কথা নহে। এইজন্য তান্ত্রিক উপসনাতেও ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধির পৃথক পৃথক প্রয়োজন রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। পতঞ্জলি ও ব্যাসদেব নির্মাণচিত্ত বলিতে যাহা বুঝাইয়াছেন উদয়নাচার্য ন্যায়কুসুমাঞ্জলিতে নির্মাণকায় শব্দে সেই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়াছেন। বৌদ্ধগণের নির্মাণকায় ও প্রসিদ্ধ।

ত্রিকায় সম্বন্ধে বহুস্থানে আলোচনা আছে। আপাততঃ তুমি সুজুকি লিখিত Mahayana Buddhism গ্রন্থখানা দেখিতে পার। Hastings-এর

Encyclopedia of Religion and Ethics পুস্তকখানাও দেখিও। এই বিষয়ে পরলোকগত Sylvan Levy-র একটি ভাল প্রবন্ধ আছে। তাহা Journal Asiatique-এ প্রকাশিত হইয়াছিল। Burnouf-এর গ্রন্থখানা দেখিও। অসঙ্গের 'মহাযান সূত্রালঙ্কার' বইখানা দেখিতে পার।

১৯. ২. ৪২

৩৮

তোমার পত্র ও প্রেরিত প্রবন্ধ প্রাপ্ত হইলাম। প্রবন্ধটি আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত ভাবের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ এবং বহুস্থলে অল্পাধিক পরিমাণে সত্যের অপলাপ রহিয়াছে। এইরূপ প্রবন্ধ সম্যক্ প্রকারে সংশোধিত না হইয়া প্রকাশিত হইলে আলোচ্য বিষয়ের গৌরব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না, বরং হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। যে কয়েকজন মহাপুরুষের নিদর্শন তুমি প্রদান করিয়াছ তাঁহাদের স্বরূপগত আদর্শ এবং নিগূঢ় সাধনার ধারা তুমি সাক্ষাৎভাবে কিছুই অবগত নহ। সুতরাং তাঁহাদের মতামত বলিয়া তুমি যাহা প্রকাশ করিয়াছ তাহা না করিলেই ভাল হইত। প্রকাশ্য গ্রন্থে তুলনাত্মক আলোচনা না করাই উচিত, কারণ যাহার সঙ্গে তুলনা করা যাইতেছে যদি কেহ কখন তাহার পক্ষ হইতে প্রতিবাদ করে তাহা হইলে সমস্ত প্রবন্ধটি গৌরবহীন হইয়া পড়িবে। তুমি যে তিনজন মহাপুরুষের বর্ণনা আনুষঙ্গিক ভাবে ইঙ্গিত করিয়াছ তাঁহাদের প্রত্যেককেই আমি অন্তরঙ্গভাবে জানি। তাঁহাদের উল্লেখ গ্রন্থমধ্যে না থাকাই উচিত।

যতটা সম্ভব সত্য ঘটনা এবং নিজেদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ অনুভূতির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা উচিত। গ্রন্থরচনার মূলে প্রচার অথবা propaganda-র ভাব থাকিলে তাহা হইতে জগতের কল্যাণ সাধিত হয় না। সত্যবস্তুর আত্মপ্রকাশ হইতেই জগতে তাহার প্রচার হইয়া থাকে। আকাশে সূর্য উদিত হইলে তাহাকে প্রচারিত করিবার জন্য প্রদীপের আশ্রয় গ্রহণ করার আবশ্যকতা হয় না। সাধারণ জীব নানা কারণে অজ্ঞ ও অসমর্থ। তাহার ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি অনাদি অবিদ্যার আবরণে আচ্ছন্ন রহিয়াছে। যে এখন পর্যন্ত নিজের স্বরূপের পরিচয়ই প্রাপ্ত হয় নাই তাহার পক্ষে অন্যকে

৬

পরিচিত করাইবার চেষ্টা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। সে প্রকার চেষ্টা কখনই সফল হয় না। তুমি যাহাকে নিজে এখনও চিনিতে পার নাই তাহাকে অন্যের নিকট উপস্থাপন করিবে কিসের জোরে? তুমি যেদিন নিজেকে চিনিতে পারিবে সেদিন সকলকেই চিনিবার পথ খুলিয়া যাইবে। তখন সত্যবস্তুকে চিনিতে শাস্ত্রের সাহায্য অথবা অন্য মহাজনগণের নিদর্শন আবশ্যক হইবে না। যখন তুমি নিজে সেই বস্তুটি চিনিতে পারিবে তখন প্রয়োজন হইলে এবং ইচ্ছা হইলে অন্যকে চিনাইতে বেগ পাইতে হইবে না। পুস্তকখানা মোটের উপর সুলিখিত তাহাতে সন্দেহ নাই। উহাতে যে সকল অত্যুক্তি আছে তাহা বর্জন করিয়া এবং অন্য মহাজনদের যে সকল প্রসঙ্গ আছে তাহা অপসারণ করিয়া শুধু অনুভূত এবং প্রমাণিত সত্য ঘটনার উপর ইহাকে স্থাপিত করিতে পারিলে আর কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না। প্রামাণিক গ্রন্থ মাত্রেই গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত মতপ্রকাশ যত কম থাকে ততই ভাল, কারণ উহাতে সাধারণ পাঠকের ধারণা জন্মে যে লেখক পক্ষ সমর্থন করেন নাই। তাহা করিলে সত্যের প্রচারে ক্ষতি হয়। শুধু ঘটনাপুঞ্জ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে পাঠক নিজে নিজেই আপন আপন সংস্কার ও প্রকৃতি অনুসারে সিদ্ধান্ত গঠন করিয়া লইতে পারে। এই সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে। সাক্ষাৎ হইলে তাহার আলোচনা সম্ভবপর।

নির্বিকল্প অবস্থার কথা যাহা বলিয়াছ তাহা সত্যই। সিদ্ধিমা যাহাকে 'পরমপদ' বলেন অনেক মহাপুরুষ তাহাকে দ্বন্দ্বাতীত বিকল্পহীন স্বরূপাবস্থা বলিয়া থাকেন। মা-ও জ্ঞান ও অজ্ঞানের অতীত এমন কি অদ্বৈত ভাবেরও অতীত যে অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন, বৌদ্ধ সম্প্রদায়, অদ্বৈত বৈদান্তিক সম্প্রদায় ও তান্ত্রিক সম্প্রদায় ঐ অবস্থায় বিভিন্ন নামে অঙ্গীকার করিয়াছেন। সুফীগণ এবং পাশ্চাত্য জগতে খৃষ্টীয় মতে Trinity-র মধ্যে উহাই God the Father-এর অন্তরালবর্তী অবস্থা। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি তুরীয় এবং তুরীয়াতীত উহারই অঙ্গভেদ মাত্র। উহাকে নিরাকার বলিলেও ঠিক ঠিক বর্ণনা হয় না। কারণ ঐ অবস্থায় সাকার ও নিরাকারের ভেদবুদ্ধি থাকে না। বস্তুতঃ উহা অব্যক্ত অবস্থা। শ্রীভগবানের উহাই পরমধাম। কিন্তু অনেক সাধক, প্রাকৃত, মলিন সাকার সাধনার পরেই একটি শূন্যবৎ বৈচিত্র্যহীন অবস্থার উপলব্ধি করেন এবং উহাকেই অব্যক্তের পূর্বাভাস বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ উহাকে নির্বিকল্প বলিয়া প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হন না। ইহা কিন্তু ঠিক নহে। প্রাকৃত অবস্থা ভেদ করিয়া অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্বময় এবং চিন্ময় অবস্থাতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে প্রকৃত নিরাকার ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ জড় প্রকৃতি লঙ্ঘন করিয়া চৈতন্যশক্তির সাহায্য না পাইলে নিরাকার সত্তা সাক্ষাৎকার করা সম্ভবপর নহে। বলা বাহুল্য এই নিরাকার সত্তাও প্রকৃত নির্বিকল্প সত্তা

নহে। কারণ সাকার ভাবও যেমন কল্পনা তেমনি নিরাকার ভাবও এক হিসাবে কল্পনা ব্যতীত অপর কিছু নহে। আকারের বিকল্প সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হইয়া গেলে সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ, জড় ও চেতন এই প্রকার যাবতীয় দ্বন্দ্ব চিরদিনের জন্য উপশমপ্রাপ্ত এবং প্রকৃত নির্বিকল্পভাবে স্থিতি হয়। সাকারের মধ্যেই নিরাকারের প্রকাশ হইয়া প্রথমতঃ বিশুদ্ধ নিরাকার ভাবের উদয় হয়। তাহার পর নিরাকার সত্তাসমুদ্রে অবগাহন করিতে করিতে তাহার মধ্যে অচিন্তনীয় ভাবে অখণ্ড সাকার সত্তার সাক্ষাৎকার হয়। তাহার পর সাকার নিরাকার এক হইয়া গেলে বিকল্পহীন অবস্থার উন্মেষ হয় বলিয়া পরমপদের পূর্বাভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১. ৯. ৫৪

৩৯

আপনার প্রশ্নটি Who does? I (With others) or He?' ইহার উত্তরে আমি বলিতে চাই যে দুইই সত্য, অথচ প্রকৃত সত্য যাহা তা উভয়েরই অতীত। যতক্ষণ পর্যন্ত অহংকার আছে এবং কর্তৃত্ব অভিমান আছে অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত মলিন দেহাত্মবোধ রহিয়াছে ততক্ষণ পর্যন্ত 'আমিই কর্তা' ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কর্মের কর্তাও যেমন আমি, তদ্রূপ ঐ কর্মের সুখ দুঃখরূপ ফলভোক্তাও আমি। এই অবস্থাকে বদ্ধ অবস্থা বা সংসার অবস্থা বলা হয়। সাধারণ জীব এই অবস্থায় থাকিয়াই নিরন্তর জন্মমৃত্যুর প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। যখন অহংকার নিবৃত্তি হয় এবং কোন কর্মের কর্তৃত্ব অভিমান নিজের থাকে না, তখন কোন কর্মের জন্যই আমি দায়ীও থাকি না। এইটি জ্ঞানের উদয়ের সমকালে হইয়া থকে। এই অবস্থায় নিজের কর্তৃত্ব থাকে না বলিয়া বাস্তবিক পক্ষে কর্মফলের ভোক্তৃত্বও নিজের থাকে না। এইটি ঠিক সংসার অবস্থা নহে। দেহ অবস্থায় এই স্থিতিলাভ করিলে ইহা হইতে ক্রমশঃ জীবন্মুক্তির অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই অবস্থাতে জীবের সাধন সংস্কার অনুসারে বিভিন্ন প্রকার অবান্তর অবস্থা হইতে পারে। প্রকৃতির গুণের দ্বারাই সকল কর্ম ক্রিয়াবলে হইয়া থাকে। ইহা একটি দৃষ্টি। ইহা বিবেক জ্ঞানের দৃষ্ট। অবিবেক থাকা পর্যন্ত দেহের সহিত বিশুদ্ধ অহং-তত্ত্বের একটা ঐকাত্ম্যবোধ থাকে। অবিবেক কাটিয়া গেলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে আমি বস্তুতঃ কিছুই করি না। করার অভিমান মাত্র আমার হয়। গুণময়ী প্রকৃতিই সব কিছু করিয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন আরও একটি স্থিতি আছে। তখন মনে হয় আমি কিছুই করি না। সব কিছু তিনিই করেন। তিনি কে? তিনি প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ ত্রিগুণের সঞ্চালক সাক্ষাৎ পরমাত্মা। এইটিই জ্ঞানমিশ্র ভক্তির অবস্থা। ইহার পর আরও একটি স্থিতি আছে। তখন ভক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারা যায়, তিনি করেন ইহা ঠিক নহে, তিনি করান এবং তাঁহার দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমি করি। তিনি প্রযোজক আমি প্রযোজ্য ; তিনি যেমন নাচান আমি তেমনি নাচি। তিনি এই ভবনাট্যের সূত্রধার। এই স্থিতিতে ভক্তি ও জ্ঞান উভয়েরই বিকাশ অধিক। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি তাঁহার দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া কার্য করিয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধা প্রকৃতিও কার্য করে। শুদ্ধা প্রকৃতির কার্যবশতঃ সমস্ত সংসার তখন একটি বিচিত্র অভিনয় রূপে প্রতীতি গোচর হয়। সুখ দুঃখ তখনও আসে, কিন্তু ঠিক সুখ দুঃখরূপে নহে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের আকারে। ইহা লীলারসের আস্বাদন। জ্ঞানী ভক্ত দেহে অবস্থান করিয়াও এই রস আস্বাদন করিতে পারেন, কারণ এই অবস্থায় সাধকের মধ্যে প্রকৃত মলিন দেহের অন্তরালে বিশুদ্ধ সত্ত্বময় নির্মল দেহের বিকাশ হয়। এই স্থিতির বিশেষ বিস্তার এখানে অনাবশ্যক।

ইহার পর আরও একটি স্থিতি আছে। তখন সাধক বুঝিতে পারে আমি কর্তা নই, প্রকৃতিরও কর্তৃত্ব নাই, তিনিও কর্তা নহেন এবং তিনি কারয়িতা বা সূত্রধরও নহেন। অথচ কর্ম হইয়া যাইতেছে। ইহা বিশুদ্ধ জ্ঞানের দৃষ্টি।

কর্ম করে কে? এই প্রশ্নের উত্তর— কেউ করেনা। অথচ কর্ম আপনি হয়। ইহাকে বলা হয় স্বভাব। স্বভাব হইতেই কর্ম হয়। এই অবস্থায় কর্ম ও অকর্মের কোন পার্থক্য থাকে না।

ইহার পর এমন একটি নিগূঢ় স্থিতি আছে, যেটি মানবীয় ভাষার অগম্য। সুতরাং সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার চেষ্টা নিরর্থক। সংক্ষিপ্ত-ভাবে আপনার প্রশ্নের উত্তর দিলাম। যদি কোনও অস্পষ্ট বোধ হয় তাহা হইলে নিজের শক্তি অনুসারে স্পষ্টীকরণ করিতে চেষ্টা করিবেন।

আমার পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারিবেন যে আপনার প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর হইতে পারে এবং প্রশ্নকর্তার স্থিতি অনুসারে প্রত্যেকটিই সত্য। আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিরোধ প্রতীয়মান হইলেও বাস্তবিক পক্ষে কোন বিরোধ নাই।

সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে সমাধি অবস্থায় আত্মদর্শন হয়—কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ সমাধি চিত্তের অবস্থা বিশেষ। যথার্থ আত্মদর্শন, শুদ্ধ চিদ্‌রূপী সংবিদের স্ব-সাক্ষাৎকার, চিত্ত থাকিতে হয় না। চিত্তের আত্যন্তিক নিরোধ ব্যতিরেকে উহা সম্ভবপর নহে। আত্মসাক্ষাৎকার বস্তুতঃ আত্মশক্তির দ্বারাই হইয়া থাকে। আত্মশক্তি চিৎশক্তি—উহা চিত্ত নহে। সুতরাং আত্মসাক্ষাৎকারের অর্থ আত্মা নিজেই নিজেকে নিজের দ্বারা সাক্ষাৎকার করেন। ইহা বস্তুতঃ সমাধি অবস্থা নহে, সমাধিজনিত প্রজ্ঞাও নহে। কারণ সমাধিজনিত প্রজ্ঞা চিৎস্বরূপ ও সত্ত্বগুণ উভয়ের গ্রন্থিবন্ধ অবস্থা মাত্র। চিৎ ও অচিতের গ্রন্থিমুক্ত হইয়া গেলে সমাধিপ্রজ্ঞা থাকিতে পারে না। কারণ সত্ত্বগুণ তখন মূল প্রকৃতিতে অস্তমিত হইয়া যায়। চিদরূপ পুরুষ আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। পুরুষের স্বরূপই স্বপ্রকাশ বলিয়া সাক্ষাৎকারাত্মক। অতএব সমাধি অবস্থার পর ভাগ্যক্রমে ভগবদনুগ্রহে যদি আত্মসাক্ষাৎকার হয় তাহা হইলে উহা পুনর্বার নিবৃত্ত হইতে পারে না। আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া গেলে বাস্তবিক পক্ষে সমাধি ও ব্যুত্থান এই উভয় অবস্থায় ভেদ থাকেনা। একটি ক্ষণের জন্য আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলেও বস্তুতঃ উহা নিত্যসিদ্ধ। যতক্ষণ পর্যন্ত সংস্কার ক্ষয় না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মসাক্ষাৎকার সত্ত্বেও সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে জগদ্দর্শন হইয়া থাকে। এই দর্শন বস্তুতঃ দর্শন নহে। ইহা জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিভাস। কারণ একবার আত্মদর্শন করিলে আত্মা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থের দর্শন আর হয় না। যাহা দর্শন হয় বলিয়া মনে করা যায় অর্থাৎ জগতের ভান তাহা পূর্বদৃষ্ট জগতের সংস্কারজনিত স্মৃতিরূপে পুনরুদ্বোধন মাত্র। সুতরাং উহা স্মরণাত্মক—বাস্তবিক পক্ষে অনুভব নহে। আত্মা একবার দৃষ্ট হইলে সেই দর্শনটাই থাকিয়া যায়। উহাই সত্য। ঐ দর্শনটিকে ততক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ দর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত সংস্কারের সম্যক ক্ষয় না হয়। বস্তুতঃ ঐ দর্শনই শুদ্ধ দর্শন। সংস্কার ক্ষীণ হইয়া গেলে উহা শুদ্ধ দর্শনরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু শুদ্ধ হইলেও উহা পূর্ণ আত্মার দর্শন নহে। এই শুদ্ধ আত্মদর্শনে অর্থাৎ কৈবল্যাবস্থায় মিথ্যা জগতের ভান থাকে না। ইহা কেবল অর্থাৎ প্রকৃতি-বিযুক্ত শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ সাক্ষাৎকার। এই অবস্থাকে পূর্ণ বলা যায় না কারণ এই আত্মদর্শনে সর্বভূত দর্শন অন্তর্গত থাকে না। পূর্ণ আত্মদর্শন তখনই সম্ভবপর যখন সর্বভূতকে আত্মরূপে সাক্ষাৎকার করা যায়। শুদ্ধ আত্মদর্শন

বা কৈবল্যের পূর্বে যে সর্বভূতের দর্শন হইয়াছিল তাহা অনাত্মবস্তু এবং মিথ্যা। আত্মশক্তি বা চিৎশক্তির স্ফুরণরূপে সর্বভূতের দর্শন কৈবল্যাবস্থার পরই সম্ভবপর। কিন্তু এই পরাবস্থা চিৎশক্তির উন্মেষ ব্যতিরেকে হইতে পারে না।

নিদ্রাভঙ্গের পর সুপ্তোত্থিত পুরুষ যেমন নিদ্রাকালীন স্বপ্নের বিষয় স্মরণ করিয়া থাকে, সাক্ষাৎ অনুভব করে না, তদ্রূপ মোহমায়ার অভিভবরূপ নিদ্রার অবসানের পর অর্থাৎ আত্মদর্শন সিদ্ধ হইলে—সর্বভূতকে অর্থাৎ জাগতিক সত্তাকে মিথ্যা বলিয়াই মনে হয়। এইখানে যে মিথ্যা বলা হইল তাহা জাগতিক সত্তার অনুভবের দিক্ হইতে বলা হইয়াছে। আত্মানুভূতির পর জাগতিক সত্তার অনুভূতি আর সম্ভবপর হয় না। ঐ সত্তার জ্ঞান তখন স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত হইয়া যায়। তখন সমগ্র জগৎই জ্ঞানীর পূর্ব পরিচিত বলিয়া স্মৃতিপথে ভাসিতে থাকে। বলা বাহুল্য, ইহা শুদ্ধ আত্মানুভূতির পরেই হইয়া থাকে। যখন পূর্ণ আত্মজ্ঞান হয় অর্থাৎ যখন চিৎশক্তির উন্মেষ হয় তখন কিন্তু ঐ স্মৃতি স্মৃতিরূপ পরিহার করিয়া অনুভবের আকার ধারণ করে। এই অনুভবে পূর্বকালের সম্বন্ধ প্রতিভাসমান হয় না। ইহা বর্তমানকালীন বলিয়াই স্পষ্ট অনুভূত হয়। অর্থাৎ আত্মার পূর্ণ স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইলে জগতের পৃথক সত্তা থাকে না। সবই তখন অখণ্ড চিদাত্মার চৈতন্যময়ী শক্তির উল্লাসরূপে প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়, পূর্বানুভবের স্মৃতিরূপে নহে। অতীত ও অনাগত যতক্ষণ নিত্য বর্তমানে অর্থাৎ অখণ্ড চৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থার বিকাশ সম্ভবপর নহে। ইহাই সর্বাত্মভাব—ইহাই প্রকৃত অদ্বৈতভাব। এই মহানুভূতিতে দ্রষ্টা হইতে দৃশ্যের পৃথক্ সত্তা থাকে না। এক ও অনন্ত সমানার্থক প্রতীত হয়। ইহাই উপনিষদের "যস্য সর্বমাত্মৈবাভূৎ"।

সকল বস্তুই বস্তুতঃ আত্মা ইহা শুধু জানিয়া রাখিলে হইবে না। ইহাকে প্রত্যক্ষ অনুভবে পরিণত করিতে হইবে। যখন সমাধিজনিত প্রজ্ঞা আভাসময় আত্মজ্ঞানরূপে উদিত হয় তখন ব্যুত্থান অবস্থায় উহা বর্তমান থাকে না কিন্তু উহার স্মৃতি বর্তমান থাকে। তখন সাধক, আমি সমাধিকালে ক্ষণেকের জন্য আত্মদর্শন করিয়াছিলাম, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ঐ অবস্থায় ব্যুত্থানকালে যাহা জগতের অনুভব হয়। ঐ অনুভব সত্য বলিয়াই গণ্য হয়। কিন্তু যখন সমাধির অতীত অবস্থায় সত্য সত্যই আত্মদর্শন হয়—আভাসময় নহে, তখন বাস্তবিক পক্ষে সাধক জ্ঞানী। তাঁহার নিকট সমাধি ও ব্যুত্থানে কোনও ভেদ থাকে না। এই জ্ঞানলাভ হইলে আর ব্যুত্থান থাকে না এবং সমাধি অবস্থাও থাকে না। তবে চিত্তের দিক্ দিয়া সমাধি ও ব্যুত্থান এই দুইটি অবস্থার পার্থক্য তখনও থাকে, কারণ তখনও সংস্কার রহিয়াছে।

এই অবস্থার আত্মদর্শন ক্ষণেকের জন্য হইয়া থাকিলেও তাহা নিত্য দর্শন। তাহা কখনই নিবৃত্ত হয় না। জগতের ভান চিত্তের ব্যুত্থান অবস্থার তখনও থাকে বটে কিন্তু উহা অভ্রান্ত অনুভব রূপে নহে, মিথ্যা প্রতীতিরূপে মাত্র সত্য দর্শনের সহিত জড়িতভাবে প্রকাশ পায়। প্রারব্ধ সংস্কার ক্ষীণ হইয়া গেলে এই মিথ্যার আভাসও বিগলিত হইয়া যায়। তখন একমাত্র আত্মাই থাকেন এবং নিজেই নিজের নিকট প্রতিভাসমান হন। তখন প্রারব্ধ সংস্কার থাকে না—ইহা বিদেহ কৈবল্য। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ না থাকিলে এই কৈবল্যের পরাবস্থা লাভ হয় না। ভগবদনুগ্রহে স্বরূপস্থ চিদ্‌রূপী আত্মার চিদ্‌রূপা শক্তি জাগিয়া উঠে। তখন দর্পণে যেমন সমগ্র নগর দৃশ্যমান হয় তেমনি শুদ্ধ আত্মরূপী দর্পণে আত্মশক্তির স্ফুরণরূপী অনন্ত ভূতরাশি দর্পণের সহিত অভিন্নরূপেই প্রতিভাসমান হয়। তখন নিজের মধ্যেই নিজ শক্তির বিলাসরূপ জগৎকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই গীতার সর্বভূতানি চাত্মনি—অর্থাৎ আত্মস্বরূপে সর্বভূতের দর্শন।

১. ২. ৪৫.

৪১

তোমার প্রশ্নের উত্তর ক্রমশঃ দিতেছি।

(ক) চৈতন্যসত্তা দেহের সর্বত্র সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঐ সত্তা সমরূপে সর্বত্র থাকিলেও উহার অভিব্যক্তির একটি বিশেষ কেন্দ্র আছে। ঐ কেন্দ্র হইতে শক্তির স্ফুরণ নিরন্তর হইতেছে, এবং তাহা দ্বারাই দেহের যাবতীয় কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে। যে স্থানটিকে শক্তি বিকাশের কেন্দ্র বলিয়া বর্ণনা করা হইল তাহা বস্তুতঃ দেহের অতীত হইলেও দেহমধ্যে তাহার প্রতিভাস বা আভাস লক্ষিত হয়। দেহের কার্য্য নির্বাহের জন্য ঐ তথাকথিত আভাসই কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। শূন্যকে আশ্রয় না করিয়া চৈতন্য বাহ্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। অর্থাৎ চৈতন্য যতক্ষণ পর্যন্ত স্বরূপে বিশ্রান্ত থাকে ততক্ষণ ভিতর বাহির বলিয়া কোন ভেদ থাকে না। কিন্তু স্বাতন্ত্র্যবশতঃ যখন বিশ্রাম ভঙ্গ হয় তখন সর্বপ্রথম স্বভাবের উপর একটি অভাবের আরোপ হইয়া থাকে, যাহাকে ইংরেজীতে বলে self-negation। এই অভাবটিরই নামান্তর শূন্য বা মহাশূন্য। ইহাই ভবিষ্যৎ সৃষ্টির ভিত্তি স্বরূপ। অর্থাৎ এই মহাশূন্যের উপরই চৈতন্য স্বীয়

কর্তৃত্ব-শক্তির প্রভাবে সৃষ্টি রচনা করিয়া থাকে। দেহের অভ্যন্তরে এইপ্রকার শূন্য বিদ্যমান রহিয়াছে। সেইখান হইতেই মূল চৈতন্যের প্রতিভাস স্বশক্তি বিস্তারপূর্বক কার্য করিয়া থাকে। এই শূন্য মূলতঃ এক হইলেও অর্থাৎ ইহা মহাশূন্যাত্মক হইলেও খণ্ডভাবে ইহা বহুসংখ্যক। নাড়ী, হৃদয়, মস্তক প্রভৃতি স্থানে এই শূন্যের সত্তা বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে যেখানে শূন্য বিদ্যমান আছে বুঝিতে হইবে সেখানে সেখানেই চৈতন্যস্বরূপ অবস্থায় স্বকার্য সাধনের উপযোগী পীঠ বর্তমান আছে। ঐ পীঠে প্রতিবিম্বিত আত্মচৈতন্য তত্তৎ শক্ত্যাত্মক কিরণরূপে বিকীর্ণ হইয়া দেহের যাবতীয় ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছে।

(খ) প্রথম প্রশ্নের উত্তরেই এই প্রশ্নের কতকটা সমাধান হইতে পারে। হৃদয়াকাশে আত্মা বিরাজ করেন ইহা সত্যই—আবার মূলাধার চক্রে আত্মশক্তি সুপ্ত রহিয়াছে ইহাও সত্য। এই দুইটি কথার মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই। যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তি অর্থাৎ চিন্ময়ী-শক্তি সুপ্তভাবে বিদ্যমান থাকেন ততক্ষণ পর্যন্ত চৈতন্যের ক্রিয়া উপলব্ধ হয় না। সুপ্তিভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানের উদয় অথবা জীবাত্মার জাগরণ সূচিত হয়। জীবাত্মা জাগিলেই শিবরূপ ধারণ করেন। শক্তির প্রবুদ্ধ ভাবই জীবাত্মার জাগরণ বলিয়া বর্ণিত হয়। যতক্ষণ শক্তি নিদ্রাবস্থায় বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মা শিবরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। পূর্বে যে সকল দেহস্থিত শূন্যমণ্ডলের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে এই অবস্থার পূর্বে ঐগুলি ঘোর তমসাচ্ছন্ন থাকে। মন এবং প্রাণ আত্মশক্তির প্রসুপ্তাবস্থায় উদ্দাম-বেগে খেলা করিতে থাকে। যে সকল নাড়ীর মধ্য দিয়া ইহারা সঞ্চরণ করে ঐগুলি অত্যন্ত জটিল এবং পরস্পর জড়িত হইয়া ধীবরের মৎস্যজালের ন্যায় সমগ্র দেহে বিস্তৃত থাকে। ব্যষ্টিদেহ ও সমষ্টিদেহ অর্থাৎ পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ড একই নিয়মের অধীন। সমগ্র জগদ্ব্যাপী এই জালটিকে মায়াজাল বলে। ইহারই মধ্যে ভাবানুযায়ী তন্তু আশ্রয় করিয়া মন ও প্রাণ বিচরণ করিতে থাকে। ইহারই নামান্তর সংসার ভ্রমণ। আত্মশক্তি জাগ্রত হইলে মন ও বায়ুর বেগ মন্দীভূত হয়। জাগরণের পূর্ণাবস্থায় উভয়ই স্তম্ভিত হইয়া যায় এবং সর্বশেষে নিষ্ক্রিয়ভাব ধারণ করে। তখন সর্বত্রই একমাত্র চৈতন্যশক্তি কার্য করিয়া থাকে। মূলাধারে স্থিতি ততক্ষণ পর্যন্ত—যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তি নিদ্রিত। শক্তি জাগিয়া উঠিলে মূলাধারে অবস্থান হয় না। ক্রমশঃ অন্তর্মুখ গত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। শক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়াকাশ আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আত্মা হৃদয়ে স্বসত্তার অনুভব তখনই করিতে পারে—যখন শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে এবং অন্তর্মুখ গতির অবসান হইয়াছে। হৃদয় হইতে যে গতির সূত্রপাত হয় তাহা ঊর্ধ্বমুখ গতি। ইহা জাগ্রত ও

একাগ্রীভূত চৈতন্যশক্তি কর্তৃক পরমেশ্বরের বা পরব্রহ্মের অভিমুখে যাত্রা। যতক্ষণ নিজেকে সাক্ষী অথবা দ্রষ্টারূপে বা মন্ত্ররূপে না পাওয়া যায় ততক্ষণ ভগবদভিমুখী গতি আরম্ভই হয় না। সুতরাং তোমার প্রশ্নের উত্তর এই— সাক্ষীরূপী আত্মা অর্থাৎ জাগ্রৎ জীবন্মুক্ত আত্মা হৃদয়াকাশে নিজেকে প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু যতক্ষণ তাহার জাগরণ সিদ্ধ না হইতেছে ততক্ষণ হৃদয়-সিংহাসন শূন্যই পড়িয়া থাকে। হৃদয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। ওখানে খুঁজিয়া কাহাকেও পাওয়া যায় না, এমন কি খুঁজিতে গেলেও আত্মহারা হইতে হয়। কারণ সুষুপ্তি অবস্থায় মন স্বভাবতঃই হৃদয়কে আশ্রয় করে এবং নাড়ীচক্র অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু তাহাতে লাভ কি হয়?— সুষুপ্তিতে মন স্থির হইয়া যায় বটে, কিন্তু আত্মচৈতন্যের বিকাশ হয় না। যদি মন হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলেই আত্মার জাগরণ সিদ্ধ হইত তাহা হইলে সুষুপ্তির ও সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকিত না। জ্ঞানের অনুদয় পর্যন্ত হৃদয়মন্দিরে ইষ্ট বা স্বয়ং কাহাকেও পাওয়া যায় না। ততদিন পর্যন্ত আত্মশক্তি সুপ্ত হইয়া মূলাধারে স্বয়ম্ভূলিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া বর্তমান থাকে।

(গ) দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হইতেই ইহার কিঞ্চিৎ সমাধান হইতে পারে। মানবের দ্বারা লৌকিক যে সকল কার্য হইতেছে তাহা শক্তির চৈতন্যের অবস্থার কার্য নহে। মানুষ নিদ্রিত হইলে যেরূপ সংস্কারবশতঃ স্বপ্ন দর্শন করে ঠিক সেইপ্রকার চৈতন্যশক্তিরূপা কুণ্ডলিনীর সুপ্তাবস্থায় মানবের যে কিছু জ্ঞান বা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়—সবই স্বপ্নবৎ—উহা চৈতন্যের দ্বারা হয় না— আভাসচৈতন্য দ্বারা হয়। কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইলে ক্রমশঃ এই আভাসচৈতন্য যথার্থ চৈতন্যে পরিণত হয়। তখন এই দীর্ঘ সংসাররূপী স্বপ্ন ভগ্ন হইয়া যায়। কারণ নিদ্রা ব্যতিরেকে যেমন স্বপ্ন হয় না তদ্রূপ চৈতন্যশক্তি সুপ্ত না থাকিলে সংসাররূপ স্বপ্ন দর্শন হইতে পারে না। সুতরাং শক্তির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই তদনুপাতে সংসারের নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সংসার নিবৃত্ত হইলেও জগতের নিবৃত্তি হওয়ার কোন কথা নাই। কারণ জীবসৃষ্টি না থাকিলেও ঈশ্বরসৃষ্টি অবশ্যই থাকে। ঈশ্বরসৃষ্টি আপেক্ষিক ভাবে সত্য। কিন্তু জাগরণের আত্যন্তিক প্রকর্ষে ঈশ্বরসৃষ্টিও থাকে না। তখন সমগ্র জগৎই চিদাত্মার স্বরূপশক্তির বিলাস বলিয়া প্রতীতি হয়। অজ্ঞানকল্পিত জগৎ তখন আর নাই।

(ঘ) কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংঘর্ষণ হইলে অগ্নি উৎপন্ন হয়, কারণ কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি সুপ্তভাবে বিদ্যমান থাকে। তীব্র সংঘর্ষণের দ্বারা উহা অভিব্যক্ত হয়। তদ্রূপ দেহে চৈতন্যশক্তি ওতপ্রোত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু অব্যক্ত। উহাকে অভিব্যক্ত করিতে হইলে তীব্র সংঘর্ষ আবশ্যক। এই তীব্র সংঘর্ষই ক্রিয়াশক্তির ব্যাপার। যাহাকে দীক্ষা বলা হয় তাহা ইহারই নামান্তর। দীক্ষা বলিতে

গেলে কোন বাহ্য ব্যাপার বুঝায় না। চিৎশক্তির ক্রিয়াংশের ব্যাপার না হওয়া পর্যন্ত জীবের মোহনিদ্রা দূর হইতে পারে না। এই ব্যাপারের মূলে শক্তিমান্ পরমেশ্বরের স্বভাবসিদ্ধ অনুগ্রহ রহিয়াছে। ইহা অর্থাৎ এই ক্রিয়াশক্তির খেলা কোন বাহ্য আধার আশ্রয় করিয়া হইতে পারে এবং না করিয়াও হইতে পারে। তীব্র বেগেও হইতে পারে এবং অত্যন্ত মন্দ বেগেও হইতে পারে। বাহ্য অথবা আভ্যন্তরীণ উপকরণসাপেক্ষ ভাবেও হইতে পারে। অথবা তন্নিরপেক্ষ ভাবেও হইতে পারে। সাক্ষাদ্‌ভাবেও হইতে পারে অথবা কর্ম জ্ঞান প্রভৃতি পরম্পরায়ও হইতে পারে। ইহার অনন্তপ্রকার বৈচিত্র্য আছে। সার কথা এই—ক্রিয়ার সংঘর্ষ ব্যতিরেকে ঘুমন্ত শক্তিকে জাগাইবার আর কোন উপায় নাই। শক্তি জাগিলেই তাহার অব্যর্থ প্রাথমিক চিহ্ন এই—সাংসারিক আসক্তি কমিতে থাকে—জগতের কোন পদার্থে রুচি অথবা আনন্দ অনুভূত হয় না এবং কি যেন কিসের অভাবে অথবা টানে চিত্ত কোন্ এক অজানা দিকে ধাবিত হয়। এইপ্রকার বহু লক্ষণ প্রকাশিত হয়। এখানে তাহার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

২১. ৫, ৪৫

৪৩

চিৎ ও চিদাকাশে এবং চিচ্ছক্তি ও চিৎসাম্রাজ্যে প্রভেদ কি?

চিৎ ও চিদাকাশ একই বস্তু তথাপি উভয়ে ভাবগত তারতম্য আছে। 'চিৎ' এই ভাবটি দেশ ও কালের অতীত। ইহাতে ব্যাপকতা ধর্মের আরোপও চলে না। কিন্তু যখন সৃষ্টির ভিত্তিরূপে ইহাকে ব্যাপক সত্তারূপে গ্রহণ করা হয় তখন ইহা চিদাকাশ পদবাচ্য হয়। চিদাকাশ ব্যাপক—চিৎ ব্যাপক ও অব্যাপক উভয়ের অতীত। যদি কোন চক্রের কেন্দ্রটিকে চিৎ বলিয়া ধরা যায় তাহা হইলে সমগ্র মণ্ডলটি চিদাকাশ পদবাচ্য হইবে।

চিৎ হইতে চিদাকাশের প্রকাশ চিৎশক্তির উন্মেষ এবং ক্রিয়াসাপেক্ষ। ঘরের মধ্যে যদি প্রদীপ থাকে কিন্তু দীপের কিরণধারা যদি চারিদিকে বিকীর্ণ না হয় তবে ঘরটি আলোকিত হয় না, সেইরূপ চিৎ থাকা সত্ত্বেও চিৎশক্তির ক্রিয়া ব্যতিরেকে চিদাকাশের অভিব্যক্তি সম্ভবপর নহে। চিৎ ও চিদাকাশের মধ্যাবস্থাই চিচ্ছক্তি। চিৎকে যদি স্বরূপ ধরা যায় তাহা হইলে চিৎশক্তি তাহার অন্তরঙ্গ শক্তি এবং চিদাকাশ তাহার বৈভব। চিৎসাম্রাজ্য পৃথক্ বস্তু, কারণ চিদাকাশ

নিরাকার এবং চিৎসাম্রাজ্য সাকার। চিদাকাশে বৈচিত্র্য নাই—চিৎসাম্রাজ্যে অনন্ত বৈচিত্র্য। চিদাকাশকে আশ্রয় করিয়া পৃথক্ পৃথক্ চিন্ময় রাজ্য আবির্ভূত হয়। এই সকল রাজ্যের সমষ্টিই চিৎসাম্রাজ্য। ব্রহ্মলোক এবং ব্রহ্মস্বরূপে যে পার্থক্য চিৎসাম্রাজ্য ও চিদাকাশেও কতকটা সেইরূপ পার্থক্য। কতকটা বলিলাম এইজন্য যে চিদাকাশের সহিত চিৎশক্তির এই জাতীয় পার্থক্য আছে। মৌলিক ক্রম এই—চিৎ—চিৎশক্তি—চিদাকাশ—চিৎসাম্রাজ্য। সংক্ষেপে বলিলাম।

চিৎশক্তি জীবের চিন্ময় জিহ্বা ব্যতীতও নিজের আনন্দ নিজে পান করিতে সমর্থ কি না?

ইহার উত্তর না-ও বলা যায়, হাঁ-ও বলা যায়। দৃষ্টিভেদে উত্তর পৃথক্ হইবে। বাস্তবিক পক্ষে চিৎশক্তির প্রকাশ আনন্দাত্মক না হইয়া পারে না। ইহা স্বরূপভূত আনন্দ সুতরাং এই স্থলে পারা না পারার কোন অর্থ নাই। কারণ যাহা স্বপ্রকাশ তাহার অভাব কল্পনা করা যায় না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃত আস্বাদন জীবই করিয়া থাকে অথচ ইহাও সত্য—জীব জীবভাব লইয়া চিদানন্দময় রাজ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। প্রকৃত কথা এই—ভাব হইতে অভাবে যাইয়া পুনরাবর্তন করিতে পারিলে এই ভাবই স্বভাবরূপে পরিণত হয়। এইজন্য ভাবাবস্থার আনন্দ আস্বাদনাত্মক নহে, কারণ ভাবাবস্থায় দুঃখের অনুভূতি থাকে না। ভাবাবস্থা হইতে অভাবে গিয়া দুঃখের অনুভব প্রাপ্ত হইলে পুনর্বার ভাবাবস্থায় ফিরিয়া ওখানকার স্বরূপভূত আনন্দকে আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়। প্রথমাবস্থায় জীবভাব থাকে না, আবার চরমাবস্থাতেও জীবভাব থাকে বলিয়াই প্রথমাবস্থায় যাহা ঠিক ঠিক আস্বাদিত হয় নাই চরমাবস্থায় তাহা আস্বাদিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে অধিক লেখা বাহুল্য।

১৯. ৫. ৪৫

নাম করিতে করিতে ধ্বনি অথবা নাদের বিকাশ হইয়া থাকে ইহা তুমিও অনুভব করিয়াছ। নাদ মূলে এক হইলেও ইহাতে অনন্তপ্রকার সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য আছে। যেমন একই প্রকার আলোকে অনন্তপ্রকারের রূপ প্রকাশিত হয় তেমনি একই মহানাদে অনন্তপ্রকারের খণ্ড শব্দ নিহিত থাকে। মহানাদকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র সৃষ্টি প্রকাশ পাইতেছে, শুধু আমাদের জগৎ নহে, লোক লোকান্তর সমন্বিত অনন্ত জগৎ ঐ এক মহানাদেই প্রকাশমান হয়। ইহারই এক একটা অংশ এক একটি খণ্ড নাদ বলিতে পারা যায়। দেহকে আশ্রয় করিয়া অসংখ্য চক্র আবর্তিত হইতেছে। বস্তুতঃ ঐ চক্রসকলের আবর্তনেই দেহটি চৈতন্যময় বলিয়া প্রতীত হইতেছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ কত চক্র যে এই দেহে রহিয়াছে তাহা বলা যায় না। কোন চক্রই স্থির নহে—সবগুলি আপন আপন বেগে আবর্তন করিতেছে। এই সকল ছোট বড় চক্রের ঘূর্ণীর ফলস্বরূপ আমাদের চিত্তে নানাপ্রকার বৃত্তির উদয় হইতেছে। বস্তুতঃ এই সকল বৃত্তি অথবা মানসিক ভাবপুঞ্জ চক্রসকলের আবর্তনের ফলজনিত অনুভব ভিন্ন অপর কিছু নহে। ইহাই আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতা। এই সকল আবর্তন হইতে অনবরত তরঙ্গাত্মক শব্দ উত্থিত হইতেছে। যেমন একটি মেশিনে ছোট বড় নানাপ্রকার চাকা অনবরত ঘুরিতে থাকিলে শব্দের উদয় হয় ইহাও কতকটা সেইরূপ। এই সকল শব্দ ধন্যাত্মক। প্রতি যন্ত্রের শব্দই ভিন্ন কিন্তু যন্ত্র বহুসংখ্যক বলিয়া সবগুলি ধ্বনি একসঙ্গে শ্রুতিগোচর হয়। এই সকল ধ্বনিই বহির্মুখ মন অনুভব করিতে পারে না। অর্থাৎ এইগুলিকে ধ্বনিরূপে অনুভব না করিয়া মানসিক বৃত্তিরূপে অনুভব করে। বস্তুতঃ এই সবগুলি ধ্বনি। যাহাদের লক্ষ্য অন্তর্মুখ হইয়াছে তাহারা চিত্তের জল্পনা-কল্পনা সবগুলিকেই শব্দরূপেই অনুভব করিয়া থাকে। ইহাই অশুদ্ধ শব্দের খেলা। এই ধ্বনিতেই জগৎ ডুবিয়া রহিয়াছে—অথচ বুঝিতে পারিতেছে না। যোগীর একমাত্র লক্ষ্য এই ধ্বনিকে অতিক্রম করিয়া উর্ধ্বে উত্থিত হওয়া।

গুরুদত্ত নাম বা মন্ত্র যথাবিধি অভ্যাস করিতে পারিলে উহা হইতেও ধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই ধ্বনি বিশুদ্ধ। ইহা অশুদ্ধ ধ্বনিকে শুদ্ধ করিয়া আপন স্বরূপে পরিণত করে। অশুদ্ধ ধ্বনিতে ধ্বনি অংশ অপেক্ষা বর্ণাংশের প্রাধান্য থাকে বলিয়া উহাতে বিকল্পের উদয় হয়। এই বর্ণভাগ ক্রমশঃ গলিয়া গিয়া সম্পূর্ণভাবে ধ্বনিতে পরিণত হইলে এবং সেই ধ্বনি পূর্বোক্ত বিশুদ্ধ ধ্বনিতে বিলীন হইলে একমাত্র শুদ্ধ ধ্বনিই বিরাজ করে। ইহাই চৈতন্যশক্তির

খেলা। নাম বা মন্ত্র-জপ হইতে এই বিশুদ্ধ ধ্বনিরই বিকাশ হয়।

ধ্বনি মূলবস্তু নহে, উহা জ্যোতির বহির্মুখ ক্রিয়াজনিত অনুভূতি মাত্র। অর্থাৎ জ্যোতি আপনাতে আপনি বিশ্রান্ত না হইয়া বাহিরের দিকে উন্মেষ প্রাপ্ত হইলে জ্যোতির চারিদিকে অখণ্ড ধ্বনিমণ্ডল সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই ধ্বনিমণ্ডল বহিরুন্মেষ বা বাহ্যভাবের আধিক্যবশতঃ অশুদ্ধ ধ্বনিতে পরিণত হইয়া বায়ুসহযোগে বর্ণমালারূপে প্রকাশিত হয়। অন্তর্মুখ গতিতে জপ ও ধ্যানের ফলে এই বর্ণমালা গলিয়া গিয়া অশুদ্ধ ধ্বনিভাব পরিহারপূর্বক শুদ্ধ ধ্বনিরূপে পরিণত হয়। শুদ্ধ ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে চিত্ত যখন অন্তর্মুখ হয় তখন ধ্বনি হইতে জ্যোতির বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। চরমাবস্থায় জ্যোতিই থাকিয়া যায়, ধ্বনি আর শ্রুতিগোচর হয় না। তখন যেন স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় জ্যোতির বাহিরে ধ্বন্যাত্মক শব্দ এবং ধ্বনির বাহিরে বর্ণাত্মক শব্দ। এই বর্ণসমষ্টি লইয়া বদ্ধজীবের ভাব ও ভাষা রচিত হইয়াছে।

চক্ষু মুদ্রিত করিলে যে অন্ধকার দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অবিদ্যার স্বরূপ। তাহা চক্ষু বুজিলেও যেমন থাকে, না বুজিলেও তেমনি থাকে। তবে লক্ষ্য বহির্মুখ থাকিলে বাহিরের আলো প্রকাশিত হয় বলিয়া ঐ ব্যাপক অন্ধকারটি দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু উহা দূর হয় না। উহা দূর করিবার একমাত্র উপায় শুদ্ধ শব্দের প্রভাবে জ্যোতির বিকাশ। জ্যোতির বিকাশ ও স্থিতি হইলে পূর্বোক্ত অন্ধকারটি চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া যায়। জ্যোতিতে স্থিতিলাভ করিতে পারিলে এবং অভিভূত না হইয়া গেলে জ্যোতির মধ্যে রূপের আবির্ভাব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এই জ্যোতির সহিত রূপের সম্বন্ধ দুইভাবে উপলব্ধ হয়। প্রথম বুঝিতে পারা যায় জ্যোতিই যেন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘনীভূত হইয়া জ্যোতির্ময় দৃশ্যরূপে পরিণত হইয়াছে। যেমন সমুদ্রের জল স্থানে স্থানে জমিয়া বরফের পাহাড় রূপে পরিণত হয় ঠিক সেইরূপ। কিন্তু ইহার পর আর একটা অবস্থা আসে তখন বুঝা যায় জ্যোতিটি ঘনীভূত হইয়া রূপ হয় নাই কিন্তু রূপ হইতেই চারিদিকে জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। ইহা অতি উচ্চ অবস্থা। জ্যোতির মধ্যে ইচ্ছার খেলা অনুসারে এই রূপের বিকাশ সম্ভবপর হয়। যে সাধকের ইচ্ছাশক্তি জ্যোতিতে প্রবেশ করিয়া অস্তমিত হইয়া যায় সে ঐ মহাজ্যোতির মধ্যে ডুবিয়া যায়, উঠিতে পারে না। এবং তাহার নিজের সত্তা পৃথক্ ভাবে অনুভূত হয় না বলিয়া তাহার উঠিবার সম্ভাবনা নাই। তবে সদ্গুরু বা ভগবান্ তাহাকে ঐ মহাজ্যোতির কারাগার হইতে উদ্ধারকরিয়া নিজের চরণে নিয়া আসিতে পারেন। পূর্বে যে অবস্থার কথা বলিলাম তাহারও পরাবস্থা আছে। তখন রূপ শুধু রূপই থাকে। তাহা হইতে আলোক বিকীর্ণ হয় না। তাহা দেখিবার জন্য আলোকের আবশ্যকতা হয় না। ঐ রূপ স্বয়ংপ্রকাশ। ঐখানে শব্দ প্রবেশ

করিতে পারে না, জ্যোতিও প্রবেশ করিতে পারে না। ইহাই নিজ ধামের ক্ষীণ আভাস। সংক্ষেপে বলিলাম, বাকীটা তুমি বুঝিয়া লইবে।

নাম হইতে শব্দ জাগে ইহা সত্য, কাম হইতে জাগে ইহাও সত্য। কারণ, শব্দ চৈতন্য। তীব্র আঘাত পাইলেই উহা ফুটিয়া উঠে। বস্তুতঃ উহা সর্বদা জাগিয়াই আছে। যাহার চিত্তে ধ্বনি নিত্য জাগ্রত রূপে বর্তমান নাই তাহার পক্ষে কামের প্রভাবে ঐ ধ্বনির সন্ধান পাওয়া সম্ভবপর নহে। শুধু কাম কেন তীব্র ক্রোধ অথবা ঐ জাতীয় অন্য কোন উগ্র বৃত্তির প্রভাবেও ধ্বনি জাগিয়া উঠিতে পারে। যাহা হইতে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় তাহা হইতেই ঐ জাগ্রত নাদ সাধকের অন্তরে নিজেকে প্রকাশিত করে। বস্তুতঃ এই বিচিত্র কারণে অর্থাৎ কামাদির প্রভাবে ধ্বনির উন্মেষ অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির সংঘর্ষের নিদর্শন মাত্র। যাহার অন্তঃপ্রকৃতি বহিরুন্মুখ সে এই প্রকার ধ্বনি ঐ অবস্থায় উপলব্ধি করে না। পক্ষান্তরে যাহার বহিঃপ্রকৃতি অন্তরুন্মুখ সেও ঐ প্রকার ধ্বনি উপলব্ধি করে না।

বহিঃপ্রকৃতি অন্তরুন্মুখ হইলে এবং তদনুরূপ থাকিলে যে ধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা স্বাভাবিক ক্রমে মূল স্থানে পৌছাইয়া দেয়। ধ্বনিতে ধ্বনিতে যে ভেদ আছে ইহা সত্য। বস্তুতঃ প্রত্যেক স্তরের ধ্বনিই পৃথক্। এইখানে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র।

* * * *

প্রাণায়ামের সাহায্যে এবং মন্ত্রের সাহায্যে এই উভয় প্রকার উপায়েই নাদ উত্থিত হইতে পারে। কিন্তু নাদ যে ভাবেই উত্থিত হউক তাহার মূল আবির্ভাব প্রক্রিয়া একই। বিন্দুরূপিণী মহামায়া সাক্ষাদ্ ভাবে শুদ্ধ জগতের এবং পরম্পরাতে অশুদ্ধ জগতের উপাদান কারণ। যখন পরমেশ্বরের স্বরূপভূতা চিৎশক্তি এই বিন্দুকে আঘাত করেন, তখন বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া নাদরূপে প্রসার প্রাপ্ত হয়। বিন্দু ক্ষুব্ধ না হইলে নাদের আবির্ভাব হইতে পারে না এবং মহাশক্তির স্বাতন্ত্র্যমূলক আঘাত ব্যতিরেকে বিন্দুর ক্ষোভ সম্পাদিত হয় না। বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া একদিকে যেমন শাব্দী সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হয়, অপরদিকে তেমনি আর্থী সৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হইয়া থাকে। মন্ত্র, মন্ত্রেশ্বর, মন্ত্রমহেশ্বর এবং যাবতীয় শুদ্ধ জগতের অধিবাসিবর্গের দেহ ও করণ,এই ক্ষুব্ধ বিন্দু হইতেই সৃষ্টির প্রাক্‌কালে রচিত হইয়া থাকে। শব্দের সঙ্গে অর্থের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ থাকিলেও উভয়েরই মূলে বিন্দু ভিন্ন অপর কিছুই নহে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলা যায়, ছত্রিশটি তত্ত্ব এবং তত্ত্বময় বিশ্ব মূলতঃ বিন্দু ভিন্ন অপর কিছুই নহে। এই বিন্দুরই নামান্তর কুণ্ডলিনী শক্তি। ব্যষ্টিরূপে মানবদেহে জীব-কুণ্ডলিনীরূপে এবং সমষ্টিরূপে বা মহাসমষ্টিরূপে ব্রহ্মাণ্ড বা বিশ্বদেহে

জগৎকুণ্ডলিনীরূপে এই শক্তিই বিরাজ করিতেছে। সুতরাং কুণ্ডলিনী হইতেই নাদের আবির্ভাব। মাতৃগর্ভে যখন জীবদেহ রচিত হয় এবং বিশ্বমাতৃকার গর্ভে যখন আদিসৃষ্টির উদ্ভব হয়—উভয়ত্রই কুণ্ডলিনীরই ক্রিয়া চলিতে থাকে। ইহা সৃষ্টির দিক্‌কার কথা। কিন্তু সাধক যখন নাদকে অভিব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করেন তখন উহা সংহার অথবা প্রত্যাবর্তন পথেই করিতে হয়। এইজন্যই প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে যদিও আমরা ব্যাবহারিক ভাষাতে বলি যে নাদকে অভিব্যক্ত করিতে হইবে তথাপি ইহা সত্য যে বাস্তবিক পক্ষে মহাপ্রলয় না হওয়া পর্যন্ত নাদ চির অভিব্যক্তই রহিয়াছে—নাদকে অভিব্যক্ত করিতে হয় না। নাদ যদি অব্যক্ত থাকিত তাহা হইলে সৃষ্টি থাকিতে পারিত না, কারণ সৃষ্টি নাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয়ত্র একই কথা। অতএব নাদ অভিব্যক্ত করার অর্থ এই অভিব্যক্ত নাদকে উপলব্ধিগোচর করা। প্রাণায়ামের দ্বারা কুম্ভক প্রভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিচ্ছেদ হইলে সুষুম্নাপথে সূক্ষ্ম বায়ুর গতি অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকে। তখন মন ইড়া পিঙ্গলা মার্গ পরিহার করিয়া যে অনুপাতে সুষুম্না-পথে প্রবিষ্ট হয়, সেই অনুপাতে সুষুম্নাস্থ নাদধ্বনি শুনিতে পায়। সুষুম্না শূন্য পথ, শূন্যই আকাশ, নাদ উহারই ধর্ম। সুতরাং যতক্ষণ আকাশ বা ব্যোমপথে প্রবিষ্ট না হওয়া যায় ততক্ষণ নাদশ্রবণ কি প্রকারে হইতে পারে? কুম্ভকের দ্বারা এই ব্যোমপথেই প্রবেশ লাভ হয়। সেইজন্য প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই মনের যোগ থাকা নিবন্ধন নাদের উপলব্ধি হইয়া থাকে। মন্ত্র বস্তুতঃ নাদময়। কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়াই মন্ত্রের স্বরূপ রচিত হয়। মন্ত্রের দেহ বৈন্দব দেহ সন্দেহ নাই। তবে আমাদের অচৈতন্য বশতঃ এই নাদরূপী মন্ত্রে নানাপ্রকার আবরণ আসিয়া পড়িয়াছে। জপাদির দ্বারা এবং অন্যপ্রকার সাধনার প্রভাবে এই আগন্তুক আবরণ অপসারিত হইলেই মন্ত্রের নাদময়তা অনুভূত হয়। আকাশে সূর্য উদিত থাকিলেও মেঘের আচ্ছাদনবশতঃ যেমন তাহা উপলব্ধি-গোচর হয় না, ঠিক সেইপ্রকার মন্ত্র নাদময় হইলেও আবরণ-বশতঃ এই নাদময়তা অনুভূত হয় না। যাহাকে মন্ত্র-চৈতন্য বলে তাহাই মন্ত্রের নাদময়তা অনুভব। বস্তুতঃ মন্ত্র নিত্যচেতন, তথাপি যতক্ষণ আবরণ অপসারিত না হয়, ততক্ষণ তাহাকে চেতন বলিয়া উপলব্ধি করা যায় না।

সুতরাং মন্ত্র জাগিলে সুষুম্নাপথে নাদধ্বনিরূপে উহার সন্ধান পাওয়া যায়। কুম্ভকের ফলে মন সুষুম্নাতে প্রবিষ্ট হইলেও ঐ প্রকার নাদধ্বনি পাওয়া যায়। যে কোনপ্রকারেই হউক সালম্ব ভাব হইতে কিঞ্চিৎ নিরালম্ব ভাব আসিতে আরম্ভ করিলেই নাদের আবির্ভাব হইয়া থাকে। নাদের বিকাশ ভিন্ন আকাশমার্গে সঞ্চার বা খেচরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। শূন্য, মহাশূন্য, অতিশূন্য প্রভৃতি শূন্যের ঔপাধিক ভেদ রহিয়াছে। সেইপ্রকার নাদের

অভিব্যক্তিতেও ক্রম আছে, কারণ নাদ হইতে মহানাদ পর্যন্ত না গেলে নিত্যগুরুর সন্ধান পাওয়া যায় না।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে যে-কোন উপায়েই হউক সুষুম্নাপথে লক্ষ্য পড়িলেই নাদ শ্রুতিগোচর হয়। সামান্য দৃষ্টিতে উপলব্ধির প্রকারভেদবশতঃ নাদের ভেদ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রাণায়ামের ফলে নাদের অনুভব এবং মন্ত্রজপের ফলে নাদের অনুভব—এই উভয় অনুভবে এক দৃষ্টিতে কোনই পার্থক্য নাই। ইহা সামান্য অনুভব কিন্তু বিশেষ অনুভবও আছে। কারণ মৃত্তিকা দ্বারা রচিত যাবতীয় মৃন্ময় বস্তু সজাতীয় হইলেও যেমন একটি মৃন্ময় বস্তুর সহিত অপর একটি মৃন্ময় বস্তুর সজাতীয় ভেদ আছে, তেমনি বিন্দুক্ষোভজন্য সকল নাদই সজাতীয় হইলেও একটি নাদের সহিত অন্য নাদের পার্থক্য আছে। সামান্যাংশে অভেদ এবং বিশেষাংশে ভেদ ইহাই উভয়ে ইতর বিশেষ।

১৭. ৮. ৪৫

৪৫

বাচিক জপ হইতে উপাংশু জপ শ্রেষ্ঠ এবং উপাংশু জপ হইতে মানস জপ শ্রেষ্ঠ, ইহা শাস্ত্রে সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। বাচিক জপে বাহ্য বায়ুর সম্বন্ধ অধিক কিন্তু উপাংশু জপে এই সম্বন্ধ অনেকটা ছিন্ন হইয়া যায় কিন্তু তবুও কিছু কিছু থাকে। প্রকৃত মানস জপে বাহ্য জপের সম্বন্ধ একপ্রকার থাকে না বলিলেই চলে। বাহ্য বায়ুর প্রভাববশতঃই চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং যে অনুপাতে ঐ প্রভাব কমিয়া আসে সেই অনুপাতে বিক্ষিপ্ততাও হ্রাস পাইতে থাকে। বাচিক জপ অপেক্ষা মানসিক জপে যে একাগ্রতা অধিক আবশ্যক হয় এবং সেইজন্যই যে জপের উৎকর্ষ অধিক তাহা বুঝিতে পারা যায়। বাচিক জপে শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবে চলিতে থাকে, কিন্তু ঠিকভাবে যথাবিধি জপ হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি মন্দীভূত হইয়া যায়। শ্বাসের গতি কমিবার সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা না করিলেও বাচিক জপ উপাংশু জপে পরিণত হইয়া যায়। শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি একান্তভাবে ক্ষীণ হইলে বিনা চেষ্টাতেই উপাংশু জপ মানসিক জপে পরিণত হয়। ঐ সময় বাহ্য বায়ুর ক্রিয়া স্তম্ভিতপ্রায় হয় অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলার ক্রিয়া অনেকটা শান্ত হয়। জপ প্রসঙ্গে যে শক্তি এতক্ষণ ইড়া পিঙ্গলার পথে সঞ্চরণ করিতেছিল, তাহা তখন

সুষুম্নায় প্রবিষ্ট হয়। সুতরাং এতক্ষণ যে শব্দ বাহিরে উচ্চারিত হইতেছিল, সুষুম্নাতে শক্তির অন্তঃপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ মধ্যমায় বায়ুর প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে তাহা ভিতরে ভিতরে উচ্চারিত হইতে থাকে। কিন্তু এই বাহ্য উচ্চারণ এবং আভ্যন্তরীণ উচ্চারণ ঠিক একপ্রকার নহে। বাহ্য উচ্চারণ বাহ্য বায়ুর সাহায্যে সম্পন্ন হয়, এই বায়ু ইড়া-পিঙ্গলার পথে প্রবাহিত। কিন্তু আভ্যন্তরীণ উচ্চারণ ভিতরের বায়ু দ্বারা সিদ্ধ হয়, এই বায়ু সুষুম্না পথে প্রবাহিত হয়। বাহ্য বায়ু স্থূল, ভিতরের বায়ু সূক্ষ্ম। সুষুম্নাতে বায়ুর ঊর্ধ্বগতি না হইলে প্রকৃত মানসিক জপ হয় না। বাহ্য বায়ুকে ইচ্ছাশক্তি দ্বারা চালনা করিয়া ধ্বনিরূপে পরিণত করিতে হয়। কিন্তু সুষুম্নাশ্রিত বায়ু নিয়ত ঊর্ধ্বগমনশীল বলিয়া সেখানে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। সুষুম্না নিরন্তর শব্দময়। ইহার সহিত কুণ্ডলিনীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত বাহ্য জপের অনুষ্ঠানের ফলে যখন সুষুম্নাতে কিঞ্চিৎ প্রবেশলাভ হয় তখন পূর্বোক্ত বাহ্য জপের সংস্কার সুষুম্নাকে রঞ্জিত করে। ইহার ফলে অনবচ্ছিন্ন নাদ সাধকের বাহ্যজপের অনুরূপ ধ্বনিরূপে পরিণত হইয়া শ্রুতিগোচর হয়। এই অবস্থায় মন্ত্রজপ ভিতর হইতে আপনা আপনি হইতে থাকে, চেষ্টা করিতে হয় না। ইহা বস্তুতঃ অজপারই একটি অবস্থা। প্রচলিত মানসিক জপ হইতে এই মানসিক জপ অনেকাংশে পৃথক্—কারণ প্রচলিত জপে সাধকের চেষ্টা থাকে কিন্তু এইপ্রকার মানসিক জপে চেষ্টা থাকে না।

বৈখরী হইতে মধ্যমা, মধ্যমা হইতে পশ্যন্তি, এবং পশ্যন্তী হইতে পরা—ইহাই স্বাভাবিক ক্রম। বাচিক ও উপাংশু জপ উভয়ই বৈখরীতে হইয়া থাকে, কিন্তু মানসিক জপ মধ্যমা ভিন্ন হয় না। বৈখরীতে শব্দ ও অর্থের পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। পশ্যন্তী অবস্থায় শব্দ ও অর্থ এক সত্তায় পরিণত হয়। ইহাই চৈতন্যের স্ফুরণ। আত্মসাক্ষাৎকার, মন্ত্রসিদ্ধি, ইষ্টদর্শন, অপরোক্ষ দর্শন প্রভৃতি পশ্যন্তী অবস্থারই ব্যাপার। পরাবস্থা অব্যক্ত। মধ্যমা অবস্থাতেই শব্দ হইতে জ্যোতির আবির্ভাব আরম্ভ হয়, হৃদয়ের সঞ্চিত অন্ধকার মধ্যমা নাদের সময়ই বিগলিত হইতে থাকে। বৈখরী ও পশ্যন্তীর অন্তরাল অবস্থায় বাহ্য দৃশ্য জগৎ তিরোহিত হইয়া স্বচ্ছ আলোকে আলোকিত ভাবময় একটি অনন্ত জগৎ ফুটিয়া উঠে। এই জগৎ উপসংহৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐ ব্যাপক আলোক-রাশি এবং তদালোকিত অনন্ত দৃশ্যরাশি বিশুদ্ধ জ্যোতিরূপে পরিণত হয়। ইহাই আত্মজ্যোতি। ইহা পশ্যন্তি বাকের অবস্থা। এই জ্যোতিতে ডুবিতে পারিলে এবং ডুবিয়া আত্মহারা না হইলে জ্যোতির মধ্যে আত্মস্বরূপের দর্শন হইয়া থাকে। ইহারও পরাবস্থা আছে। এখানে তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক।

বর্ণাত্মক শব্দ হইতে ধ্বন্যাত্মক শব্দে প্রবেশ করিতে না পারিলে যোগপথ

পাওয়া যায় না। ধ্বন্যাত্মক শব্দই নাদ। বর্ণরূপী শব্দ যতক্ষণ বিগলিত হইয়া বৈচিত্র্য পরিহার করিতে না পারে, ততক্ষণ নাদরূপী শব্দের উপলব্ধি হয় না। নাদ ভিন্ন বিন্দুর উপলব্ধি কি প্রকারে হইবে? রেখা যেমন গতিহীন হইলে বিন্দুরূপ ধারণ করে নাদও তেমনি প্রবাহহীন হইলে বিন্দুরূপে পরিণত হয়। এই বিন্দুই পূর্ববর্ণিত জ্যোতি। আত্মস্বরূপের ইহাই অভিব্যঞ্জক।

শাস্ত্র এবং মহাজনগণের অনুভব হইতে জপের অনেক রহস্য অবগত হওয়া যায় কিন্তু এই সকল রহস্যের বিশ্লেষণ করিয়া বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না, কারণ সাধকের চিত্ত যতক্ষণ কৃত্রিম উপায় হইতে অকৃত্রিম স্বভাবসিদ্ধ উপায়ের অবলম্বন না করিতে পারে ততক্ষণ কার্যক্ষেত্রে বিশেষ লাভের সম্ভাবনা থাকে না। যখন সদ্‌গুরু কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিয়া শিষ্যের অধিকার অনুসারে কোন না কোন প্রকারে তাহাকে দীক্ষা প্রদান করেন তখন ঐ দীক্ষা ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিশুদ্ধকায় অভিব্যক্ত হইতে আরম্ভ হয় তাহাই বাস্তবিক পক্ষে শিষ্যের স্বদেহ। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যেমন বৃক্ষরূপে পরিণত হয় এবং যথাসময়ে তাহাতে যেমন ফলের আবিষ্কার হয়, তদ্রূপ গুরুদত্ত বীজ শিষ্যের স্থূলরূপ ক্ষেত্রে যথাবিধি পতিত হইয়া অঙ্কুরিত হইতে আরম্ভ হইলে শীঘ্র হউক অথবা বিলম্বেই হউক, জ্ঞানরূপ দেহ উৎপন্ন করিবেই করিবে। বীজ যেমন অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং বাহির হইতে কেবলমাত্র পরিকর্মের আবশ্যকতা হয় তদ্রূপ বীজ গুরুশক্তি বা চৈতন্যশক্তির প্রভাবে শিষ্যক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া আপনা আপনি বিকশিত হইতে থাকে। শিষ্যকৃত সাধনা পরিকর্মরূপে প্রতিবন্ধক অপসারণ করিয়া তাহার অভিব্যক্তিতে সাহায্য করে মাত্র। শিষ্যের যাবতীয় ক্রিয়া গুরুদত্ত অথবা গুরুকর্তৃক অভিব্যঞ্জিত চৈতন্যশক্তির সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। সুতরাং মনে রাখিতে হইবে, জপাদি যাবতীয় সাধন ক্রিয়া একমাত্র উদ্বুদ্ধ কুণ্ডলিনী শক্তির দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ইহাই স্বাভাবিক সাধন। কর্তৃত্বাভিমানশীল জীব এই সাধন করিতে সমর্থ হয় না। কারণ দেহাভিমানের অতীত শুদ্ধ চৈতন্যশক্তি বা গুরুশক্তি আপন স্বভাবে উহা নির্বাহ করিয়া থাকে। এই অবস্থার যে জপাদি হয়, তাহা প্রচলিত জপাদি হইতে কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট। বস্তুতঃ ইহা অজপারই খেলা। কারণ ইহার মূলে স্থূলদেহী জীবের কোন চেষ্টা থাকে না। কিন্তু প্রাকৃতিক প্রভাবে যে ভাবে ইহা চলিতে থাকে এবং পর পর যে সব অবস্থার উদ্ভব হয় সাক্ষীরূপে জীব তাহা অনুভব করিতে পারে।

কিন্তু কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইয়া না দিলে সাধনের ঐ স্বাভাবিক মার্গ আরম্ভ হইতে পারে না। গুরু দীক্ষাকালে শিষ্যকে চৈতন্যের আভাস মাত্র দিয়া তাহাকে সাধন প্রণালী উপদেশ দিয়া থাকেন। শিষ্যকে পুরুষকার অথবা চেষ্টা করিয়া সাধন করিতে হয় এবং ঐ আভাসরূপী চৈতন্যের সাহায্যে

কুণ্ডলিনীকে জাগাইতে হয়। দীর্ঘকাল সাধনার ফলে কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হইয়া সাধককে বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এই অবস্থায় জপাদি সকল প্রকার সাধন চেষ্টাপূর্বক করিতে হয় না। শুধু প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা অর্থাৎ পুরুষকারনিরপেক্ষ স্বভাবের দ্বারা তাহা নিষ্পন্ন হয়। সাধন করিতে করিতে চৈতন্যের বিকাশ সিদ্ধ হইলে সাধনের আর প্রয়োজন থাকে না, এবং যাহা আভাসরূপী চৈতন্য ছিল, তাহা বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই জাতীয় সাধক বিভিন্ন প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়া বৈখরীভূমি হইতে পশ্যন্তী ভূমির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

যে সকল সাধক গুরু হইতে শুদ্ধ চৈতন্যশক্তি অর্থাৎ কুণ্ডলিনীর জাগরণ অথবা চৈতন্যের আভাসমাত্র প্রাপ্ত না হন, তাঁহারা চৈতন্যশক্তির সম্বন্ধবিরহিত থাকেন বলিয়া প্রকৃত যোগী বা সাধক কোন শ্রেণীরই অন্তর্গত নহেন। তবে ইহা সত্য যে তীব্র সংবেগ, উৎকট ইচ্ছা, বৈরাগ্য এবং ভগবদ্ ভক্তি থাকিলে, তাঁহারাও চৈতন্যশক্তি বা তাহার আভাসের সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারেন। কারণ বিশ্বগুরু সমগ্র জগতের উদ্ধার কামনায় নিত্য সন্নিহিত রহিয়াছেন। তাদৃশ ব্যাকুলতা থাকিলে আধারের অন্যপ্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও সাক্ষাৎভাবে না হইলেও পরম্পরাতে গুরুকৃপা অবশ্যম্ভাবী। তবে যতক্ষণ চৈতন্যের সংস্পর্শ না ঘটে ততক্ষণ ইহাদের যথার্থ সুফল লাভের ততটা আশা থাকে না।

জপের কৌশল সম্বন্ধে যদি কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তবে সময়ান্তরে আলোচনা করা যাইবে।

২৫. ১০. ৪৫

৪৬

তুমি সবিকল্প হইতে নির্বিকল্প অবস্থায় উপনীত হওয়ার কথা লিখিয়াছ এবং ঐ পথের প্রধান অন্তরায় কি জানিতে চাহিয়াছ। এই সম্বন্ধে তোমার সাধন জীবনের পূর্ণ ইতিহাস না জানিলে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা নিষ্ফল। নির্বিকল্প অবস্থায় যাওয়ার বহু পথ আছে, কিন্তু সবিকল্পক অবস্থার শিখরদেশে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ঐ সকল পথের কোনটিই দৃষ্টিগোচর হয় না। চিৎপথের উন্মেষ এবং ইহার ক্রমবিকাশ—ইহাই বিকল্প পরিহারের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। বস্তুতঃ শুদ্ধ বিকল্পকে আশ্রয় করিয়াই অশুদ্ধ বিকল্প হইতে রক্ষা পাইতে হয়। শুদ্ধ বিকল্পের অন্তর্লীন অবস্থাই নির্বিকল্প পরমপদ। নির্বিকল্পের কোন সাধনা নাই। সবিকল্পভূমির শেষপ্রান্তে উপনীত হইলে ক্রমে ক্রমে বিকল্প ক্ষীণ হইতে থাকে। তখন নির্বিকল্প আত্মস্বরূপের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে বিলম্ব হয় না। পূর্ণিমা পর্যন্ত না পৌঁছিয়া চন্দ্রের কলাক্ষয়ের প্রত্যাশা করা যেমন নীতিবিরুদ্ধ তেমনি বিকল্পভূমির পূর্ণ বিকাশ সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত বিকল্পের উপশমের আশা করা অসঙ্গত। স্বভাবনির্দিষ্ট পথই প্রকৃত পথ। স্বভাবের বিরুদ্ধে কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা লক্ষ্যপ্রাপ্তি দুর্ঘট। বিকল্পের পুষ্টিও স্বভাব হইতে হয় এবং পুষ্টির পূর্ণতা হইয়া গেলে বিকল্পের উপশম স্বভাব হইতেই হয়। কৃত্রিম সাধনার দ্বারা কিছুই করিবার আবশ্যক হয় না। একাগ্রতার পূর্ণবিকাশে জ্ঞানাগ্নির আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী। যতক্ষণ তাহা না হইতেছে ততক্ষণ নির্বিকল্পক মহাশক্তিময় অবস্থাপ্রাপ্তির দ্বার কোথায়? বস্তুতঃ নির্বিকল্পক অবস্থার কোনই অন্তরায় নাই। জ্ঞানের পূর্ণতালাভের যে অন্তরায় তাহাই নির্বিকল্পক অবস্থালাভের অন্তরায় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

জ্ঞানের পূর্ণতালাভের পথে ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। সবগুলি পরপর অতিক্রম করিতে হয়। তেমন অধিকারবল থাকিলে দ্রুতগতিতে এই কার্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু যেভাবেই হউক স্তরগুলি অতিক্রান্ত না হইলে বিশুদ্ধ জ্ঞান আত্মপ্রকাশ করে না। কোন স্তরকে চাপা দিয়া অগ্রসর হইতে হইলে ঐ স্তরই তাহাকে আকর্ষণ করিয়া তাহার গতির পথ অবরোধ করে। মোটকথা, স্বভাবের পথ অবলম্বন করাই শ্রেষ্ঠ। তাহাতে অতৃপ্তির তাড়না থাকে না এবং গতিও অবরুদ্ধ হয় না। কলায় কলায় চিৎশক্তির বিকাশ করিতে হয়। দুগ্ধমন্থন করিলে যেমন নবনীত বাহির হয় ঠিক সেইপ্রকার এই পিণ্ডকে মন্থন করিয়া তাহা হইতে তাহার সার জ্যোতি নিষ্কর্ষণ করিতে হয়। ঐ জ্যোতিই গন্তব্য পথের সহায়। উহাই সকল অন্তরায়কে নাশ করে এবং সাধককে চরম লক্ষ্যের সম্মুখীন করে।

বিন্দুতে নিহত শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিন্দুটি রেখারূপে পরিণত হয়। রেখাই শক্তির অভিব্যক্ত রূপ। বিন্দুনিষ্ঠ দুইটি পৃথক শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দুইটি পৃথক ধারারূপে দুইটি পৃথক্ রেখার আবির্ভাব হয়। এই দুইটি রেখার মূলগত শক্তিদ্বয়ের পরস্পর ব্যবধান বা ভেদ-নিবন্ধন রেখা দুইটির পরস্পর ব্যবধান নিয়মিত হয়। ইহাই কোণের আবির্ভাব। এইপ্রকার তিনটি বিন্দু হইতেই তিনটি কোণ আবির্ভূত হয়। তিনটি বিন্দু কি তাহা পরে বলিতেছি। তিনটি কোণের আবির্ভাব হইলেই বুঝিতে হইবে ছয়টি রেখা নির্গত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই ছয়টি রেখা ছয়টি নহে। ইহারা তিনটি রেখাতে পরিণত হয়। মধ্যবিন্দুর দিকে লক্ষ্য নিবিষ্ট থাকাতে একটি বিন্দুর একটি রেখা উভয়পার্শ্বের একদিককার অন্যবিন্দু-নির্গত রেখার সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে। এইপ্রকার দুইদিকেই বুঝিতে হইবে। নির্গম ব্যাপারটি যুগপৎ হয় বলিয়া ত্রিকোণটি একই সময় উদ্ভূত হইতে সমর্থ হয়। ত্রিকোণটি অভিব্যক্ত হইলে মধ্যবিন্দুটি আপনি ফুটিয়া উঠে। ত্রিকোণটি গৌরীপট্ট মধ্যবিন্দুটি শিবলিঙ্গ।

ত্রিকোণের তিনটি বিন্দু কি কি? ইহা বুঝিবার পূর্বে সৃষ্টির মূলটি লক্ষ্য করিতে হইবে। ব্রহ্মবিন্দু এক, যখন তাহা স্বীয় স্বাতন্ত্র্যবশতঃ নিজেকে নিজে উন্মীলিত করে তখন একাংশে শিবরূপে এবং অপরাংশে শক্তিরূপে প্রকটিত হয়। ব্রহ্মাবস্থায় শিব ও শক্তিতে সাম্যাবস্থা ছিল, তাই তখন শিব ও শক্তি কাহারও পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সৃষ্টির উন্মেষের আদ্যাবস্থায় বৈষম্যভাবের সূচনা হয়। তখন শিবভাব ও শক্তিভাবে কিঞ্চিৎ ব্যবধান আসে। যদিও শিবভাবে শক্তিভাব নিহিত থাকে, শক্তিভাবেও শিবভাব নিহিত থাকে। ইহার পর শিব প্রতিবিম্বরূপে শক্তিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিন্দুরূপে বহির্গত হন। তদ্রূপ শক্তিও শিবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাদরূপে বহির্গত হন। বিন্দুটী মূল পুরুষভাব এবং নাদটী মূল প্রকৃতিভাব। বিন্দু ও নাদে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। বিন্দুবিরহিত নাদ এবং নাদবিরহিত বিন্দু থাকিতে পারে না। এটীকে একপ্রকার যুগল অবস্থার আদিভূমি বলা যাইতে পারে। উহাই অর্দ্ধনারীশ্বর ভাব। বস্তুতঃ ইহা দুইটী বিন্দু নহে—একই বিন্দুতে উভয় ভাবের সমাবেশ। ইহার নামান্তর কাম। ইহা সূর্যমণ্ডলরূপে পরিচিত। পক্ষান্তরে, বিন্দু শ্বেত ও রক্তভেদে দ্বিবিধ। শ্বেতবিন্দু পুরুষের শুক্র এবং রক্তবিন্দু প্রকৃতির শোণিত। এই উভয় বিন্দু মিথুনাবস্থাতে সংঘর্ষ প্রাপ্ত

হইলে মধ্য হইতে কলারূপে শক্তির নির্গম হয়। ইহাকে চিৎকলা বলে। ইহার নামান্তর হার্দ্ধকলা—অর্দ্ধকলা। পূর্ববর্ণিত কাম এবং এই শুক্র এবং রক্ত বিন্দুদ্বয় এবং তদুদ্ভূত কলা মিলিত হইয়া কামকলার আবির্ভাব হয়। কামনামক বিন্দুকে সূর্যমণ্ডল পূর্বেই বলা হইয়াছে। শ্বেতবিন্দুটি চন্দ্রমণ্ডল—রক্তবিন্দুটি অগ্নিমণ্ডল। কামকলা শব্দে মূলে কামিনীতত্ত্ব বুঝিতে হইবে। ইহাই সৃষ্টির আদি। ইহা ব্যতিরেকে সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হইতে পারে না। ইহাকে দেহরূপে কল্পনা করিলে কাম বা সূর্যমণ্ডল ইহার মস্তক, শুক্র ও রক্তবিন্দুরূপ চন্দ্র ও অগ্নিমণ্ডল ইহার স্তনদ্বয়শোভিত বক্ষঃস্থল এবং কলা বা অর্দ্ধকলা ইহার যোনিদ্বার বা গুপ্তেন্দ্রিয় এইভাবে বুঝিতে হইবে। এই যে কামকলা দেবী ইঁহা হইতেই যাবতীয় শব্দ এবং যাবতীয় অর্থ আবির্ভূত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইঁনিই পরাবাক্, এমন কি পরাবাকেরও আদ্যাবস্থা। ইঁনি কে? বর্ণমালার প্রথম অক্ষর অ এবং অন্তিম অক্ষর হ। এই উভয়ের সমাহারে সমগ্র বর্ণমালাই সমাহৃত বুঝিতে হইবে। সুতরাং যাবতীয় শব্দরাশি ইহার অন্তর্গত কারণ সকল শব্দই বর্ণঘটিত। বিন্দুরূপে গণ্ডীবদ্ধ হইয়া এই অনন্ত শব্দরাশিই অহংরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহাই কামকলার স্বরূপ। কামকলাই অহংরূপ। কামকলার ক্রিয়া ভিন্ন অহংভাব বা ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হইতে পারে না। এই অহংভাবের পূর্ণতাই পূর্ণাহন্তা—যাহা পরমেশ্বরের অনাদিসিদ্ধ ঐশ্বর্যরূপ।

৪৮

"ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"

এই শ্লোকটিতে পূর্ণবস্তুর স্বরূপ নির্দেশের চেষ্টা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ পূর্ণের স্বরূপ জাগতিক জ্ঞানের পক্ষে ধারণার অগোচর। নানাপ্রকার ইঙ্গিতের দ্বারা তাহার একটা আভাস দিবার চেষ্টা করিলেও মানবীয় বুদ্ধি তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না।

পূর্ণবস্তু চিরপূর্ণ, তাহাতে কখনই অপূর্ণতা আসে না। হ্রাস বৃদ্ধি, উপচয় অপচয়, আগম অপায়—কিছুই উহাকে স্পর্শ করে না। এই পূর্ণই নিত্য স্থিতিরূপে স্বয়ংপ্রকাশ সত্তারূপে সর্বদা ও সর্বত্র অখণ্ডরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। সৃষ্টি ও প্রলয় ইহাকে আশ্রয় করিয়া শক্তির খেলারূপে প্রকাশিত

হইতেছে। কিন্তু পূর্ণবস্তু শক্তির ক্রীড়াতে শক্তিমানের ন্যায় প্রতিভাত হইয়াও নিত্যই লীলাতীত স্বরূপে অবস্থিত থাকে। 'অদঃ ও ইদং' এই দুইটি পদের দ্বারা বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট উভয় প্রকার সত্তাই গ্রহণ করা হইতেছে। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গোচর তাহাই ইদং পদার্থ এবং যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় তাহাই অদঃ পদার্থ। সাধারণরূপে ইন্দ্রিয়ের শক্তির ক্রমবিকাশের প্রভাবে যাহা এক সময় অতীন্দ্রিয় সত্তারূপে বর্তমান থাকে তাহাও ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়। ইহা ক্রিয়ার ফল। তদ্রূপ বিপরীত ক্রিয়ার দ্বারা যাহা একসময়ে ইন্দ্রিয়গোচর ছিল তাহাও ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সত্তারূপে স্থিতিলাভ করে। বস্তুতঃ কোন্‌টি ইন্দ্রিয়গোচর এবং কোন্‌টি ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাহা নির্দেশ সম্ভবপর হয় না। শক্তির আকুঞ্চন ও প্রসারণের ফলে ইন্দ্রিয়গোচর সত্তার অতীন্দ্রিয় রূপে আত্মপ্রকাশ এবং অতীন্দ্রিয় সত্তার ইন্দ্রিয়গোচররূপে স্ফুরণ নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু পারমার্থিক স্বরূপের দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যাইবে শক্তির আকুঞ্চন ও প্রসারণের অন্তরালে স্বরূপ একই থাকে। এই স্বরূপটি পূর্ণবস্তু। ইহা নির্বিকার।

যাহা ইন্দ্রিয়ের গোচর তাহাই লোক—কারণ তাহাই আলোকিত হয়। এবং যাহা ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাহাই আলোক কারণ তাহা আলোকিত হয় না। সমগ্র বিশ্ব এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে লোকালোক এই উভয় ভাবে বিভক্ত। যাহাকে প্রচলিত ভাষায় ইহলোক ও পরলোক বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহা বাস্তবিক পক্ষে এই লোকালোকের অন্তর্গত লোকেরই দুইটি দিক্। যে দিক্‌টা যে সময় এবং যাহার নিকট ইন্দ্রিয়ের গোচর ভাবে বর্তমান থাকে সেই দিক্‌টা তাহার নিকট সেই সময় "ইহলোক" বলিয়া প্রতীত হয় এবং তাহার বিপরীত দিক্‌টাকে সে তখন "পরলোক" বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। এক অখণ্ড পূর্ণ সত্তাই দেশকাল ও অনন্ত প্রকারের আধারের দ্বারা অপরিচ্ছিন্নরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে—উহাই পূর্ণতত্ত্ব। উহা এক হইয়াও অনন্ত, কারণ যদিও কোন বিশিষ্ট দেশের সহিত উহার সম্বন্ধ নাই তথাপি অনন্ত দেশের প্রতি দেশেই পৃথক পৃথক্ রূপে প্রতিভাসমাস অথচ পৃথক পৃথক প্রতিভাসমান হইয়া তাহা খণ্ডিত হয় না। তাহা যেমন তেমনিই থাকে। পূর্ণের বিজ্ঞান এই ভাবেই আয়ত্ত করিতে হয়। তখন দেখিতে পাওয়া যায় সেই পূর্ণ সত্তা সর্বত্রই সমরূপে বিরাজমান। ইহলোকেও তাহা যেমন পরলোকেও তাহা ঠিক তেমনি। ইন্দ্রিয় দ্বারাও তাহাকে উপলব্ধি করা যায় এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত ভূমিতেও তাহাকে উপলব্ধি করা যায়। তাহা এক এবং অবিভক্ত সত্তা। ইন্দ্রিয়ের গোচর অংশকে লক্ষ্য করিয়া দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন সবই তাহাই, অর্থাৎ সবই পূর্ণ। অর্থাৎ চক্ষু যাহা গ্রহণ করে তাহা পূর্ণ, কর্ণ যাহা

গ্রহণ করে তাহাও পূর্ণ, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের প্রত্যেকটি যাহা গ্রহণ করে সবই পূর্ণ। প্রকারান্তরে বলা যায়। রূপও পূর্ণ, রসও পূর্ণ, শব্দও পূর্ণ। একই পূর্ণ, সত্তা প্রতি ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রতিভাসমান হইতেছে। এইপ্রকার পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়ের অংশকে লক্ষ্য করিয়া দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন পূর্ণ সত্তা ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ তাহা চক্ষুর অবিষয়, কর্ণের অবিষয় এবং অন্যান্য সকল ইন্দ্রিয়েরই অবিষয় অর্থাৎ অরূপ, অশব্দ, অস্পর্শ ইত্যাদি। এইজন্য নেতি নেতি ব্যতীত অন্য কোনপ্রকারে উহার নির্দেশের চেষ্টা করা সম্ভবপর নহে।

'পূর্ণমিদং বলিতে ইহাই বুঝায় যে পূর্ণই ইদংরূপে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গোচর-রূপে বিদ্যমান। তদ্রূপ 'পূর্ণমদঃ' এই বাক্যাংশের তাৎপর্য, এই পূর্ণই ইন্দ্রিয়ের অগোচর অর্থাৎ একই পূর্ণ ইন্দ্রিয়ের গোচরও বটে আবার ইন্দ্রিয়ের অগোচরও বটে—উভয়ই যুগপৎ সত্য। উহা একই সময়ে সাকার ও নিরাকার, সগুণ ও নির্গুণ, নিকটে ও দূরে, বিশ্বরূপে ও বিশ্বাতীত-রূপে বিদ্যমান। পূর্ণ অদ্বয় অনন্ত অখণ্ড উহা একই, দুই নহে। এই পূর্ণ হইতে যাহা নিঃসৃত হয় তাহাও পূর্ণই। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পূর্ণ এক ভিন্ন দুই হয় না। সুতরাং বুঝিতে হইবে যাহা হইতে নিঃসরণ হয় এবং যাহার নিঃসরণ, একই সত্তা এবং সমরূপেই পূর্ণ। গণিত-শাস্ত্রে যেমন অনন্ত হইতে কোন পরিমিত বা অপরিমিত সংখ্যার বিয়োগ করিলে বিয়োগের পর অনন্তই অবশিষ্ট থাকে ইহাও ঠিক তেমনি। পূর্ণ হইতে ধারা নির্গত হয় এবং যাহা নির্গত হয় তাহা পূর্ণই, তথাপি পূর্ণের হ্রাস হয় না কারণ পূর্ণ নির্বিকার। প্রশ্ন হইতে পারে, ইহা কিরূপে সম্ভবপর ? ইহার উত্তর এই—ইহাই একের অনন্ত হওয়ার লীলা। যেমন একই চন্দ্র সহস্র দর্পণে সহস্র চন্দ্ররূপে প্রতিবিম্বিত হয় অথচ চন্দ্রের মৌলিক একত্ব অখণ্ডই থাকিয়া যায়—ইহাও সেইরূপ। চন্দ্র সহস্র হইয়াও একই থাকে। সহস্র হওয়া একটা খেলা মাত্র। সহস্র চন্দ্রের প্রত্যেকটি চন্দ্রও সেই একই চন্দ্র। কারণ সহস্র এক ব্যতীত অপর কিছু নয়। একই সহস্র গুণিত হইয়া সহস্ররূপে প্রকাশিত হয়। গুণের মধ্যে একের আবির্ভাব হইলে অনন্ত এক ফুটিয়া উঠে। ইহাই সৃষ্টিলীলা। মূলে একও যেমন এক গুণস্থ একও তেমনি এক—পার্থক্য কিছু নাই। তবে ইহা জ্ঞানীর নিকট, অজ্ঞানী ইহা বুঝিতে পারে না। ঠিক সেইপ্রকার পূর্ণমধ্যে, অপূর্ণতা দূরের কথা, পূর্ণ আসিয়া মিলিত হইলেও পূর্ণের স্বরূপগত বৃদ্ধি হয় না। অনন্তের সঙ্গে কোন পরিমিত সংখ্যা যোগ করিলে এমন কি অনন্ত যোগ করিলেও যোগফল অনন্তই হয়, ইহাও তদ্রূপ। বাহিরেও পূর্ণ ভিতরেও পূর্ণ। বাহির হইতে পূর্ণকে ভিতরে লইয়া গেলে ভিতরের পূর্ণের বৃদ্ধি হয় না অথচ বাহিরের পূর্ণেরও হ্রাস হয় না, তদ্রূপ ভিতর হইতে পূর্ণকে বাহিরে লইয়া আসিলে

ভিতরের পূর্ণের হ্রাস হয় না এবং বাহিরের পূর্ণেরও বৃদ্ধি হয় না। অন্তর পূর্ণ যেমন ছিল তেমনি থাকে, বহিঃপূর্ণও যেমন ছিল তেমনি থাকে। ইহার রহস্য এই—পূর্ণ দুইটি নহে, একই পূর্ণ উভয়ত্র বিরাজমান রহিয়াছে।

এইভাবে দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যাইবে পূর্ণবস্তু সর্বদেশের অতীত হইলেও প্রতি দেশেই নির্লিপ্তভাবে বিদ্যমান। তদ্রূপ উহা অতীত অনাগত ও বর্তমান ত্রিবিধ কালের অতীত হইলেও প্রতিকালেই সমরূপে বর্তমান। কালে পূর্ণের বিকাশ নাই। যাহা অনাগত অবস্থায় অপূর্ণ থাকিয়া ক্রমশঃ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া বর্তমান ভেদপূর্বক অতীতের দিকে ধারারূপে প্রবাহিত হয়—তাহা পূর্ণ নহে। বস্তুতঃ পূর্ণের ক্রমবিকাশ নাই—It is beyond Evolution, এইপ্রকার যাবতীয় আধার বা উপাধি—কোনটিই পূর্ণকে স্পর্শ করিতে পারে না। অথচ প্রতি আধারের সহিত অভিন্নভাবে ওতপ্রোত হইয়া পূর্ণ নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন। এই পূর্ণই আত্মা বা ব্রহ্ম।

১৯ ৩. ৪৫

৪১

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ১৮।৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ১৮।৫৫

এই শ্লোক দুইটিতে ব্রহ্মাবস্থা হইতে পরমপদ পর্যন্ত সমগ্র ক্রমটি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত না হইলে ব্রহ্মাবস্থাতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। ভেদজ্ঞান মায়ার কার্য। সুতরাং বুঝিতে হইবে মায়া অতিক্রম না করা পর্যন্ত পরমপদের মার্গে পদার্পণ করা যায় না। শোক, আকাঙ্ক্ষা এবং বৈষম্য দর্শন, এই সকল মায়ার কার্য। যতক্ষণ মায়া বিদ্যমান রহিয়াছে ততক্ষণ জীব যতই আনন্দের অধিকারী হউক্ না কেন, কোন না কোন প্রকারে দুঃখ হইতে একেবারে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না। কারণ প্রকৃতির তিনটি গুণ পরস্পরের সহিত নিত্য সম্বন্ধ বলিয়া যেখানে সত্ত্বগুণের কার্য আনন্দ আছে, সেখানে অল্পমাত্রায় হইলেও রজোগুণের কার্য দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। ত্রিগুণের অতীত না হওয়া পর্যন্ত শোক অথবা দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার কোন আশা নাই। ঠিক এইপ্রকারে প্রাকৃতিক বস্তুর

অভাববোধ অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা প্রাকৃতিক রাজ্যেই হইয়া থাকে। অপ্রাকৃত বস্তুর আকাঙ্ক্ষা প্রাকৃতিক রাজ্য হইতে উৎপন্নই হয় না। সুতরাং যতক্ষণ মায়া ভেদ করিয়া ত্রিগুণাতীত ব্রহ্মভাবের উপলব্ধি না হইয়াছে ততক্ষণ প্রাকৃতিক অভাব বিদ্যমান থাকিবেই। এই অভাব বোধই আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ব্রহ্মপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আপ্তকাম অবস্থা প্রাপ্ত হইলে হৃদয়ের সকল প্রকার আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের জন্য মিটিয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হইতে সৃষ্টির উদ্ভব হয় বলিয়া সৃষ্টির অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুতে বৈষম্য প্রতীত হয়। শুধু বস্তুতে নহে যে বস্তুর দ্রষ্টা তাতেও বৈষম্য লক্ষিত হয়। সুতরাং সর্ব্বভূতে সাম্য দর্শন, মায়া নিবৃত্তি এবং ব্রহ্মভাবের অভিব্যক্তি হইতেই পারে না। সাম্যদর্শন হওয়ার ফলে সাম্য স্বরূপে স্থিতি দৃঢ় হয়।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে মায়া ভেদ করার পর সাধকের যে অবস্থা উদিত হয় তাহা ব্রহ্মভাব। এই অবস্থায় শোক দুঃখ থাকে না, জাগতিক অভাববোধ থাকে না বলিয়া আশা আকাঙ্ক্ষা থাকে না কারণ ইহা আপ্তকাম অবস্থা। সাম্যজ্ঞানের প্রভাবে সর্ব্বভূতে বৈষম্য বোধ নিবৃত্ত হইয়া সাম্যরূপে স্থিতি লাভ হয়। এই অবস্থায় সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে। যে দিকে লক্ষ্য পতিত হয় সেদিকেই এক অখণ্ড নারায়ণ সত্তাই দেখিতে পাওয়া যায়। 'সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু' বলিয়া এই স্থিতিই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ইহা সিদ্ধাবস্থা হইলেও প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা নহে। দুঃখ, আকাঙ্খা এবং ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায় বলিয়া কেহ কেহ এই ব্রহ্মাবস্থাকে সিদ্ধাবস্থা বলিয়া বর্ণনা করেন। কিন্তু ভগবান্ বলিতেছেন যে ইহা প্রকৃত সিদ্ধাবস্থা নহে, তবে ইহা অতি উচ্চাবস্থা। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে পরাভক্তির উদয় হয়। যতক্ষণ জীব মায়ারাজ্যে অবস্থান করে ততক্ষণ সে পরাভক্তির আস্বাদ লাভ করিতে পারে না। কারণ জাগতিক সুখ-দুঃখে বিচলিত হইলে, জাগতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার অধীন থাকিলে এবং পরস্পরের পৃথক্ জ্ঞান তিরোহিত না হইলে ভগবানের প্রতি যথার্থ ভক্তির উদয়ই হয় না। সুতরাং পূর্ব্ববর্ণিত ব্রহ্মাবস্থা হইতেই পরাভক্তির সূচনা। যতক্ষণ সর্ব্বত্র আত্মভাবের উদয় না হয় যতক্ষণ অন্তর ও বাহিরে প্রতিবস্তুতে ব্রহ্মদর্শন না হয় ততক্ষণ পরাভক্তির সম্ভাবনা কোথায়? আমরা সাধারণতঃ যাহাকে ভক্তি বলি তাহা অপরা ভক্তি। তাহা নিম্নস্তরের ভক্তি, তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবান্কে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবৃত্ত হয় না কারণ ভগবানের স্বরূপ দর্শন না পাইলে তাঁহার প্রতি ভক্তির উদয় কি প্রকারে হইতে পারে? ভগবানের স্বরূপ দর্শন পাইতে হইলে দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা এবং বৈষম্যবর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় অর্থাৎ মায়া অতিক্রম করিতে হয়।

পরাভক্তি উদিত হইয়া স্বভাবতঃই স্বকার্য সাধন করিয়া থাকে। এই

স্বকার্যটী কি? ইহা ভগবানের সহিত সর্ব্বতোভাবে পরিচিত হওয়া অর্থাৎ ভগবানকে পূর্ণভাবে চিনিতে পারা। যে জ্ঞানের প্রভাবে মায়া নিবৃত্ত হইয়াছে এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে সেই জ্ঞানের দ্বারা ভগবান্‌কে চিনিতে পারা যায় না। তাহা ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে কিন্তু ভগবদ্‌ বিষয়ক অভিজ্ঞান নহে। কারণ ভগবান্‌ বলিয়াছেন 'ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্‌' অর্থাৎ আমি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা। অতএব ব্রহ্মকে জানিলেই তাঁহার প্রতিষ্ঠারূপী আমাকে অর্থাৎ ভগবান্‌কে জানা হয় না। এইজন্য ব্রহ্মজ্ঞান এবং পূর্ণ ভগবৎ পরিচয় এই উভয়ের অন্তরালে পরাভক্তির আবশ্যকতা রহিয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন যেমন পরাভক্তি জন্মে না ঠিক সেই প্রকার পরাভক্তি ব্যতিরেকে ভগবানেরও পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে ভগবানের তাত্ত্বিক স্বরূপ এবং তাঁহার অখণ্ড বিভূতি সবই জানিতে হয় যাবান্‌ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ অর্থাৎ ভগবান্‌ স্বরূপতঃ ও তত্ত্বতঃ যাহা তাহা জানিতে হয় এবং তিনি শক্তিরূপে যাহা তাহাও জানিতে হয়। ভগবান্‌ যে কতবড় তাহা না জানিলে ভগবান্‌কে জানা হয় না আবার তাহা জানিলেও ভগবান্‌কে জানা হয় না যদি তাঁহার স্বরূপের সন্ধান না পাওয়া যায়। অতএব পরাভক্তির দ্বারা নিগূঢ় ভগবৎস্বরূপ এবং তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি দুইই অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়। বলা বাহুল্য, ইহা সবিশেষ জ্ঞান। পূর্বে যে ব্রহ্মভূত অবস্থার কথা বলা হইয়াছে—যাহা মায়াতীত সুখদুঃখের অতীত তৃষ্ণাশূন্য এবং ভেদবর্জিত, তাহা নির্বিশেষ ব্রহ্মের কথা। এই অবস্থায় সবিশেষ জ্ঞান হওয়ার সম্ভাবনা থাকার কারণ নির্বিশেষ জ্ঞানের দ্বারাই মায়া নিবৃত্ত হইয়া যায়। মায়ানিবৃত্তির পর অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মে স্থিত হইয়া ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠারূপী ভগবান্‌কে জানিতে হইলে পরাভক্তির প্রয়োজন হয়। পরাভক্তির প্রভাবে ভগবানের অচিন্ত্য স্বরূপ ও শক্তি পরমভক্তের গোচর হইয়া থাকে ইহাই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান। ইহার পর পরমপদে প্রবেশ আপনিই হইয়া থাকে—যাহা বর্ণনার অতীত (বিশতে তদনন্তরম্‌)।

৮.৪.৪৮

৫০

আপনি যে স্থানে গিয়াছেন সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য শান্ত এবং মনোরম। আশাকরি, প্রকৃতির এই রমানিকেতনে কিছুদিন বিশ্রামসুখ ভোগ করিয়া যথাবিধি কর্মের পথ অনুসরণ করিয়া চলিলে একটা চির শান্তি ও নিত্য আনন্দের সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। বাহ্যপ্রকৃতি শান্তিময় এবং সুষমাময় হইলেও বাস্তবিকপক্ষে কোন ফল হয় না যদি অন্তঃপ্রকৃতি তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারে। এইজনাই শুধু বাহিরের দিকে লক্ষ্য না করিয়া যোগী ও সাধক উভয়কেই নিরন্তর ভিতরের দিকেই লক্ষ্য রাখিতে হয়। গুরুদত্ত সুকৌশলে আন্তর রাজ্য উন্মিলিত হইলে এবং ঐ রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে নিজের স্থিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে সকল অভাবই মিটিয়া যায়। তখন বাহিরের কোন সত্তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে প্রতীক্ষা করিয়া তাকাইয়া থাকিতে হয় না। নিজের যাহা আবশ্যক তাহা নিজের মধ্য হইতেই ফুটিয়া উঠে। বাহ্যপ্রকৃতি ভ্রূকুটীপূর্ণ কটাক্ষপাত করিলেও চিত্ত বিচলিত হয় না, কারণ শান্তি ও সৌন্দর্যময়ী অন্তঃপ্রকৃতির সৎসঙ্গে যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে তাহার শান্তিভঙ্গ কেহই করিতে পারে না।

আশাকরি. আপনি নাদানুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানযোগের শুদ্ধ বিচার, ভক্তিযোগের নির্মল প্রাণ এবং প্রপত্তিযোগের নির্ভর ও শরণাগতি অবলম্বন করিয়া কর্মযোগীর কঠিন মার্গে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতে অভ্যাস করিবেন। যাহাই করুন. মাকে লক্ষ্য পথেও রাখিবেন, পথের সাথীরূপেও রাখিবেন এবং অন্তরের পথনির্দেশকরূপেও রাখিবেন। একলক্ষ্য হইয়া নির্বিচারে প্রেমভক্তির সহিত তাঁহার দিকে দৃষ্টি দিতে পারিলে দেখিতে পাইবেন আপনি যন্ত্রমাত্র, তিনি যন্ত্রী হইয়া আপনাকে চালাইয়া লইয়া যাইবেন। তিনি নৌকা, তিনিই কর্ণধার, আবার লক্ষ্যও তিনি। যতটা সম্ভবপর নিজের ইচ্ছা তাঁহার মহা ইচ্ছায় বিসর্জন করিতে অভ্যাস করিবেন। তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন সেই অলক্ষ্য ইচ্ছাই আপনার স্ব ইচ্ছারূপে আপনাকে চালিত করিতেছে। ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? ইহা একাধারে কর্ম ও জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ সব কিছু। ইহা একাধারে সাধনা সিদ্ধি উভয়ই. ইহাই কর্ম। ইহাই বিশ্রাম এবং ইহাই লীলা। এই অবস্থায় কালের শৃঙ্খল ভগ্ন হইয়া এক অনাদি অনন্ত স্বয়ংপ্রকাশ নিত্য স্বতন্ত্র বর্তমানরূপে পরিণত হয়। ইহাই মহাক্ষণ। আপনি এই মহাক্ষণে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শান্তিলাভ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

১৪. ৪. ৩৫

৫১

"যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।"

এই স্থলে সর্বত্র আত্মদর্শন এবং তদনন্তর আত্মাতে সর্ব দর্শনের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই উভয় দর্শনের মধ্যে সর্বত্র আত্মদর্শনই প্রথম হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে একটী রহস্য রহিয়াছে। সর্বত্র অর্থাৎ সর্বভূতে যে আত্মদর্শন হয়=এই স্থলেও দ্বিবিধ দর্শন আছে কারণ অনুযোগী সর্বভূতের দর্শন না হইলে উহাতে আত্মদর্শনের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং সর্বত্র আত্মদর্শন বলিতে ইহাই বুঝায় যে সর্বভূতের দর্শনও অবশ্যই হইয়া থাকে। উহার সঙ্গে প্রতি ভূতেই অভিন্নরূপে আত্মদর্শন হইয়া থাকে। এইস্থানে সর্বদর্শনটীই ভেদদর্শন এবং আত্মদর্শনটী অভেদদর্শন। ঘটে আত্মদর্শন হইতেছে বৃক্ষে আত্মদর্শন হইতেছে, মনুষ্যে আত্মদর্শন হইতেছে ইত্যাদি এই সব স্থলে ঘট বৃক্ষ মনুষ্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ এইগুলির দর্শন বাহ্যেন্দ্রিয়-রূপী চক্ষুর দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু আত্মদর্শন অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা সিদ্ধ হয়। বহিদৃষ্টি অন্তদৃষ্টি দুইটিই উন্মুক্ত থাকিলে সর্বভূতে আত্মদর্শন হইয়া থাকে। এই স্থলে উভয় দৃষ্টিব মাত্রার তারতম্য আছে বুঝিতে হইবে। বহিদৃষ্টি কিঞ্চিৎ অন্তর্মুখ না হইলে অন্তদৃষ্টির উন্মেষ হয় না। যে মাত্রায় বহিদৃষ্টি অন্তর্মুখ হয় ঠিক সেই পরিমাণ অন্তদৃষ্টি জাগ্রত হয়। যদি চার আনা বহিদৃষ্টির নিরোধ স্বীকার করা যায় এবং ঐ সময় আত্মদর্শনের তত্ত্ব লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলে উহা চার আনারই হইবে। এইভাবে পূর্ণ আত্মদর্শন তখনই হইবে যখন বহিদৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে নিরুদ্ধ হইবে—উহাই শুদ্ধ চৈতন্য-রূপী আত্মার দর্শন। ঐ অবস্থায় শুধু আত্মদর্শনই থাকে, বাহ্য পদার্থের দর্শন থাকে না। ইহাই বিশুদ্ধ চৈতন্য। এই অবস্থায় ব্যুত্থান হয় না, জগদ্দর্শন ও হয় না। এমন কি বাধিত অনুবৃত্তিরূপেও হয় না। বাধিত অনুবৃত্তিরূপে দর্শন তখনই হয় যখন বাহ্য দর্শন সংস্কার সম্পূর্ণ ক্ষীণ না হয়। ভোগের দ্বারাই হউক অথবা জ্ঞানের প্রবলতার দ্বারাই হউক যখন বাহ্য দর্শন্ সম্ভাবনা সদাকালের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায় তখন একমাত্র শুদ্ধ আত্ম-দর্শনই থাকে। ইহাই নির্বিকল্প জ্ঞান। ইহার পর যখন এই জ্ঞানেরও নিরোধ হইয়া যায় তখন শুদ্ধ আত্মস্বরূপে স্থিতি হয়—শুদ্ধ আত্মদর্শনও থাকে না।

উপর্যুক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায় সর্বত্র আত্মদর্শন হইতে ক্রমশঃ

শুদ্ধ আত্মদর্শন উদিত হয় এবং চরম অবস্থায় তাহাও থাকে না। এখন প্রশ্ন এই: আত্মাতে সর্বভূত দর্শন কখন হইবে? সর্বভূতে আত্মদর্শনের পক্ষে যেমন ইহা আবশ্যক ছিল যে প্রথমে সর্বভূতের দর্শন হইয়া তদনন্তর তাহাতে আত্মদর্শনের উদয় হইবে, তদ্রূপ আত্মাতে সর্বভূত দর্শনের পক্ষেও ইহা আবশ্যক যে প্রথমে আত্মদর্শন হইয়া তাহার পর উহাতে সর্বভূতের দর্শন হইবে কিন্তু সর্বভূতের দর্শন ইন্দ্রিয় ভিন্ন হওয়ার উপায় নাই। ইন্দ্রিয় চিরতরে নিরুদ্ধ হওয়ার দরুণ আত্মাতে সর্বভূতের দর্শন অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এইজন্য যথার্থ রহস্যবিদ ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করেন না এবং করিতে ইচ্ছাও করেন না। তিনি ইন্দ্রিয়ের অশুদ্ধি অথবা মল অপসারণ করিয়া উহাকে শুদ্ধ চিৎশক্তিরূপে পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। এই স্থলে ইন্দ্রিয়ের যাহা দোষ তাহা কাটিয়া যায় অথচ তাহার যাহা বৈশিষ্ট্য বা গুণ তাহা নিত্যসিদ্ধরূপে থাকিয়া যায়। শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের নিবৃত্তি কখনই হয় না। নিত্যলীলাতে এই শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের কার্য লক্ষ্য করা যায়। শুদ্ধ ইন্দ্রিয় না থাকিলে নিত্যলীলার আস্বাদন সম্ভবপর হয় না।

অতএব অন্তর্দৃষ্টি যেমন সত্য বহির্দৃষ্টিও তেমনই সত্য। মিথ্যা কোনটাই নয়। যদি মিথ্যা কিছু থাকে তবে শুধু মলিনতা। অন্তর্দৃষ্টিতে যাহা এক বহির্দৃষ্টিতে তাহাই নানা বা অনন্ত। একই অনন্ত, অনন্তই এক। অসত্য কোনটাই নহে। ইন্দ্রিয়-সংস্কার পূর্বে করা থাকিলে শুদ্ধ চৈতন্যে অবগাহন করিয়া বৃত্তিহীন হইতে হয় না। সেখানে অনন্ত শুদ্ধ বৃত্তির খেলা অনুভব করিতে পারা যায়। এই সকল শুদ্ধ বৃত্তিকে চিন্মরীচি বলিয়া বর্ণনা করা চলে। এই অবস্থায় আত্মায় সর্বভূত দর্শন হইয়া থাকে কারণ সর্বভূত আত্মারই চিন্মার্গের খেলা।

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এবং "সর্বং চ ময়ি পশ্যতি" এক অবস্থার অনুভূতি নহে। প্রথমটিতে ইদংরূপে প্রতীতি থাকে উহা অসংস্কৃত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিজন্য জ্ঞানের সমকালে উদিত ব্রহ্মজ্ঞানাভাসের নিদর্শন। কিন্তু দ্বিতীয়টি বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপে আত্মসাক্ষাৎকারের পর বিশুদ্ধ চিৎশক্তিরূপে অনন্ত বৈচিত্র্যের সাক্ষাৎকার। এক নিজেকেই বহুরূপে দেখে—এই দেখা ইদংরূপে নহে কিন্তু আত্মরূপে। ইহাই উভয়ের পার্থক্য।

২১. ৪. ৪৫.

৫২

· · · তোমার দর্শন ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্বে তোমাকে একটী অনুরোধ জানাইতেছি। ঘটনাটি সর্বপ্রথম কোন্‌দিন অনুভব করিয়াছ এবং পরপর ঐ অনুভবের কি ক্রমবিকাশ হইয়াছে তাহা জানাইতে ভুলিও না। যে অনুভব পাইতেছ তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। ইহা সমাধি নহে ধ্যান নহে সূক্ষ্ম দর্শন নহে স্বপ্নও নহে অথবা মনের কল্পনাও নয়। যাহা দেখিতেছ তাহা সত্য তবে ইহা পরম সত্য নহে। তবে পরম সত্য প্রাপ্তির সোপানরূপ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। চিদানন্দময় রাজ্যের একটা পূর্বাভাস তোমার দৃষ্টির সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে। যে স্নিগ্ধ আলোকের মধ্যে সকল দৃশ্য প্রকাশিত তাহা চন্দ্র সূর্য কিংবা অগ্নির আলোক নহে তাহা চিন্ময় জ্যোতি। স্থূল দেহ ত্যাগ করিয়া লিঙ্গ দেহে পূর্বস্মৃতি পরিহারপূর্বক পর্যটন করা একজাতীয় স্বপ্ন। তাহাতে জাগ্রত অবস্থার সহিত বিচ্ছেদ সংঘটিত হয়। যাহার মূলে জড়ত্ব ও অজ্ঞানের প্রভাব। কিন্তু তোমার অবস্থা স্বপ্নবৎ নহে। কেননা জাগ্রত অবস্থার সহিত উহার ঐকান্তিক বিচ্ছেদ নাই। উহা জাগ্রতেরই একটী illuminated extension. তুমি নিঃসঙ্কোচে খুটিনাটী সমস্ত বিবরণ লিখিয়া জানাইবে। তোমার চিঠি কাহাকেও পড়িতে দেই নাই। আপাততঃ দিবও না। সেজন্য সঙ্কোচ বোধ করিও না। মন্দিরের বিশেষ বর্ণনা যথাশক্তি দিতে চেষ্টা করিবে। তুমিও যে লিখিয়াছ ঐ স্থানে দূর ও নিকটের কোন পার্থক্য নাই তাহা সম্পূর্ণ সত্য। শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া যে ঐ স্থানে দূর ও নিকটের কোন পার্থক্য নাই তাহা বলাই বাহুল্য।

শব্দ হইতে জ্যোতি, জ্যোতি হইতে রূপ, দৃশ্য প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়া থাকে। শব্দকে আশ্রয় না করিয়া জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। আমাদের বিকল্প চিন্তা স্মৃতি যাবতীয় জাগতিক বৃত্তি এবং বিক্ষিপ্ততা এই সব অশুদ্ধ শব্দের খেলা। অশুদ্ধ শব্দ অনন্ত প্রকার বিকল্পের আকারে আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। যখন বিশুদ্ধ শব্দ ফুটিয়া উঠে তখন ক্রমশঃ এই সকল মলিন শব্দের বিকার উহাতে আকৃষ্ট হইয়া ইন্ধন যেমন প্রদীপ্ত অনলে দগ্ধ হয় তদ্রূপ দগ্ধ হইয়া যায়। শুদ্ধ শব্দের ক্রমবিকাশে প্রথমে অস্পষ্ট আলোক—তারপরে স্পষ্টালোক—তারপর জ্যোতির অভিব্যক্তি হয়। আলোকভাবের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শব্দভাব ক্ষীণ হইয়া

আসে। ক্রমশঃ এমন সময় আসে যখন ঐ শব্দ আর শুনিতে পাওয়া যায় না এবং একমাত্র জ্যোতিই যখন দেদীপ্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠে। এই দৃশ্য বস্তুতঃ জ্যোতির দ্বারাই গঠিত, যেন জ্যোতিই ঘনীভূত হইয়া দৃশ্যরূপে পরিণত হইয়াছে। বাহিরে জ্যোতি একটু হালকা না হইলে এই আভ্যন্তরীণ ঘনীভাব না চিন্ময় দৃশ্যরূপে আবির্ভাব হইতে পারে না। এই দৃশ্য অনন্তপ্রকার হইতে পারে। মূর্তি মন্দির ফল পুষ্পাদি উদ্যান সরোবর পাহাড় পর্বত প্রভৃতি সকল আকারেই ইহা প্রকাশিত হইতে পারে। এই অবস্থায় এই সকল দৃশ্য স্বয়ং জ্যোতির্ময় হইয়াও অপেক্ষাকৃত হালকা জ্যোতিতে বেষ্টিত দেখা যায়। ইহার পর দীর্ঘ যাত্রার পরে ঐ সকল ঘনীভূত রূপ এত অধিক ঘনীভূত হয় যে একটী ক্ষণের জন্য বাহিরের সমস্ত আলোক যেন তাহাতে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যায়। ইহার পর ঐ সকল দৃশ্য ঠিক বাহ্য জগতের মতই সুষ্ঠুভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। উহাকে ঘেরিয়া একটা জ্যোতি থাকে বটে কিন্তু বুঝিতে পারা যায় ঐ জ্যোতি দৃশ্য হইতেই আবির্ভূত। দৃশ্যটী যেন জ্যোতির ঘণীভূত অবস্থা নহে। তাহার পর বেষ্টনকারী জ্যোতিও ক্ষীণ হইয়া আসে। ক্রমশঃ উহা একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। তখন অনন্ত আকাশের মধ্যে ঐ চিদানন্দময় দৃশ্য ভাসিতে থাকে। পরে আকাশও থাকে না। উহাই সাধকের আত্মা—উহাই সাধক স্বয়ং—উহাই পূর্ণ—উহাই ষোড়শী। যে নিরাধার ও অব্যক্ত নিরাকার সত্তা এই পূর্ণত্বের দ্রষ্টা ও প্রদর্শক সেই গুরু। আপাততঃ ধর সেই সপ্তদশী। কিন্তু ইহারও পরাবস্থা আছে—এখনও আর তাহা বলিব না। ইহাই স্বপ্রকাশ চৈতন্যাবস্থা। অনন্ত কোটী জগৎ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সমগ্র কাল এই মহাচৈতন্যে ভাসিতেছে।

আমার মনে হয় তুমি নিত্যধামের মন্দির দর্শন পাইয়াছ এবং মায়ের কোলে বিশ্রাম সুখের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছ। কিন্তু তোমার বর্ণনা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিব না। পরে বলিব যদি প্রয়োজন হয়।

চৈতন্যশক্তি স্বেচ্ছাবশতঃ ন্যূনতা বা সংকোচ গ্রহণ করেন। ইহাই অণুত্ব বা পশুভাবের উদ্ভব। তাঁহার স্বরূপ নিত্যপূর্ণ—তাহাতে স্বভাবজ সংকোচের লেশমাত্র নাই। কিন্তু তথাপি তিনি অভিনয়চ্ছলে 'আহার্য্য' সংকোচ গ্রহণ করিয়া নিজেকে পরিচ্ছিন্ন করেন, অর্থাৎ তিনি অণু বা পশু সাজেন। এই সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে অভিনয়ে তিনি পরিমিত পশুরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেও বস্তুতঃ তিনি অপরিমিত শিবস্বরূপেই বিদ্যমান থাকেন। অণু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহুভাব এবং আপেক্ষিক মলিনতা প্রকট হয়। বোধ ও স্বাতন্ত্র্যের অভিন্ন স্বরূপই পূর্ণত্ব। ইহাই শিবশক্তির সামরস্য। ইহা নিত্য। পূর্ণ যখন স্বেচ্ছায় অপূর্ণ সাজেন, তখন এই বোধ ও স্বাতন্ত্র্য, যাহা স্বরূপে অভিন্ন ও এক, তাহা অপৃথক্ থাকিয়া যেন পৃথক্ হইয়া যায়। তখন বোধ শুদ্ধ বোধই থাকে। তাহাতে স্বাতন্ত্র্য বা ক্রিয়াশক্তি জাগ্রৎ থাকে না। পক্ষান্তরে স্বাতন্ত্র্য বা ক্রিয়াশক্তি বোধহীন হইয়া অণুত্ব প্রাপ্ত হয়। একটি হয় পুরুষ, অপরটি হয় প্রকৃতি। পুরুষ শুদ্ধ বোধরূপ কিন্তু ক্রিয়াহীন। প্রকৃতি নিত্য পরিণামিনী বলিয়া ক্রিয়ারূপা, কিন্তু বোধহীন। দুইই অপূর্ণ। অণুভাব আসার পর এই শুদ্ধ বোধক্ষেত্রে বিকল্পের উদয় হয়। তখন বিন্দু বা মহামায়ার ক্ষোভজনিত মাতৃকামণ্ডল তাহাকে আক্রমণ করে। বাসনাদির অভিব্যক্তির মূল কারণ ইহাই। ইহাকে শব্দজাল বলা চলে। বস্তুতঃ ইহাই কর্মবীজ বা কার্মমল। ইহার পর মায়া ক্ষুব্ধ হইলে মায়িক তত্ত্বের দ্বারা একটি আচ্ছাদন জন্মে। তখন সংসারে প্রবেশ হয়—কর্মানুষ্ঠান ও কৃতকর্মের ফলভোগ সম্ভবপর হয়।

চৈতন্যশক্তি এইভাবে ক্রমশঃ সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ হইয়া সংসারী সাজেন। ইহাই তাঁহার আত্মনিগ্রহ। তদ্রূপ সীমাবদ্ধ অবস্থা হইতে সীমাতীত অবস্থাতে যাওয়াও তাঁহার স্বেচ্ছাবশতঃ জানিতে হইবে, কারণ তিনি স্বতন্ত্র ও অন্য-নিরপেক্ষ। ইহাই তাঁহার অনুগ্রহ ব্যাপার। ইহার ফলে সংকোচ কাটিয়া যায় এবং ক্রমশঃ আত্মার স্বভাবসিদ্ধ পূর্ণতা উন্মীলিত হয়। কৈবল্যাবস্থাতে কর্ম ও মায়া কাটিয়া গেলেও সংকোচ কাটে না। অণুভাব থাকিয়া যায়। তাই নিষ্কল বিজ্ঞানস্বরূপে স্থিতি হইলেও, মায়া অতিক্রান্ত হইলেও, স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ হয় না, ক্রিয়াশক্তির উদ্বুদ্ধ হয় না। আত্মা তখন মায়াতীত চিৎস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, নিষ্ক্রিয় এবং কেবলী কিন্তু তথাপি পশু। বৈরাগ্য, বিবেকখ্যাতি, তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতির ফলে মায়াতীত অবস্থালাভ হয় বটে, কিন্তু যতক্ষণ ঊর্ধ্বশক্তির সঞ্চার না

হয়, যতক্ষণ মলপাকের ফলে ভগবদনুগ্রহ অবতীর্ণ না হয়, ততক্ষণ ভগবদ্‌-ভাবের উপচার পর্যন্ত হইতে পারে না, প্রকৃত ভগবত্তালাভ তো দূরের কথা, অর্থাৎ পূর্ণ গুরুশক্তির বিকাশ আবশ্যক। ইহাই আত্মানুগ্রহ।

নিগ্রহ যেমন চৈতন্যের স্বেচ্ছার বিলাস, অনুগ্রহও তেমনিই তাঁহার স্বেচ্ছারই বিলাস। 'স্বেচ্ছা' না বলিয়া শব্দান্তর দ্বারা ঐ ভাবটির প্রকাশ করিতে পার, 'স্বভাব' বা 'খেয়াল' বলিতে পার। অর্থাৎ বস্তু একই, শুধু ক্রমটি বিপরীত। এক হইতে বহু হওয়ার মূলে যেমন চৈতন্যের স্বেচ্ছা রহিয়াছে, তেমনিই বহু হইতে পুনর্বার এক হওয়ার মূলেও সেই একই 'স্বেচ্ছা' রহিয়াছে। শুধু ক্রমটি বিপরীত। একটি এক হইতে বহুর দিকে, অন্তর হইতে বাহিরের দিকে, এবং অপরটি বহু হইতে একের দিকে, বাহির হইতে অন্তরের দিকে। ক্রিয়ার বা গতির দিকটি মাত্র বিপরীত। এইজন্য 'বিপরীত ক্রম' বলা হইয়াছে।

যিনি অভিনয়ের মধ্যেও 'দ্রষ্টা' হইয়া আছেন—নিজের বাহিরে আসা ও ভিতরে যাওয়া নিষ্ক্রিয় দ্রষ্টারূপে নিজেই দেখিতেছেন, তিনি কিন্তু ভিতরে ও বাহিরে সমরস, তাঁহার ভিতর—বাহিরের কোন ভেদ নাই। তিনি এক হইয়াও নানা এবং নানা হইয়াও এক। তিনি স্থিতিস্বরূপ। এক হইতে বহু হওয়া = সৃষ্টি। বহু হইতে এক হওয়া = সংহার। স্থিতিটি বিন্দু, সৃষ্টি ও সংহার স্থিতিটির বিসর্গভাবমূলক ক্রীড়ামাত্র।

মা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তুমি বোধহয় সঠিক তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পার নাই। তবে আমার যতটা ধারণা হইতেছে, তাহাতে মনে হয় তিনি জানিতে চান, বিপরীত ক্রমের ক্রিয়া বাহ্য জগৎ হইতে নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধ হইতে পারে কি না। ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, ইহা আংশিক ভাবে হইতে পারে। পূর্ণভাবে হইতে পারে না। গুরু নিত্যসিদ্ধ। কিন্তু যখন অন্তর ও বাহির এই উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবের দিক্ হইতে তাঁহার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যায়, তখন তিনি সিদ্ধ হইয়াও সাধ্য। অর্থাৎ এক দিকে নিত্যপ্রাপ্ত, অন্যদিকে তাঁহাকে কর্মদ্বারা প্রাপ্ত হইতে হয়। যতক্ষণ ভিতর-বাহির ভেদ আছে, ততক্ষণ জ্ঞানের সঙ্গে কর্মকেও স্বীকার করিতেই হইবে। জ্ঞানের দ্বারা আবরণ অপসারিত হইলেও কর্মের অপূর্ণতা থাকিলে সে আবরণ হইতে স্বরূপের উপলব্ধি হইতে পারে না। অর্থাৎ আবরণ কাটিয়া গেলেও 'কাটিয়া গিয়াছে' এ বোধ হয় না। অথবা নিত্যসিদ্ধ অনাবৃত অবস্থায় স্থিত হইয়াও নিজের সে উপলব্ধি জাগে না। বাহিরকে বাদ দিয়া শুধু ভিতরে ভিতরে প্রকৃত পূর্ণত্ব লাভ করা যায় না। বৈরাগ্য, ত্যাগ অথবা সংন্যাসের পথে এইপ্রকারে পূর্ণত্বের চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা লাভ করিতে পারিলেও, ইহা আংশিক সিদ্ধিমাত্র, পূর্ণসিদ্ধি নহে। ভিতর ও বাহিরের যে ব্যবধান তাহা

একহিসাবে কল্পিত এবং অন্য হিসাবে সত্য। কল্পিত ব্যবধান জ্ঞানের উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে কাটিয়া যায়, সত্যের সাক্ষাৎকারের সঙ্গে সঙ্গে কল্পনার ইন্দ্রজাল কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। কিন্তু যে দৃষ্টিতে ব্যবধানটি সত্য সে দৃষ্টিতে কর্ম ভিন্ন তাহাকে কাটাইবার অন্য কোন উপায় নাই। যখন জ্ঞান আরম্ভ এবং কর্মও পূর্ণ, তখনই জ্ঞান ও কর্ম অভিন্ন হইয়া পূর্ণ চৈতন্যের অভিব্যক্তি করে। ইহাই শিবশক্তি-মিলন। ভিতর-বাহির নাই ইহা যেমন সত্য, ভিতর-বাহির আছে ইহাও তেমনই সত্য। অথচ উভয় সত্যের মধ্যে মূলে কোন ভেদ নাই। জ্ঞানের পূর্বে যেমন কর্ম আছে, জ্ঞানের পরেও তেমনই কর্ম আছে। যে কোন প্রকারে হোক্ কর্মটি পূর্ণ করিয়া জ্ঞানের সহিত যুক্ত হইতে হইবে। অথবা জ্ঞানে যুক্ত হইয়া কর্মটি পূর্ণ করিতে হইবে। নতুবা চৈতন্যের আস্বাদ পাওয়া যাইতে পারিবে না।

যখন বস্তুস্থিতি এইপ্রকার তখন গুরু সদা বর্তমান থাকিলেও শুদ্ধ অন্তর্জগতের বিপরীতক্রমের ক্রিয়া বাহ্যনিরপেক্ষভাবে সফল হইতে পারে না।

যখন তৃতীয় নেত্র খুলিয়া যায় তখন বাহ্যনেত্র নিমীলিতবৎ থাকে। যখন বাহ্যনেত্র ক্রিয়াশীল থাকে তখন তৃতীয় নেত্র কার্য করে না। কিন্তু পূর্ণত্বের পথে চলিতে হইলে জ্ঞাননেত্রকে জাগাইয়া বাহ্য অজ্ঞাননেত্রকেও জ্ঞাননেত্রেরই সঙ্গে সঙ্গে সমভাবেই জাগাইয়া রাখিতে হয়। এইরূপ করিতে পারিলে ভিতর-বাহিরের ব্যবধানটা কাটিয়া গিয়া এবং জ্ঞান ও কর্মের ভেদ বিগলিত হইয়া এক অদ্বয় জগতে প্রবেশলাভ হইতে পারে।

পুনশ্চ—অণুভাব পরিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে বহুভাব হয়। ইহা সত্য কিন্তু অণুত্ব অবলম্বন না করিয়াও বহুত্ব হইতে পারে। বিভুস্বরূপেও বহুত্ব উপপন্ন হয়। নৈয়ায়িকগণ, সাংখ্যাচার্যগণ বহু আত্মা স্বীকার করেন। শৈবগণ (দ্বৈতবাদী) বহু শিব স্বীকার করেন। বৈষ্ণবগণ জীবাত্মাকে অণু জানিলেও পরমেশ্বর বা ভগবানকে বিভু জানেন। গৌড়ীয়গণ ভগবানের স্বয়ংরূপে বহু "প্রকাশ" স্বীকার করেন। এই সকল "প্রকাশ" স্বয়ংরূপের সহিত অভেদাত্মরূপ। কোনটিতে ন্যূনতা নাই। দ্রষ্টব্য: "লঘুভাগবতামৃত"।

১২.৬.৬৫

৫৪

* * * পত্রে যে তান্ত্রিক সাধুটীর বিবরণ জানাইয়াছ তাহা খুবই সুন্দর। তিনি যাহা যাহা দেখাইয়াছেন ও বলিয়াছেন সবই সত্য। বৈষ্ণব সহজপন্থা, বৌদ্ধ সহজযান, বজ্রযান, তান্ত্রিক বামমার্গ, কাপালিক মার্গ, পাশুপত পন্থা প্রভৃতি বহু সম্প্রদায়ে ঐ জাতীয় সাধনার কথা আছে। প্রকৃতির সংসর্গ ব্যতিরেকে বিন্দুর উর্দ্ধগতি সম্পাদন করিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয় কিন্তু তাতে পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে না। স্ত্রীসংসর্গে সে আশঙ্কা থাকে। পশু অবস্থায় ব্রহ্মচর্য রক্ষা করিয়া বিন্দুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। তাহা হইলে আর প্রকৃতি তাকে স্খলিত করিতে পারে না বরং উর্দ্ধে চালনা করে। সকল প্রকৃতি দ্বারা ঐ কার্য্য হয় না, সমর্থা-প্রকৃতি আবশ্যক। সাধারণী ও সমঞ্জসা প্রকৃতির দ্বারা সাধনা হয় না। নিজেকে প্রথমে বিন্দুজয়ী হইতে হয়। যাক্ লোকটী সত্যই দর্শনীয় পুরুষ। যদি কখনও সুবিধা হয় নিয়া আসিতে পারিলে দর্শন করিব।****

১২. ৬. ৬৫

৫৫

***বহু কথা বলিবার আছে। যে পথে চলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাতে নিষ্ঠা রাখিয়া চলিতে থাকুন। ক্রমশঃ বহু জিনিষ জানিতে পারিবেন। সুসময় আসিতেছে।

আমি আপনাকে ভুলি নাই। মহাস্মৃতিতে আপনি গাঁথা হইয়া গিয়াছেন। আর পলাইবার উপায় আছে? ধীরে ধীরে সব বুঝিতে পারিবেন।

১৫.৬

৫৬

গুরুদর্শনে কর্ম থাকে না—ইহা সর্বত্র প্রসিদ্ধ। ইষ্টদর্শন হইলেও এক হিসাবে কর্ম কাটিয়া যায় বটে কিন্তু অপর হিসাবে সংস্কারকর্ম থাকিয়া যায়, যাহা গুরুদর্শন না হওয়া পর্যন্ত নিবৃত্ত হইতে পারে না। শ্রীশ্রীমা এক হিসাবে ইষ্ট ও গুরু উভয়ই, সুতরাং এই সময় আপনাদের কর্ম থাকিলেও না থাকারই মতন। অতএব কর্ম-বিষয়ক উপদেশ দিবার ইহা সময় নহে। নিরন্তর মাকে দর্শন করুন এবং যথাশক্তি বাহ্যদর্শনকে আভ্যন্তরীণ দর্শনে পরিণত করিতে চেষ্টা করুন। শুধু আভ্যন্তরীণ দর্শন হইলেও হইবে না। দৃশ্য বস্তুর সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন করিতে চেষ্টা করুন—শুধু তাহাতেও হইবে না—দৃশ্যের সহিত অভিন্ন হইয়া নিজে শুদ্ধ চৈতন্যরূপে তাহাকে অতিক্রম করিয়া দ্রষ্টা হইয়া দেখিতে থাকুন। নিজেই দৃশ্য, নিজেই নিজের দ্রষ্টা। নিজেই সাক্ষী এবং নিজেই সাক্ষীর আশ্রয়। এ পর্যন্ত উঠিতে পারিলেই মাকে কিছু কিছু বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু ইহার পরও অবস্থা আছে। কারণ মার শেষ নাই। অখণ্ড সত্তাতে দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই বিকল্পও থাকে না। নির্বিকল্পে পরমপদে স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারেন। তখন অনন্ত রূপ, অনন্ত ভাব, অনন্ত আকার ও অনন্ত রস লইয়া খেলা করিলেও নিজে নিত্য শুদ্ধ নির্বিকল্পই থাকা যায়। এইটুকুই বুঝিতে চেষ্টা করুন।

১৫.৭

৫৭

শ্রীশ্রীমা আপনাদিগকে কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন শুনিয়া দুঃখের মধ্যেও আনন্দের পূর্বাভাস প্রাপ্ত হইলাম। শ্রীকৃষ্ণ পরমভক্ত ব্রজবাসীগণকে ত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিলে ব্রজের যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, বর্তমান সময়ে আলমোড়া আশ্রমেরও কতকটা সেইরূপ দশা। কিন্তু আপনি তো জানেন শ্রীকৃষ্ণ মথুরা গিয়াছিলেন ইহা যেরূপ সত্য, তেমনি ইহা আরও সত্য যে তিনি ব্রজভূমি পরিত্যাগ করেন নাই। জগতের চক্ষুতে তাঁহার মথুরাগমন কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া যান

না—বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি। তেমনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন বাহ্য দৃষ্টিতে মা যেখানেই যান না কেন, মা স্বীয় ভক্তজনের হৃদয় ছাড়িয়া কোথাও যান না। লৌকিক দৃষ্টিতে যেখানে মায়ের বিচ্ছেদ, অন্তর্দৃষ্টিতে সেখানে বিচ্ছেদের লেশমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং আপনি নিজের দৃষ্টিটাকে যাহাতে বাহির হইতে ফিরাইয়া আনিয়া ভিতরে স্থাপন করিতে পারেন তাহার জন্য চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলে হৃদয়ে মাকে দেখিতে পাইয়া চিরমিলনের আনন্দে উল্লসিত হইবেন কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি সত্ত্বেও যদি মাকে দর্শন করিতে না পারেন তাহা হইলে সে অবস্থাকে সত্যই বিচ্ছেদ বলিয়া মনে করিতে হইবে। কিন্তু ইহাও মঙ্গলময়। এই বিচ্ছেদ বেদনা যতই তীব্র হইয়া উঠিবে ততই ইহার মধ্য হইতেই একটা অপূর্ব মধুর রস ফুটিয়া বাহির হইবে। তখন মিলনাপেক্ষা বিচ্ছেদকেই অধিকতর সহনীয় বোধ হইবে। কারণ ইহার ফলে যে প্রিয়জনকে মিলনাবস্থায় নির্দিষ্ট দেশ ও নির্দিষ্ট কালে আংশিকভাবে পাওয়া যায়, তাহাকে সর্ব দেশ ও সর্ব কালব্যাপীরূপে পূর্ণভাবে সাক্ষাৎকার করা যায়। ইহাই মহামিলনের পূর্বসূত্র। এইপ্রকার তীব্র বিচ্ছেদ বোধ না থাকিলে অনন্ত মিলন সম্ভবপর হয় না। তাই ভক্ত বিচ্ছেদ কাটিয়া গেলে ব্যাকুল হইয়া পড়েন।

"বিচ্ছেদ সুমধুর হল দূর কেন রে
মিলন দাবানলে গেল জ্বলে যেন রে।"

পক্ষান্তরে যে মিলনকে আপনারা অভিনন্দন করেন ভক্ত সে মিলনে বিচ্ছেদই দেখিতে পায়, কারণ "দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।" দুইটি লোক একটি প্রদেশে অবস্থিত হইলেও যে মিলন হয়, তাহা নহে। ভাবের সঙ্গে ভাব, গুণের সঙ্গে গুণ, স্বরূপের সহিত স্বরূপের যোগ না হইলে মিলন কোথায়? তাই লৌকিক মিলনের মধ্যেও বিরহ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যায়। কিন্তু সে বিরহও তো রস। তাহার মাধুর্য অনুপম। কিন্তু সকলে তাহা আস্বাদন করিতে পারে না, কারণ সে বিরহের বোধ সকলের হয় না। এ বিরহও তাঁহাকেই অর্পণ করিতে হয়। এ রস তাঁহারই জন্য—ইহাই প্রকৃত সমর্পণ। ইহা ঠিক ভাবে করিতে পারিলে হৃদয়ের সকল খেদ মিটিয়া যায়।
তাই কবি বলিয়াছেন—

"মিলনের পাত্রটি
পূর্ণ যে বিচ্ছেদ বেদনায়
অর্পিনু হাতে তার
খেদ নাই আর মোর খেদ নাই।"

১৯. ৬. ৪৮

তুমি "মা" সম্বন্ধে কিছু শুনিতে চাহিয়াছিলে। আজ যথাসম্ভব সংক্ষেপে এই বিষয়ে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। তুমি মনোযোগ সহকারে শুনিবে এবং শুনিয়া যাহাতে ঠিক ঠিক মনন করিতে পার তাহার জন্য চেষ্টা করিবে।

"মা" বলিতে সেই পরাশক্তিকে বুঝায় যিনি সমগ্র সৃষ্টি প্রভৃতি জাগতিক ব্যাপারের মূলে রহিয়াছেন, ব্যষ্টিভাবেও আছেন, সমষ্টিভাবেও আছেন এবং তদতীতভাবেও আছেন। এই পরাশক্তি শ্রীভগবানের স্বরূপভূতা শক্তি এবং বিশুদ্ধ চিন্ময়ী। শ্রীভগবান্ যেমন সচ্চিদানন্দময়, তেমনি তাঁহার শক্তিও সচ্চিদানন্দময়ী।

স্বরূপতঃ ইঁনি এক ও অভিন্ন। ভগবান্ যেমন এক, তাঁহার শক্তিও তেমনি এক। এই মূলীভূত শক্তি অব্যক্ত ও নিরাকার। ইঁনি ব্যক্তি-ভাবাপন্ন নহেন (impersonal)। এই মূল শক্তিকে বিশ্বাতীত চিৎশক্তি বলিয়া মানিবে। ইঁহার সহিত শ্রীভগবানের সম্বন্ধ অদ্ভুত। শক্তি হইতেই সৃষ্টি হয়—তাই অনন্ত সৃষ্টির ঊর্দ্ধ্বে, অতীত প্রদেশে ইঁনি অবস্থিত। সৃষ্টি ইঁহারই অভিব্যক্তি। সেইজন্য ইঁনি অব্যক্ত হইলেও অংশতঃ ব্যক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ নিত্য অব্যক্ত, পরম রহস্যময় (ever unmanifest mystery of the Supreme) শ্রীভগবানের সহিত সৃষ্ট জগতের সম্বন্ধের দ্বার এই পরাশক্তি। চিৎশক্তি মধ্যস্থ না থাকিলে শ্রীভগবানের সঙ্গে জগতের কোনই সম্বন্ধ থাকিত না। অর্থাৎ ইঁহার নিত্যচৈতন্যের (eternal consciousness) মধ্যেই শ্রীভগবান্ বিধৃত আছেন (the Supreme Divine)। সুতরাং এই পরাশক্তির আশ্রয় ব্যতিরেকে ভগবানের স্বরূপজ্ঞান উদ্ভূত হইতে পারে না। পরাশক্তিরূপিণী মা পরমেশ্বরেরই স্বীয় জ্ঞান ও শক্তিভূত।

আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। পূর্ণের মধ্যে একটি দিক্ আছে তাহা স্বপ্রকাশময়, আর একটি দিক্ আছে যাহা পরমাব্যক্ত রহস্যময়। পূর্ণ অখণ্ড, তাই এই দুইটি দিক্ও আমাদের বুঝিবার জন্য বলা হইল। বস্তুতঃ সেখানে ভেদকল্পনা চলে না। যেটি রহস্যময় ও অপ্রকাশ—তাহাই অব্যক্ত ভগবান্, যেটি স্বপ্রকাশময় তাহাই ভগবৎ শক্তি। এই অপ্রকাশ দিকটাও শক্তি, তবে চিরাব্যক্ত ও পরিপূর্ণ (Absolute power); এই দিকটা সত্তাও বটে, তবে চিরাব্যক্ত সত্তা (ineffable presence)। আপাত

দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে "মা", শক্তি, পরাশক্তি—ভগবান শক্তি নহেন। তিনি শক্তিমান। বস্তুতঃ ভগবানও শক্তি—তবে পরিপূর্ণ ও নিত্য অব্যক্ত শক্তি। তাই সাধারণতঃ তাহাকে শক্তি বলা হয় না। শক্তি কার্যানুমেয়। তাঁহার সাক্ষাৎ কোন কার্য নাই। ভগবান ও ভগবতী একই বস্তু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মনে হইতে পারে "মা"-ই সত্তা, কারণ "মা"-তেই নিত্যসিদ্ধ স্বাভাবিক প্রকাশমানতা রহিয়াছে। ভগবান সত্তাতীত। অতএব "অসৎ"। বস্তুতঃ তাহা নহে। ভগবানও সত্তাস্বরূপ। শূন্য নহেন, অসৎ নহেন—ineffable presence, তিনি নিত্য অব্যক্ত। পরাশক্তিরূপিণী সত্তা প্রকাশময়ী, তিনি চির অপ্রকাশস্বরূপ। এই চির অব্যক্ত শক্তি ও সত্তার সন্ধান একমাত্র "মা"-ই জানেন—মহারহস্য শুধু "মা"-ই জ্ঞাত আছেন। গুপ্তভাবে নিহিত (hidden) সৃষ্টি ব্যাপারটি কি জান ত? রহস্যময় মহাসত্তা হইতে অনন্ত খণ্ড সত্তার আবির্ভাব। এই অনন্ত-খণ্ড সত্তা "মা"-তেই আছে বা ভগবানেই আছে—উভয়ই বলা চলে (containing বা calling) বাস্তবিকপক্ষে দুইই এক। কিন্তু আবির্ভাবের কারণ "মা"। কারণ গুপ্ত অবস্থা হইতে বাহির করা "মা"-র কার্য। বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ খণ্ড সত্তাগুলি পরাশক্তির অনন্ত আলোক, চৈতন্যের শুদ্ধ প্রকাশে, সদ্রূপে ভাসিয়া উঠে—চেতনভাবে, ব্যক্তভাবে ফুটিয়া উঠে। এই সময়ে ঐ সত্তাগুলি শক্তির আকার ধারণ করে। পরাশক্তির প্রভাবে এরূপ হয়। অনন্ত চৈতন্য পাইয়া এরা চেতন হয়। এই পর্যন্ত পাওয়া গেল সত্তাগুলি শক্তি ও চৈতন্যময়। তারপর হয় সাকার—দেহবিশিষ্ট। এটা বিশ্বের অগ্রবর্তী দশা।

খণ্ড সত্তাগুলির তিনটি অবস্থা পাওয়া গেল—

(১) গুপ্ত, অব্যক্ত। এই অবস্থায় খণ্ড সত্তা মহাসত্তায় প্রচ্ছন্ন থাকে। এই মহাসত্তা = ভগবান বা ভগবতী।

(২) প্রকট, চিদালোকে আলোকিত। এই অবস্থায় খণ্ড সত্তাগুলি চৈতন্যময় ও শক্তিময় রূপে বর্তমান। এইগুলি অনন্ত চিন্ময় রশ্মি, যাহাকে তান্ত্রিকগণ বলেন "চিন্মরীচি"। ইহা পরাশক্তির ভূমিতে। বস্তুতঃ এই সকল শক্তিপুঞ্জ স্বাংশভূত, নিরাকার।

(৩) সাকার। ইহা বিশ্ব বা সৃষ্টি মধ্যে প্রকটিত রূপ।

পরাশক্তির হৃদয়ে পরভগবান নিত্যই অখণ্ড সচ্চিদানন্দরূপে প্রকাশমান। এই প্রকাশমানতা স্বভাবসিদ্ধ। পরাশক্তিরও অতীত স্বরূপ যেটী, তাহা রহস্যময় চির অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, পরমাব্যক্ত।

পরাশক্তি ভগবানকে লইয়া খেলা করেন। তিনি তাঁহাকে ব্যক্ত করেন ও আকার দান করেন। সৃষ্টিতে ব্যক্ত করেন—

(ক) ঈশ্বর ও শক্তিরূপে। এটা অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ। এক হইয়াও দ্বন্দ্বরূপে প্রকাশিত।

(খ) পুরুষ ও প্রকৃতি রূপে। ইহারা ভিন্ন স্বরূপ। দ্বৈতভাবে স্থিত। উভয়ই নিরাকার।

আবার আকার ধারণ করেন—অনন্তরূপে, কোটি ব্রহ্মাণ্ডরূপে, তদন্তর্গত লোক লোকান্তররূপে, তদন্তস্থ দেবতা ও তৎশক্তিরূপে।

এইভাবে পরাশক্তিরই প্রভাবে জ্ঞাতাজ্ঞাত অনন্ত জগতে যাহা কিছু আছে "সবই যে ভগবান" এই সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইহা পরাশক্তিরই মহিমা। যেখানে যা কিছু আছে সবই শক্তি কর্ত্তৃক অনন্তের রহস্য উদ্‌ঘাটন মাত্র।

বস্তুতঃ সমস্ত বিশ্বই চিৎশক্তির অংশ বলিয়া তাঁহা হতে অভিন্ন। যাহা কিছু যেখানেই থাকুক সবই তাঁহাদের উপর নির্ভর করে—কারণ শক্তি যাহা নির্ণয় করিতে ইচ্ছা করেন, শিব তাহাই অনুমোদন করেন। তাহাই জগতে সত্তা লাভ করে।

বস্তুমাত্রেরই আবির্ভাবগত মূল রহস্য এইঃ

(ক) ভগবানের ক্ষোভপ্রেরণা পরাশক্তির উপর।

(খ) ভগবৎ প্রেরিত পরাশক্তির ঈক্ষণ, দর্শন।

(গ) শক্তিদৃষ্ট তদভিন্ন দৃশ্যের শক্তিদ্বারাই সৃষ্টিকারী আনন্দে প্রক্ষেপ।

(ঘ) ঐ প্রক্ষিপ্ত দৃশ্যের বীজভাব প্রাপ্তি।

(ঙ) ঐ বীজের আকার লাভ।

(চ) আকারের স্থূলত্বাপত্তি মূর্ত্ততা।

অতএব সৃষ্টিতে সর্বত্র শক্তিরই নানা প্রকট অবস্থা রহিয়াছে। চিৎশক্তিই জীব ও জগৎকে ধরিয়া রহিয়াছেন। ইঁহার তিনটি দিক্ আছে—

(১) বিশ্বাতীত-পরাশক্তি।

(২) বিশ্বাত্মিকা-মহাশক্তি। বিশ্বমাতা। ইনি বিশ্বের আত্মা। পরাশক্তির Personality।

(৩) ব্যষ্টিরূপা—খণ্ডশক্তি (জীবহৃদয়বাসিনী)।

(১) ইনি সৃষ্টির অতীত, সৃষ্টির সঙ্গে অব্যক্ত ভগবানের যোজিকা।

(২) ইনি জীব সকলের সৃষ্টি করেন; আর অনন্ত প্রক্রিয়া ও শক্তির ধারণ, অনুপ্রবেশ, বলাধান ও চালনা করেন।

(৩) ইনি উপযুক্ত দুটি প্রকারের শক্তিকে রূপদান করেন, উভয়কে আমাদের নিকট জীবন্ত ও সন্নিহিত করেন এবং মনুষ্য (human personality) ও ভগবৎ শক্তির মধ্যে মধ্যস্থতা করেন।

এবার মহাশক্তির তত্ত্ব ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। মহাশক্তির কার্য ততক্ষণ আরম্ভই হয় না, যতক্ষণ পরাশক্তি কার্য না করেন। পরাশক্তি মহাশক্তির "অব্যক্ত চৈতন্য" মাত্র। পরাশক্তি ভগবৎ সত্তা হইতে "সত্তা„ আকর্ষণ করিয়া সঞ্চার করিলে মহাশক্তি তাহা ধারণ করেন ও তাহাকে কার্যে পরিণত করেন, গঠন করেন। এই যে কার্যরূপে পরিণাম, ইহাই কোটি কোটি অণ্ডের রচনা। ইহার পর ঐ সকল অণ্ডে তিনি অনুপ্রবেশ করেন। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানু-প্রাবিশৎ। এই অনুপ্রবেশের ফলে সকল অণ্ডেই ভাগবতী সত্তা (Divine Spirit), সর্বধারিণী ভাগবতী শক্তি ও ভাগবত আনন্দ পরিব্যাপ্ত হয়। সৃষ্টিতে এই আনন্দ-প্রাচুর্য না থাকিলে, কোন পদার্থ বাঁচিতে পারিত না, কিছুরই সত্তা থাকিত না। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।

মহাশক্তির দুইটি রূপ—

(১) আন্তর। চৈতন্যাত্মকরূপা। ইহা "শক্তি"।

(২) বাহ্য। ক্রিয়াত্মকরূপা। ইহারই নাম "প্রকৃতি"।
মহাশক্তিই প্রকৃতিকে চালনা করেন এবং প্রকৃতির প্রতি প্রক্রিয়াতে প্রকট বা গুপ্তরূপে খেলা করেন। সকল শক্তি ও ক্রিয়ার সামঞ্জস্য মহাশক্তিই করেন।

প্রতি ব্রহ্মাণ্ড বিশ্বব্যাপী মহাশক্তির এক একটি খেলা। প্রত্যেকটি জাগতিক বস্তু কি ?—

(১) মহাশক্তি যাহা দর্শনে সাক্ষাৎকার করেন (পরাশক্তি সঞ্চারিত মহা অব্যক্ত সত্তা হতে)

(২) দর্শন করিয়া যাহা স্বীয় সৌন্দর্য ও শক্তিময় হৃদয়ে সঞ্চয় করেন, ও

(৩) স্বীয় আনন্দে যাহা সৃজন করেন।

মহাশক্তির সৃষ্টির স্তর বিন্যাস—

(১) সর্বোপরি শিখরদেশে—আমরা যে বিশ্বের অংশরূপে আছি তাহার ঊর্দ্ধ্বে—অসংখ্য জগৎ আছে। সর্বত্র অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত আনন্দ।
এই সকল জগতের ঊর্দ্ধ্বে "মা" স্বপ্রকাশ নিত্য ও অনন্ত শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছেন। এই সকল জগতে বহু সত্ত্ব আছেন। সকলেই সেখানে বাস করিতেছেন এবং সঞ্চার করিতেছেন—যেন অচিন্ত্য অনন্তরূপে (ineffable completeness) ও অপরিবর্তনীয় অভেদরূপে (unalterable oneness) কারণ সকলেই চিরদিন মায়ের কোলে নিশ্চিন্তে আছেন (she carries them safe in her arms for ever)।

(২) তার নীচে, আমাদের কাছাকাছি—অসংখ্য লোক আছে। সবগুলি পূর্ণ ও অতিমানস সৃষ্টি। এই সকল জগতে "মা"-ই অতিমানস মহাশক্তি। ইনি ভাগবত ইচ্ছা (যাতে সর্বজ্ঞ আছে) ও জ্ঞান (যাতে সর্বশক্তি আছে) রূপা শক্তি। তাঁহার সকল কাজই অব্যর্থ—সর্বত্র তাঁর সত্তা পরিপূর্ণ। প্রতি প্রক্রিয়াতেই মহাশক্তি স্বভাবসিদ্ধ। এই জগতে সকল ক্রিয়াই সত্যের স্ফুরণরূপা। সকল সত্তাই ভাগবত জ্যোতির আত্মা (soul), শক্তি (power) ও দেহ (body); সেখানে সকল অনুভবই পূর্ণ আনন্দের বন্যা ও লহরী।

(৩) আমাদের জগৎ। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে। সবই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন। এই সকল অণ্ডে মন, প্রাণ ও দেহ মূল হতে পৃথকরূপে প্রতীত হয় separated in consciousness)। আমাদের এই পৃথিবী এই অজ্ঞান জগতের একটি কেন্দ্র। এই জগতে সংঘর্ষ, আবরণ ও অপূর্ণতা আছে। কিন্তু ইহাও বিশ্বমাতা ধারণ করিয়া আছেন। মহাশক্তির প্রেরণায় ইহা পরম লক্ষ্যস্থানে উপনীত হয়।

পরাশক্তি চিন্ময়ী। তাই তিনি চিৎশক্তি।

মহাশক্তি জ্ঞানক্রিয়াময়ী। সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্তৃত্বের মিলিত অবস্থাই মহাশক্তি। ইনিই সুর রচনা করেন। এক একটি লোকসমষ্টি (system of worlds), এক একটি জগৎ (universe) উহা ঐ জগতের মহাশক্তির খেলা। ঐ জগতের আত্মারূপে তিনি খেলিতেছেন। ইনিই Cosmic Soul. ইনিই বিশ্বাত্মা ও বিশ্বাতীতের, অরূপের personality.

এই সব লোক-লোকান্তর পরাশক্তি সৃষ্টি করেন না। কিন্তু পরাশক্তিই ভাবরূপে প্রথমে প্রদর্শন করেন। মহাশক্তি তাহা দেখিয়া আনন্দে সৃজন করেন।

ইহার মধ্যে একটি গভীর রহস্য আছে। সৃষ্টির ধারাটা এইপ্রকার—জ্ঞান, তারপর ভাব, তারপর শক্তি, তারপর কর্ম। মস্তিষ্ক, হৃদয়, নাভি ও করণ (আনন্দেন্দ্রিয়)। প্রথমে মস্তিষ্কে জ্ঞানরূপে সঞ্চার হয় (vision), তারপর হৃদয়ে ভাবরূপে অবতরণ হয় (gathering in heart of hearts), তারপর নাভিতে এসে শক্তিরূপ ধারণ করে (power), তারপর আনন্দে সৃজন হয়। ইহাই জাগতিক ব্যাপার। মহাসৃষ্টিতেও এই ব্যাপারই বুঝিতে হইবে।

প্রত্যেকটি রচনা স্তরের ঊর্ধ্বেই মহাশক্তি আছেন মনে হয়।

অজ্ঞানরাজ্যটি সোপানময়। চৈতন্যের স্তর ক্রমশঃ অবরোহণ করিয়াছে—চরমে জড়ের অচৈতন্যে মগ্ন হইয়া গিয়াছে; পক্ষান্তরে আরোহণ করিয়া চলিয়াছে—চরমে অনন্ত চৈতন্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে (infinity of Spirit)। আরোহণ পথে প্রাণ (life), আত্মা (soul) ও মনের (mind) ক্রমবিকাশ লক্ষিত হয়।

এই অজ্ঞানজগতের ঊর্ধ্বে আছেন মহাশক্তি—ইনি সর্ব দেবগণের অতীত। এই অজ্ঞানজগতের ঘটনাপুঞ্জ ও অভিব্যক্তি বা বিকাশের নিয়ামিকা ঐ মহাশক্তি—তাঁহার দর্শন, অনুভব ও দান (pours from her)—ইহা নিরত আছে।

(১) এই মহাকার্যের সাধন জন্য তিনি নিজের যাবতীয় শক্তি ও রূপ (powers and personalities) প্রকট করেন। ইঁহারা অজ্ঞানজগতের ঊর্ধ্বেই থাকেন—মহাশক্তির সম্মুখে তাঁহার আবরণরূপে। এই সকল শক্তি ও রূপের বা মূর্তির অংশ (emanations) তিনি জগতে প্রেরণ করেন। ইহাদের উদ্দেশ্য—হস্তক্ষেপ করা (intervene), শাসন করা (govern), সংগ্রাম করা (battle) ও জয় করা; যুগের পরিবর্তন করা, শক্তিপুঞ্জের ব্যষ্টি ও সমষ্টি দ্বারা সকলকে সঞ্চালন করা। নানা যুগে নানা দেশে মনুষ্য মহাশক্তিকে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপেই উপাসনা করিয়া আসিয়াছে।

(২) মহাশক্তির আরও কাজ আছে। ঈশ্বরের বিভূতিসকলের মন ও দেহ রচনা মহাশক্তির কার্য। তদ্রূপ মহাশক্তির নিজের বিভূতিসকলের মন ও দেহ রচনা তাঁহারই কার্য। এই কার্য তিনি পূর্ববর্ণিত শক্তিবর্গ ও তাদের অবতরণ দ্বারা সিদ্ধ করেন। ইহার উদ্দেশ্য এই যে তিনি ভৌতিক জগতে ও মানবীয় চেতনার আবরণের মধ্যেও তাঁহার স্বীয় শক্তি, গুণ ও সত্তার কিঞ্চিৎ অংশ প্রকাশিত করিতে চান।

(৩) জাগতিক ঘটনা—সবই নাটকের খেলা। এই নাটকের ব্যবস্থা, অভিনয়াদির ব্যাপার সবই মহাশক্তি করেন। বিশ্বদেবগণ তাঁহাকে সাহায্য করেন মাত্র। তিনিই প্রকৃত অভিনেত্রী।

মহাশক্তির শাসন প্রণালী—

(ক) তিনি সৃষ্ট জগৎকে উপর হইতে শাসন করেন। এইটি তাঁহার impersonal দিক্। জাগতিক সকল পদার্থ অজ্ঞানের কার্যও তিনিই স্বরং। তবে তাঁহার শক্তি আবৃত। এই সব তাঁরই সৃষ্টি—তবে সত্তা নূ্যন। এ সব তাঁরই প্রাকৃত দেহ ও শক্তি। এই সকলের আবির্ভাবের রহস্য এই যে, পূর্ণ ষোলো আনা সত্তার সম্ভাব্যতার মধ্যে এমন কিছু ছিল যাহা কার্যে পরিণত করা বা গঠন করার ভার ভগবানের অচিন্ত্য অজ্ঞান বশে তাঁহারই উপর ন্যস্ত হয়। তিনি তখন মহান্ আত্মবলিতে সম্মত হন। ফলতঃ তিনি অজ্ঞানের আত্মা ও আকার মুখোসের ন্যায় ধারণ করেন।

(খ) আবার তিনি ত্রিবিধ লোকে অবতীর্ণ হইয়াও শাসন করেন। এটা তাঁর personal দিক্। তিনি দয়া করিয়া এই অন্ধকারে নামিয়া আসিয়াছেন, মিথ্যা ও ভ্রমে নামিয়া আসিয়াছেন, মৃত্যুতে নামিয়া আসিয়াছেন। উদ্দেশ্য এগুলিকে আলোক, সত্য ও অমরত্বে পরিণত করিবেন। জগতের অনন্ত দুঃখে নামিয়া আসিয়াছেন—যেন ইহাকে পরমানন্দে পরিণত করিতে পারেন। সন্তানের প্রতি তাঁহার প্রেমে তিনি এই ভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছেন।

তুমি পরমার্থ সাধনে আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও ঠিক ঠিক আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেছ না ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় হইলেও প্রভুর ইচ্ছা মনে করিয়া ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবার অভ্যাস করিতে হইবে। নিজের পৃথক ইচ্ছা না রাখিয়া এবং শ্রীভগবানের ইচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা মনে করিয়া চলিতে হইবে। সাধনা এবং আত্মোন্নতির জন্য ঐকান্তিক প্রযত্ন শুভকর্ম তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ইহাও পুরুষকার; নিজের কর্তৃত্ব অভিমান হইতে ইহা উদ্ভূত হয়। কর্তৃত্ব অভিমান কাটিয়া গেলে সাধনার কোন মূল্য থাকে না। তখন বুঝা যায় তাঁহার ইচ্ছার সর্বমূলে এবং এই ইচ্ছা মঙ্গলময়। তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছার সংঘর্ষ না করিয়া, তাঁহার প্রতি অনুগতভাব গ্রহণ করিয়া জীবনের পথে চলিতে অভ্যাস করা উচিত। তিনি মঙ্গলময় এবং আমার সর্বাপেক্ষা আপন জন এই সত্যটি যদি মনে রাখিতে পার তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে গোবরেও পদ্মফুল ফোটে। অনুগত হইয়া চাতকের ন্যায় তৃষিতভাবে তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে হইবে, তাহা করিতে পারিলে একদিন না একদিন অভূতপূর্বভাবে এবং অচিন্ত্য উপায়ে সেই মহাকরুণা সিন্ধুর কৃপাবিন্দু অবশ্যই পাইবে। তাঁহার দিকে আশা করিয়া থাকিলে এবং সরল সত্যের পথে চলিতে শিখিলে বুঝিতে পারিবে যে এই সংসার যতই ভীষণ আকার ধারণ করুক্ না কেন তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। তখন বুঝিতে পারিবে একদিন যাহাকে তৃষিত মরু বলিয়া মনে করিয়াছ তাহাই রসাল নন্দন। দৃষ্টির পরিবর্তন না হইলে এ অনুভব আসে না। তাই আমার মনে হয় নিজের ইচ্ছাকে তাঁহার ইচ্ছায় বিসর্জন দিয়া সেই মহা ইচ্ছার ছন্দে সর্বদা স্পন্দিত হইতে থাক। কখনও বিশ্বাস হারাইবে না এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না। তাহা হইলে সহস্র দুঃখের মধ্যেও উদ্ধারের পথ আপনি ভাসিয়া উঠিবে এবং তোমার অজ্ঞাতসারে কোন্ এক অজ্ঞাত হস্ত তোমাকে চালাইয়া লইয়া যাইবেন। তোমার সর্বপ্রকার চিন্তা তিনি গ্রাস করিবেন এবং তুমি নিশ্চিন্তভাবে তাঁহার অনুগামী হইয়া সুখ-দুঃখের অন্তরালে মধ্যমার্গ অবলম্বন করিয়া প্রতিদিন তাঁহার নিকটস্থ হইতে পারিবে।

৩, ১, ৪৫

৬০

আপনি নাদধ্বনি প্রায় অখণ্ডিত ভাবে চলিতেছে এইরূপ উপলব্ধি করিতেছেন ইহা সুসংবাদ সন্দেহ নাই কিন্তু এখনও অনেক কার্য্য বাকী রহিয়াছে। কারণ, নাদ হইতে মহানাদে প্রবেশ এখনও সিদ্ধ হয় নাই। বর্ণাত্মক শব্দ বর্ণভাব পরিহার করিয়া ধ্বনিরূপে পরিণত হইলেই নাদের উপলব্ধি হয়। নাদের উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মন ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ হইয়া আসে। কিন্তু খণ্ডমন মহামনে পরিণত হয় না। এইজনাই নাদ হইতে মহানাদে প্রবেশ করা আবশ্যক। মহানাদের উন্মেষ অনুভব করিতে না পারিলে গুরু অথবা চৈতন্যের সন্ধান কি প্রকারে পাওয়া যাইবে? আপনি যেটিকে উন্মনীভাব মনে করেন উহা ঠিক উন্মনীভাব নহে। উন্মনা শক্তির আবির্ভাবের এখনও সময় আসে নাই, ইহাই আমার বিশ্বাস। খণ্ডমনের পরিবর্তে অখণ্ড-মনের পরিচয় পাইয়া উহাকেও বিশ্লেষণপূর্বক অক্রম বিবেকমার্গের সাহায্যে বিশুদ্ধতম কৈবল্যাবস্থার আভাস পাওয়া যায়। তাহার পর পরমপুরুষের বিশেষ অনুগ্রহে সেই মনোভূমির অতীত কেবল আত্মসত্তাতে, যাহাতে জড়ত্বের সংস্পর্শমাত্র থাকে না, উন্মনী-শক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। উন্মনী-শক্তির আবির্ভাব হইলে মনের খেলা বলিয়া এতদিন যাহা প্রতীত হইত, তাহা চিদানন্দময়ী পরাশক্তির আত্মলীলা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। সর্বত্র আত্মদর্শন সিদ্ধ হয়। সবই আত্মশক্তিরই স্ফুরণ বলিয়া চিনিতে পারা যায়। জড়ত্ব, অজ্ঞান এবং কালের বিক্রম চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া যায়।

অধোদৃষ্টি সমদৃষ্টিরূপে পরিণত না হইলে জড়মুক্তি হয় না এবং সমনা-শক্তির ঊর্দ্ধে যাওয়া যায় না। তদনন্তর ঊর্দ্ধশক্তির ক্রিয়া না হওয়া পর্যন্ত উন্মনীশক্তির খেলা অনুভব করিবার উপায় নাই। অভিমানশীল জীব কোন কৌশলের দ্বারা ঐ অবস্থা লাভ করিতে পারে না। ঊর্দ্ধলক্ষ্য হইতে পারিলে যথাসময়ে উহা আসিতে বাধ্য। যাহা সত্য তাহা চাহিতে হয় না। যোগ্যতা অর্জিত হইলে এবং কালপূর্ণ হইলে তাহা না চাহিলেও পাওয়া যায়।

আপনি লিখিয়াছেন মনের অন্তর্মুখী এবং ঊর্দ্ধমুখী গতি অনুভব করি—ইহা সত্যই কিন্তু মনে রাখিতে হইবে মনের অন্তর্মুখী গতি সম্যকপ্রকারে সিদ্ধ না হইলে ঊর্দ্ধমুখী গতির পূর্ণতালাভ অসম্ভব। অন্তর্মুখী গতির উদ্দেশ্য বিচলিত মনকে একাগ্র করিয়া মনের স্বভূমিতে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করা। মনের আত্মপ্রতিষ্ঠা সিদ্ধ হইলে ঊর্দ্ধশক্তি স্বভাবতই অবতীর্ণ হইয়া ঐ স্থির মনে পতিত হয়। উহার ফলে স্থিরীকৃত মন ঊর্দ্ধমুখে আকৃষ্ট হইয়া উত্থিত হইতে থাকে।

মনের একাগ্রতা সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত বুঝিতে হইবে মনের অংশবিশেষ এখনও বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছে, এখনও সকল মন সংহত হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু ক্রিয়া চলিতেছে বলিয়া অন্তর্মুখী গতির বিরাম হয় নাই। যখন অন্তর্মুখী গতি সম্পূর্ণ হইবে তখন বাহ্য আকর্ষণ অধঃআকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণ এবং সংসর্গের প্রভাব কিছুই মনের উপর কার্য করিতে পারিবে না। ঐ অবস্থাটি না হওয়া পর্যন্ত উর্দ্ধশক্তির অবতরণ-ক্রিয়া চেতনভাবে অনুভব করিতে পারা যায় না। অবশ্য ক্রিয়া হইতে থাকে এবং তাহার ফলে মনের উর্দ্ধগতি নিষ্পন্ন হইতে থাকে কিন্তু ইহা কতকটা অসাড়ে হইয়া যায়, সম্পূর্ণ চৈতন্যের সহিত উহা সম্পন্ন হয় না। এইজন্যই আমার মনে হয়, চিত্তের অন্তঃপ্রবাহ অনেকটা সিদ্ধ হইলেও এখনও চিত্তের স্বরূপ প্রতিষ্ঠা হয় নাই। সেইজন্যই করুণাময়ী গুরুশক্তির অবতরণ সজ্ঞানে ধারণা করিতে পারিতেছেন না। জীবের নিজের কর্তব্য সমাহিত হইলে কৃপার জন্য তাহাকে বসিয়া থাকিতে হয় না। কৃপা যথাসময়ে আসিয়া থাকে। তাহাকে আহ্বান করিয়া আনিতে হয় না। অগ্নিকে আশ্রয় করিলে তাপ অথবা দাহিকাশক্তি প্রার্থনা না করিলেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঠিক সেইপ্রকার মহালক্ষ্যের দিকে চিত্ত নিবিষ্ট হইলে সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার জলের ন্যায় কৃপার অবতরণ হইয়া থাকে। কিন্তু আবার ঠিক ঠিক তৈয়ার না থাকার দরুণ উহা ধারণার যোগ্য হয় না। ভগবানের সকল বিধানই মঙ্গলময়। সুতরাং সৎপথে প্রবিষ্ট হইয়া কি হইতেছে তাহা জানিতে চেষ্টা না করিয়া সরল বিশ্বাসে তীব্র ব্যাকুলতার সহিত যথাশক্তি নিজের কর্তব্য পালন করা উচিত। বিশ্বাসের মাত্রা যে অনুপাতে প্রবল হইতে থাকে সেই অনুপাতেই পুরুষকারের সার্থকতা কমিয়া আসে। শিশুর মতন অটল বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হইলে কৃত্রিম সাধনার প্রয়োজন থাকে না। তখন জীব স্বভাবের কোলে স্থাপিত হইয়া স্বতঃপ্রেরিত ভাবে স্বভাবের খেলাতেই মাতিয়া উঠে। নিজেকে পৃথকভাবে ইচ্ছা বা চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে হয় না। নিত্য করুণাময়ী মা সন্তানের সকল ভার নিজের উপর গ্রহণ করেন। তখন শিশু যেমন একমাত্র মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে, সাধকও তেমনি বাহ্য সাধনবিহীন হইয়া একলক্ষ্যে মাতৃচরণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকে। সে দ্বিতীয় কিছু জানে না, জানিবার প্রবৃত্তিও তাহার হয় না এবং জানিবার প্রয়োজনও তাহার নাই—ইহাই কৃতকৃত্য হইবার পূর্বাভাস। যাহা করিতেছেন তাহাই মনোযোগ সহকারে করিয়া যান। সময় হইলে মায়ের ইচ্ছার সুফল অবশ্যম্ভাবী। বহু কথা বলিবার আছে, ধীরে ধীরে পরে বলিব।

যোগের নির্বিকল্প সাক্ষাৎকার। যোগ বলিতে পাতঞ্জল যোগদর্শনকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিয়া লইয়া আমি বিষয়টি পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতেই বহু প্রকার যোগের দর্শন এবং সাধন-প্রণালী প্রচলিত আছে। পাতঞ্জল যোগের ন্যায় মৎস্যেন্দ্রনাথ গোরক্ষনাথ প্রভৃতি প্রবর্তিত যোগ, হীনযানী বৌদ্ধদের যোগ, মহাযানী সম্প্রদায়ের, বিজ্ঞানবাদীদের এবং শূন্যবাদীদের অনুমত যোগ, জৈন দার্শনিক সাহিত্যে গৃহীত এবং সমালোচিত যোগ, পাশুপত যোগ, শৈব যোগ, তান্ত্রিক যোগ প্রভৃতি অসংখ্যপ্রকার যোগ সাধনার প্রণালী এবং তদনুরূপ যোগবিষয়ক দার্শনিক সিদ্ধান্ত প্রচলিত আছে।

পাতঞ্জল মতে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে সমাধি দুই প্রকার। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যেও প্রকারভেদ আছে। সমাধি হইতে প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি হয়। সমাধির তারতম্যবশতঃ প্রজ্ঞার বিশুদ্ধি সম্বন্ধেও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি গ্রাহ্য, গ্রহণ অথবা গ্রহীতাকে অবলম্বন করিয়া আবির্ভূত হয়। এক হিসাবে এই অবলম্বনকেই সমাধি-প্রজ্ঞার বিষয় বলা যাইতে পারে। তবে ইহা লৌকিক বৃত্তিজ্ঞানের বিষয়ের ন্যায় নহে। উভয়ে পার্থক্য আছে। এক হিসাবে প্রজ্ঞামাত্রই সাক্ষাৎকারাত্মক। তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারেও উৎকর্ষের ন্যূনাধিক ভাব রহিয়াছে। স্থূল অথবা সূক্ষ্মবিষয় অবলম্বন করিয়া এবং তাহা হইতে যে প্রজ্ঞার বিকাশ হয় তাহাতে সবিকল্প ও নির্বিকল্প দুইটি ভেদ আছে। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের পরস্পর সাঙ্কর্য্য থাকিলে বিকল্পের নিবৃত্তি হয় না বলিয়া ঐ জ্ঞানকে সবিকল্প জ্ঞান বলে। কিন্তু শব্দ অর্থ ও জ্ঞানের পরস্পর সাঙ্কর্য্য না থাকিলে অর্থাৎ যাহাকে যোগিগণ স্মৃতিপরিশুদ্ধি বলেন তাহা সিদ্ধ হইলে ঐ জ্ঞান নির্বিকল্পরূপে পরিণত হয়।

অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ আছে এবং জ্ঞানেরও সম্বন্ধ আছে। একটি বাচ্যবাচক ভাব এবং অপরটি বিষয়বিষয়ী ভাব। এই সম্বন্ধসূত্রে শব্দ ও জ্ঞানের সঙ্গেও সাধারণতঃ একটি সম্বন্ধ থাকে। এইজন্যই সাধারণ অবস্থায়, এমনকি সমাধিরও নিম্নাবস্থায়, জ্ঞান সবিকল্পই থাকিয়া যায়, কারণ ঐ অবস্থায় জ্ঞানের শব্দানুবিদ্ধতা নিবৃত্ত হয় না। জ্ঞান যখন সম্যক্ প্রকারে শুদ্ধ হয়, তখন তাহাতে শব্দের অনুবেধ থাকে না বলিয়া তাহা বিকল্পহীনরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য। এইজন্যই পাতঞ্জল দর্শনের নির্বিতর্ক ও নির্বিচার সমাধি-

জনিত প্রজ্ঞা নির্বিকল্প। যদি ইহাই নির্বিকল্প সাক্ষাৎকার হয়, তবে ইহা বর্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত নির্বিকল্প সাক্ষাৎকার নহে, কারণ ঐ জ্ঞান আত্মজ্ঞান নহে। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চরম উৎকর্ষ সিদ্ধ হইলে অর্থাৎ সাস্মিতা সমাধি আরম্ভ হইলে প্রজ্ঞার চরম বিকাশ সিদ্ধ হয়। এই প্রজ্ঞা একপ্রকার আত্মজ্ঞানেরই নামান্তর। কিন্তু এই আত্মজ্ঞান বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান নহে, কারণ গ্রাহ্য ও গ্রহণ উভয়ের উপসংহার হইলেও গ্রহীতারূপে সাস্মিতাতে এই জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত থাকে। অস্মিতা যে শুদ্ধ আত্মা নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং শুদ্ধ অস্মিতারূপে সম্প্রজ্ঞাত যোগের চরম উৎকর্ষজনিত জ্ঞানের উদয় হইলেও তাহাকে শুদ্ধ আত্মজ্ঞান বলা যায় না। আত্মা বা পুরুষের সহিত গুণাত্মিকা প্রকৃতির অবিবেক অস্মিতা অবস্থাতেও থাকিয়াই যায়। বস্তুতঃ ইহাই চিৎ ও অচিতের গ্রন্থি। এক হিসাবে ইহাকে হৃদয়গ্রন্থিও বলা চলে। এই গ্রন্থি মোচন না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ গুণের সহিত পুরুষের বিবেক সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত যথার্থ আত্মজ্ঞানের অভিব্যক্তি হইতেই পারে না। যখন গুরুকৃপাতে অস্মিতাগ্রন্থি ভিন্ন হইতে থাকে, তখন ইহার অন্তর্গত চিৎ ও অচিৎ উভয় অংশ অর্থাৎ পুরুষাংশ ও গুণাংশ পরস্পর বিবিক্ত হইতে থাকে। ইহাই বিবেকখ্যাতির প্রারম্ভ। দীর্ঘকাল যথাবিধি অভ্যাসের ফলে এই খ্যাতি নির্মল হইতে থাকে। এই খ্যাতিতে পুরুষের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। পুরুষ গুণ হইতে বিবিক্তরূপেই সাক্ষাৎকৃত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু গুণকে বাদ দিয়া নহে, কারণ গুণের ক্রিয়া ব্যতিরেকে পুরুষের সাক্ষাৎকার আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক। এই পুরুষ-সাক্ষাৎকার গুণবিরহিত না হইলেও অস্মিতা প্রজ্ঞারূপে আত্মজ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিষ। কারণ অস্মিতাজ্ঞানের মূলে অবিবেক বিদ্যমান থাকে, যাহাকে যোগিগণ অবিদ্যানামে আদিক্লেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু বিদ্যারূপে এই খ্যাতিতে বিবেকজ্ঞান সূচিত হইয়াছে বলিয়াই গুণ হইতে বিবিক্তরূপেই পুরুষের দর্শন হয়। যদিও এই দর্শনে গৌণভাবে গুণেও বিদ্যমান থাকে। এই সাক্ষাৎকার পুনঃপুনঃ আবৃত্ত হইতে হইতে অত্যন্ত বিশুদ্ধ হয় এবং গুণ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে। চরম অবস্থায় গুণের অর্থাৎ সত্ত্বগুণের ক্ষীণতম দশাতে যে সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহাই চরম সাক্ষাৎকার এবং তাহাই যোগীর আত্মসাক্ষাৎকার। ইহার পরক্ষণেই বস্তুতঃ ইহার ফলে অন্তিম গুণকলা অপসৃত হয় এবং সাক্ষাৎকারও আর থাকে না। তাহাই পুরুষ বা আত্মার স্বরূপস্থিতি। তখন বুঝা যায় আত্মা স্বয়ং দ্রষ্টা বা সাক্ষী, বিষয়রূপে তাহার সাক্ষাৎকার হইতেই পারে না। যদি এবং যখন তাহা হয়, তখন উহাকে গুণযুক্ত আত্মার সাক্ষাৎকারই বলিতে হইবে, গুণাতীত শুদ্ধ আত্মার নহে। এই চরম সাক্ষাৎকারের ফলেই শুদ্ধ আত্মার স্বরূপস্থিতি হয় বলিয়া উহাকেই কৈবল্যের হেতুভূত আত্মসাক্ষাৎকার বলিয়া স্বীকার করা

যাইতে পারে। বেদান্তের ব্রহ্মজ্ঞান যে ইহা হইতে বিলক্ষণ, তাহা বলাই বাহুল্য। পাতঞ্জলের উপদিষ্ট কৈবল্য অবস্থাতেও পুরুষের বহুত্ব থাকিয়াই যায়, কিন্তু বেদান্তের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলে এবং প্রারব্ধ কর্মের অবসানে যে স্থিতিলাভ হয় তাহাতে বহুত্ব থাকে না। বেদান্তের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের মূলে মহাবাক্যের বিচার, কিন্তু যোগের আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে সম্যক্‌-প্রকারে চিত্তবৃত্তির নিরোধ ভিন্ন অন্য কোন উপায়ের আবশ্যকতা হয় না। শঙ্করদর্শন সম্মত উপনিষদ-প্রতিপাদিত অপরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের বিশেষ বিবরণ আবশ্যক হইলে পরে জানাইব। অপরোক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধেও সকল সম্প্রদায়ে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। বস্তুতঃ কোন মতই অমূলক বা অপ্রামাণিক নহে, বৈচিত্র্য শুধু সাধকের অধিকারমূলক। বেদান্তের অপরোক্ষ জ্ঞানের সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা পঞ্চদশীতে পাওয়া যাইবে।

৬২

প্রকাশ ও জ্যোতি স্থূল দৃষ্টিতে একই পদার্থের বোধক প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। এই পার্থক্য বুঝিতে পারিলে জ্যোতির পরেও যে প্রকাশ আছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। অবশ্য সেই মহাপ্রকাশকেও কেহ কেহ জ্যোতি বলিয়া থাকেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমি এ স্থানে দুটিকে পৃথক ধরিয়া লইয়াই তাহাদের স্বরূপের বর্ণনা করিতেছি। পাতঞ্জল যোগের পরিভাষা অনুসারে বলিতে পারা যায়, চিৎতত্ত্ব প্রকাশ কিন্তু উহা জ্যোতি নহে। কিন্তু যাহাকে অস্মিতা বলা হয় তাহা জ্যোতি। যাঁহারা অস্মিতাকে আত্মা বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে আত্মা জ্যোতিস্বরূপ। কিন্তু যাঁহারা অস্মিতা ভেদ করিয়া শুদ্ধ পুরুষকে আত্মা বলিয়া বুঝেন, তাঁহাদের দৃষ্টিতে আত্মা প্রকাশস্বরূপ হইলেও জ্যোতি নহে। চিত্তের সহিত সত্ত্বগুণের যোগ হইলেই জ্যোতির আবির্ভাব হয়। সুতরাং জ্যোতির মধ্যেও নিত্য এবং অনিত্যরূপ ভেদ আছে। বিশুদ্ধ সত্ত্বের সহিত অর্থাৎ যে সত্ত্ব অপ্রাকৃত এবং যাহাতে রজ ও তমোগুণের লেশমাত্র নাই তাদৃশ সত্ত্বের সহিত চিত্তের যোগে যে জ্যোতির উদয় হয় তাহা নিত্য জ্যোতি, কারণ চিৎও নিত্য, বিশুদ্ধ সত্ত্বও নিত্য এবং উভয়ের যোগ বা সম্বন্ধও নিত্য। সাধারণতঃ এই মহাজ্যোতিকেই ভক্তগণ ও উপাসকগণ আপন আপন ইষ্টভাব অনুসারে বিভিন্ন নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন। বৈকুণ্ঠ, কৈলাস, চিদাকাশ,

পরব্যোম নিত্য ধ্রুবলোক প্রভৃতি বহু নামই শাস্ত্রে এবং মহাজনগণের ব্যবহারে দেখিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু যে সত্ত্বের সহিত রজোগুণ ও তমোগুণ মিশ্রিত রহিয়াছে তাহার সঙ্গে চিত্তের যোগে যে জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহা অনিত্য জ্যোতি। এই অনিত্য জ্যোতির মধ্যেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে। ভগবানের চতুষ্পাদ বিভূতির মধ্যে নিত্য জ্যোতি ত্রিপাদ বিভূতি এবং অনিত্য জ্যোতি একপাদ বিভূতি।

যদিও অনিত্য জ্যোতি হইতে পৃথকভাবে নিত্য জ্যোতির মহামণ্ডল প্রকাশিত রহিয়াছে, তথাপি মনে রাখিতে হইবে গুপ্তভাবে অনিত্য জ্যোতির অন্তরালেও নিত্য জ্যোতি রহিয়াছে।

কিন্তু নিত্যজ্যোতিই কি শেষ? তাহা নহে, কারণ জ্যোতির অতীত প্রকাশ তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। যাঁহারা আগমোক্ত সাধনায় অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন এই প্রকাশের মধ্যেও দুইটী জিনিষ রহিয়াছে। জ্যোতিতে যেমন চিত্তের সহিত সত্ত্বগুণের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তদ্রূপ প্রকাশের মধ্যেও দুইটী জিনিষের পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে। আগমবাদিগণ এই দুইটী জিনিষকে প্রকাশ এবং বিমর্শ বলিয়া থাকেন অর্থাৎ বিমর্শের সহিত যোগেই প্রকাশের প্রকাশত্ব। বিমর্শ ব্যতিরেকে প্রকাশও অপ্রকাশতুল্য। প্রকাশ শিব, বিমর্শ শক্তি।—উভয়ই চিৎস্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা সত্য যে শক্তি ব্যতিরেকে শিব শিবপদবাচ্য হন না, শুধু শব মাত্র থাকেন। প্রকাশের প্রকাশময়তা বিমর্শ সাপেক্ষ। এই বিমর্শই পরাবাক্—যাহার মহিমা অদ্বৈতাগমে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভর্তৃহরি বলিয়াছেন—"বাগ্রূপতা চেদুৎক্রামেদববোধস্য শাশ্বতী। ন প্রকাশঃ প্রকাশেত সা হি প্রত্যবমর্শিনী" অর্থাৎ প্রকাশ বা বোধের বাগ্রূপতা নিত্য সিদ্ধ অর্থাৎ প্রকাশ স্বভাবতঃই বিমর্শময়। যদি ইহা না হইত, তাহা হইলে প্রকাশ স্বরূপতঃ প্রকাশ হইয়াও প্রকাশমান্ হইতে পারিত না। Consciousness ও self-consciousness-এর মধ্যে যে প্রকার ভেদ, বিমর্শহীন প্রকাশ ও বিমর্শযুক্ত প্রকাশেও ঠিক সেইপ্রকার ভেদ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। এই প্রকাশ ও বিমর্শই বৈদিকগণের পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্ম। শব্দব্রহ্মের আশ্রয় ব্যতিরেকে পরব্রহ্মের স্বরূপসত্তাও সিদ্ধ হয় না। পরব্রহ্মের স্বয়ংপ্রকাশতার মূলেই নিত্যসিদ্ধ শব্দব্রহ্মের এই মহিমা রহিয়াছে।

২৮. ৯. ৪৫

প্রকাশরূপ ও স্ফুরণরূপ মূলতঃ উভয়ই অভিন্ন। কারণ স্ফুরণ প্রকাশের স্বভাব। স্ফুরত্তাই প্রকাশের প্রকাশমানতা। অর্থাৎ যাহাকে আমরা চিৎ এবং অচিৎ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকি তাহা বস্তুতঃ একই অখণ্ড মহাসত্তা ব্যতিরেকে অপর কিছুই নহে। সেই মহাসত্তাতে বিমর্শ অথবা স্বাত্মপরামর্শ-রূপ যে স্বাভাবিক ধর্ম আছে তাহার প্রভাবে সেই সত্তা চিৎরূপে বর্ণিত হইবার যোগ্য হয়। বস্তুতঃ সত্তের স্ফুরণই চিৎ এবং চিতের স্ফুরণই আনন্দ। আনন্দ হইতে স্ফুরণ পরিহার করিলে (যদিও পরিহার কার্যতঃ সম্ভবপর নহে) যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই চিৎ। তাহা অনুকূল অথবা প্রতিকূল কিছুই নহে, অথচ প্রকাশমান। সুখ ও দুঃখ হইতে অনুকূলতা ও প্রতিকূলতা বিশ্লেষণপূর্বক পৃথক করিয়া লইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা স্বয়ংপ্রকাশ চিদ্ভাব মাত্র। বস্তুতঃ স্ফুরত্তা পূর্ণভাবে বিশ্লিষ্ট হইলে চিদ্ভাবও থাকে না। তাহাই অপ্রাকৃত সদ্ভাব। এই অপ্রাকৃত সত্তা যোগী সাক্ষাৎকারেরও অগম্য। বস্তুতঃ ইহাকে ঠিক ঠিক সৎও বলা যায় না, কেননা তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ বিমর্শের প্রভাব অঙ্গীকার করিতে হয়। তথাপি আস্তিক দৃষ্টি অনুসারে ইহাকে অস্তি বলিয়াই নির্দেশ করিতে হইবে। নতুবা মিথ্যার অধিষ্ঠানরূপী স্থির সত্যের প্রতিষ্ঠা থাকে না।

প্রকাশ বিমর্শবশতঃ নিজেকেই নিজে প্রকাশ করে। ইহাই প্রকাশের আত্মবিশ্রান্তি। সৃষ্টির পূর্বাবস্থায় ইদংরূপে আভাসের পূর্বে বিশুদ্ধ অহং ভাবের সত্তা নিত্যসিদ্ধরূপে স্বীকার করিতে হয়। এই অহংভাব ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিণামভূত অস্মিতার নামান্তর নহে। অস্মিতা এবং তাহার কার্যভূত অহংকার উভয়ই এই পূর্ণ অহন্তা হইতে ভিন্ন। অহংকার নিবৃত্ত হইয়া গেলেও অস্মিতা থাকে কিন্তু মনে রাখিতে হইবে অস্মিতাও প্রকৃতির পরিণাম মাত্র। অস্মিতা গ্রন্থিরূপ। সাধারণতঃ অহংকার গ্রন্থিরূপে বর্ণিত হয়। অস্মিতার কার্য্যরূপী অহংকার স্থূলগ্রন্থি, অস্মিতা সূক্ষ্ম গ্রন্থি। সুতরাং চিদাত্মক পুরুষ এবং গুণময়ী প্রকৃতি এই দুইটিকে পরস্পর বিবিক্ত করিয়া ধরিতে না পারিলে পুরুষ স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। সত্ত্বগুণ এবং পুরুষ পৃথক হইলেও অবিবেকবশতঃ অপৃথকরূপে প্রতীত হয়। ইহাই অস্মিতা। কিন্তু যাহাকে অহন্তা বলিয়া বা স্ফুরত্তা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা দুইটি পৃথক পদার্থের অবিবেকজনিত তাদাত্ম্যভ্রম নহে। গুণ ও পুরুষ যেরূপ পরস্পর ভিন্ন, প্রকাশ এবং বিমর্শ ঠিক সেইপ্রকার ভিন্ন নহে। গুণ ও পুরুষ ভিন্ন বলিয়াই বিবেকজ্ঞান প্রভাবে উভয়ের অভিন্নতা ভ্রম নিবৃত্ত হইয়া যায়। কিন্তু

প্রকাশ ও বিমর্শ তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে পরস্পর ভিন্ন নহে বলিয়া পূর্ণ অহন্তা কখনই বিশ্লিষ্ট হইয়া অহংভাবের নিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। এই অহংভাবই আত্মভাব, ইহা অস্মিতাও নহে অহংকারও নহে। প্রকাশ ও বিমর্শ অবিনাভূত না হইয়া প্রকৃতি-পুরুষের ন্যায় পৃথক পদার্থ হইলে আত্মভাবের অহংরূপতা নিত্যসিদ্ধরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য হইত না। প্রকাশের স্বরূপভূতা শক্তিই বিমর্শ। এই শক্তি স্বরূপভূতা বলিয়া কোন সময়ে প্রকাশ হইতে ইহার অপায় ঘটিতে পারে না। এইজন্যই প্রকাশ নিত্যই স্বপ্রকাশ। বস্তুতঃ শিবশক্তির নিত্য অবিনাভাব অথবা সামরস্য বহিরঙ্গ দৃষ্টিতে স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা গুহ্য উপাসনার পথে না যাইয়া শুধু বিচারের দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় করিতে প্রয়াস পান তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্বে সামরস্য দেখিতে পান না এবং পূর্ণ অহংভাবের সত্তাও উপলব্ধি করিতে পারেন না। কারণ স্বীয় স্বভাব সহিত প্রকাশকে গ্রহণ করিতে না পারিলে ইহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। ইহা সত্য যে অস্মিতা ও অহংকারের যে প্রকার ভেদ আছে, প্রকাশ ও বিমর্শে সেইপ্রকার ভেদ নাই। বরং মুক্ত পুরুষ ও অস্মিতাতে যে প্রকার ভেদ, প্রকাশ ও বিমর্শে কতকটা সেইপ্রকার ভেদ প্রতীত হয়। কতকটা এইজন্য বলিলাম, যেহেতু অস্মিতার মূলে অবিবেক রহিয়াছে, কিন্তু বিমর্শ অথবা অহন্তার মূলে তাদৃশ অবিবেক বর্তমান নাই। প্রকাশও চিদ্‌রূপ, বিমর্শও চিদ্‌রূপ। উভয়ে স্বরূপগত কোন বৈলক্ষণ্য নাই, তথাপি এক হিসাবে বলিতে গেলে বলিতে পারা যায় প্রকাশ ধর্মী, বিমর্শ ধর্ম। পক্ষান্তরে অবস্থাভেদে লক্ষ্য করিয়া ইহাও বলা যায় যে কখনো কখনো বিমর্শ হয় ধর্মী, প্রকাশ হয় ধর্ম। এই ধর্ম-ধর্মীভাবের মূলে অবিবেক নাই—নাস্ত্যেব সা চিদপি যদাবিস্পষ্টরূপা। ধর্মস্ততো ভবতি চিচ্চ বিমর্শশক্তেঃ। অথবা, "ধর্মে স্বকে স্বরসবাহিনী যাক্ স্বরূপে লয়ং পরং গগনমপ্যুপযাতি সত্তাং। সত্তায় নিতামুপগূঢ়বিমর্শতত্ত্বং তদ্ধর্মতাং গগনমপ্যুপযাতি চিত্রম্।" কিন্তু এইপ্রকার সম্বন্ধ পুরুষের সহিত গুণের অথবা অস্মিতার সম্ভবপর হয় না কারণ পুরুষ চিদাত্মা, গুণ অচিদাত্মক। অবিবেক ভিন্ন উভয়ে তাদাত্ম্যপ্রতীতি ঘটিতে পারে না। পক্ষান্তরে, প্রকাশ ও বিমর্শ অভিন্নস্বরূপ বলিয়া—উভয়ে স্বাভাবিক তাদাত্ম্য রহিয়াছে। নিত্য-সিদ্ধ স্বয়ংপ্রকাশ আত্মভাবের ইহাই মূল। যাবতীয় মন্ত্রবিজ্ঞান ও মাতৃকা-রহস্য ইহারই উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই যে প্রকাশ ও বিমর্শের অবিনাভাবরূপ যামল সত্তার কথা বলা হইল ইহার অতীত অবস্থাও আছে। কিন্তু তাহা শব্দের অতীত, সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন।

•

পাতঞ্জল সম্প্রদায়ের যোগিগণ বাহ্য ও আভ্যন্তর বৃত্তির ন্যায় স্তম্ভবৃত্তি নামক একটি বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। বাহ্যবৃত্তি ঠিক রেচক নহে এবং আভ্যন্তর বৃত্তিও ঠিক ঠিক পূরক নহে। উভয়ত্রই বায়ুর নিরোধ উদ্দিষ্ট। আকুঞ্চন ও প্রসারণ এই উভয়প্রকার ব্যাপারের ফলে আভ্যন্তর এবং বাহ্য উভয়প্রকার বৃত্তি সম্ভবপর হয়। দৃষ্টিভেদে ইহাকেই বিপরীত করিয়াও গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু বায়ুর ধারণা ধারকপ্রযত্ন ভিন্ন সম্ভবপর নহে। রেচক প্রযত্নের পর ধারক প্রযত্ন দ্বারা বহিরাকাশে বায়ুকে রোধ করা হইয়া থাকে। তদ্রূপ পূরক প্রযত্নের পর অর্থাৎ যে প্রযত্নের ফলে পূরণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় তাহার পর ধারক প্রযত্নের প্রভাবে অন্তরাকাশে বায়ুকে স্থির করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই উভয়প্রকার নিরোধ যথার্থ স্তম্ভস্বরূপ নহে। যথার্থ স্তম্ভ সিদ্ধ করিতে হইলে যুগপৎ রেচক ও পূরক উভয়বিধ ক্রিয়ার অভাব করা আবশ্যক।

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। প্রাকৃতিক নিয়মে বহির্গতির পর অর্থাৎ বহির্গতি পরিসমাপ্ত হইলে পর অন্তর্গতির সূত্রপাত হয়। তদ্রূপ অন্তর্গতির পর অর্থাৎ অন্তর্মুখী গতি সমাপ্ত হইবার পর বহির্মুখী গতি আরব্ধ হয়। কিন্তু বহির্গতির অবসান এবং অন্তর্গতির প্রারম্ভ, এই উভয়ের মধ্যে একটি স্থিতিবিন্দু আছে। তদ্রূপ অন্তর্গতির অবসান এবং বহির্গতির আরম্ভ, এই উভয়ের মধ্যেও আর একটি স্থিতিবিন্দু আছে। ঐ স্থিতিবিন্দুতে বায়ু অস্তমিত থাকে বলিয়া অর্থাৎ আপেক্ষিক দৃষ্টিতে থাকে বলিয়া আকাশ-তত্ত্বের স্ফুরণ হয়। যে আকাশ সর্বত্র সমরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে তাহাকে গতি সাহায্যে প্রাপ্ত হইতে হইলে, হয় তাহাকে বহিরাকাশরূপে অথবা তাহাকে অন্তরাকাশরূপে প্রাপ্ত হইতে হয়। রেচক ক্রিয়ার পরে বায়ুর যে স্থিতি তাহাকে বুঝিবার সুবিধার জন্য বহিরাকাশের স্থিতি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তদ্রূপ পূরক ক্রিয়ার পরে যে স্থিতি তাহাকে অন্তরাকাশে স্থিতি বলিয়া গ্রহণ করা যায়। এই উভয় স্থিতি স্বভাবসিদ্ধ। সাধনা দ্বারা স্থিতিকালকে বাড়ান যায় মাত্র কিন্তু মনে রাখিতে হইবে এই দুইটা স্থিতির কোনটাই সাম্যভাব নহে, কারণ বহিরাকাশে স্থিতির পর অন্তর্মুখী গতি অরম্ভ হইবেই, তদ্রূপ অন্তরাকাশে স্থিতির পরও বহির্মুখী গতি না হইয়া পারে না। এই উভয় স্থিতিতেই ভবিষ্যৎ বিপরীত গতির একটি সংকল্প সংস্কার থাকে।

কিন্তু স্তম্ভবৃত্তি এইপ্রকার নহে। স্তম্ভবৃত্তিতে মহাকাশে স্থিতি হয়। ইহার মূলে ধারক প্রযত্ন আছে তাহা সত্য, কিন্তু তাহার সহকারীরূপে রেচক প্রযত্নও নাই, পূরক প্রযত্নও নাই। সাধক যে কোন সময়ে, প্রাণগতির যে কোন অবস্থায়, খেয়াল হইলেই ঠিক সেই অবস্থায় স্থির থাকিতে পারেন। প্রাণের গতি রেচকরূপেই হউক বা পূরকরূপেই হউক—যতটুকু তখন হইয়া ছিল সেইখানেই তাহা কিয়ৎকালের জন্য নিবৃত্ত হইয়া যায়। এই স্তম্ভবৃত্তির মূল প্রযত্নকে মহাধারক প্রযত্ন বলা যায়। ইহা একটি অদ্ভুত রহস্য। এই প্রযত্নের প্রভাবে একই ক্ষণে সর্বতোমুখী সঙ্কোচ শক্তির ক্রিয়া হইয়া থাকে। সুতরাং অন্তর্মুখে এবং বহির্মুখে নিরোধ সিদ্ধ করিবার জন্য পৃথক প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না। একই প্রযত্নের দ্বারা সকল প্রকারের গতি সমরূপে শুদ্ধ হইয়া যায়। এই অবস্থায় যে আকাশ ফুটিয়া উঠে তাহা অন্তরাকাশও নয়, বহিরাকাশও নয়, তাহাকে মহাকাশ বলা যাইতে পারে—যাহা আন্তর এবং বাহ্য উভয় আকাশেই সমরূপে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এইজন্য যথার্থ সাম্যভাব এইখানেই সম্ভবপর। কৈবল্য ও প্রকৃতিলয়ে যে প্রকার ভেদ—এই সাম্যরূপী মহাকাশে বায়ুর স্তম্ভন এবং অন্তরাকাশ এবং বহিরাকাশে বায়ুর স্তম্ভনেও সেইপ্রকার ভেদ।

যে মহাপ্রযত্নের প্রভাবে এই সর্বতোমুখী সংকোচ শক্তি ক্রিয়া করে, আগম শাস্ত্রে তাহার পারিভাষিক নাম 'উদ্যম'। শিবসূত্রে 'উদ্যমো ভৈরবঃ" বলিয়া প্রকারান্তরে ইহারই বর্ণনা করা হইয়াছে।

পূর্বে বহিরাকাশ বা অন্তরাকাশে গতির অবসান এবং বহিরাকাশ বা অন্তরাকাশ হইতে অভিনব গতির সূচনার কথা বলা হইয়াছে। এই দুইটি আকাশ বিন্দুস্বরূপ, এইজন্য উভয় গতির সন্ধিস্থলে ইহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু যে মহাকাশের কথা আমি উল্লেখ করিলাম তাহা যে কোন গতির মধ্যে যে কোন ক্ষণে ধরিতে পারা যায়। অর্থাৎ গতির মধ্যে স্থিতিকে দেখিবার ইহাই কৌশল। গতি ছাড়াইয়া স্থিতি নাই। গতির আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সর্বত্রই অখণ্ড স্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে কিন্তু তাহাকে বাহির করিতে হইবে। ইহারই জন্য মহাপ্রযত্ন বা উদ্যম। ইহা একবার ভিন্ন দুইবার করিতে হয় না। কেননা একই প্রযত্নে অনন্ত গতির অবসান হইয়া যায় এবং শুদ্ধ স্থিতিকে লাভ করা যায়। শুধু স্থিতিকালকে বাড়াইয়া পরম লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। অভ্যাসের প্রয়োজন তখনও রহিয়াছে—কারণ পুনঃ পুনঃ অনুশীলন না করিলে সাম্য স্থিতিটাও স্থায়ী হয় না। কিন্তু বহু প্রযত্নের আবশ্যকতা নাই, একই প্রযত্নের দ্বারা গতিমাত্রেরই মধ্যে স্থিতি আবিষ্কৃত হইতে পারে। গীতাতে "কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ" বলিয়া যে কর্মের মধ্যেই অকর্ম সাক্ষাৎকারের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও এক হিসাবে ইহারই

অনুরূপ। অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়কে পাইতে হইলে ক্রিয়াসমাপ্তির প্রয়োজন নাই, কারণ ক্রিয়াসমাপ্তি আপেক্ষিক। শুধু তাহাই নহে, ক্রিয়াসমাপ্তির পরে যে নিষ্ক্রিয়তা তাহাও আপেক্ষিক। কারণ তাহার পরেই বিপরীত ক্রিয়ার সূচনা হইয়া থাকে। এইজন্য ক্রিয়ার যে কোনো অবস্থায় নিষ্ক্রিয়কে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। ইহাই সাম্য সাধনার প্রধান লক্ষ্য।

ক্ষণ ও কালে যে ভেদ আছে তাহা যোগিগণ অনুভব করিয়া থাকেন। কাল বৌদ্ধ পদার্থ কিন্তু ক্ষণটি বাস্তবিক। কিন্তু ব্যুত্থিত অবস্থায় ক্ষণের সন্ধান পাওয়া যায় না —কালেরই গ্রহণ হইয়া থাকে। কালের মধ্যে কালের অবসান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একদিকে অনাদি এবং অপরদিকে অনন্ত—সাধকের বুদ্ধি অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় না। কিন্তু বৃত্তিকে সংকোচ করিয়া যদি মহা উদ্যমে ক্ষণকে সাক্ষাৎকার করিতে পারে তাহা হইলে একই ক্ষণে অনন্ত কালের দর্শন পাওয়া যায়। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল সম্মিলিতরূপে এক মহাকাল হইয়া আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ক্রমশঃ ক্রমকে আশ্রয় করিয়া কালের সমাপ্তি করা ক্ষুদ্র পক্ষীর চঞ্চুপুটে সমুদ্রশোষণের ন্যায় উপহাসাস্পদ। 'একস্মিন এব ক্ষণে সর্বং জগৎ পরিণামমনুভবতি' ইহাই যোগিগণের সিদ্ধান্ত। ঠিক তদ্রূপ একই মহাপ্রযত্নে মহাকাশে স্থিতিলাভ হইয়া থাকে, ইহার জন্য প্রাণাপানের গতিবিচ্ছেদের আবশ্যকতা হয় না।

২. ১০. ৪৫

একপ্রযত্নের দ্বারা বাচ্য ও বাচকের যুগপৎ বিলাপন—ইহা একটী অদ্ভুত ব্যাপার। বাচ্য ও বাচক এই উভয় ভাব নিবৃত্ত হইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা ভাবাতীত পরব্রহ্ম। যেমন যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে যে প্রাণ ও মনের পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবশতঃ একটিকে কোন কৌশলে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে যুগপৎ উভয়ের নিরোধ হয়, ঠিক তদ্রূপ বাচ্য ও বাচক সম্বন্ধেও জানিতে হইবে। যোগ্যতা ও অধিকারের তারতম্য অনুসারে কেহ প্রাণকে রোধ করিয়া এবং অপর কেহ মনকে রোধ করিয়া উভয় রোধরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন। বাচ্য ও বাচক এই উভয় ভাবের নিবৃত্তিও একই প্রযত্নের দ্বারা একই সময়ে হইয়া থাকে। এই প্রযত্নটীর স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইলে বাচ্য ও বাচকের আবির্ভাব কি প্রকারে হয় তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে। আগম শাস্ত্রে ইহা স্পষ্টরূপে আলোচিত হইয়াছে। বিন্দু অথবা চিদাকাশে যখন পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যবশতঃ চিৎশক্তি পতিত হয়—তখন ইহা বিক্ষুব্ধ হয়। এই বিক্ষোভ হইতেই একদিকে বাগাত্মক শব্দ এবং অপরদিকে অর্থ আবির্ভূত হইয়া থাকে। শব্দের ধারা প্রবর্তিত হইয়া স্তরে স্তরে স্থূলত্বের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে অর্থের ধারাতেও তাহাই হয়। এই দুইটি ধারা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়—তাহাতে সন্দেহ নাই এবং উভয়ের সঙ্গে বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে। শব্দ বাচক, অর্থ বাচ্য। বাচ্য-বাচক ভাবটী স্বাভাবিক। কিন্তু মায়িক জগতে কৃত্রিম বাচ্য-বাচক ভাবও আছে। মায়াতীত বাচ্য-বাচক ভাবে পরস্পর সাপেক্ষতারূপে স্বাভাবিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। সংকেতের দ্বারা ঐ সম্বন্ধই ব্যবহার জগতে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। শব্দ ও অর্থ নিত্য সম্বন্ধ বলিয়াই. যখন প্রবৃত্তি হয় তখনও যেমন উভয়ের যুগপৎ প্রবৃত্তি হয় তেমনি নিরোধকালেও উভয়ের যুগপৎ নিরোধই হইয়া থাকে। ব্যবহারভূমিতে শব্দ হইতে অর্থ বা অর্থ হইতে শব্দ কোন কোন বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ হইতে কেহ কেহ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন ও করিতেও পারেন। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে শব্দ ও অর্থের প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয়ই যুগপৎ। খণ্ড সাধনার দিক হইতে একটী ক্রম স্বীকৃত হইয়া থাকে কিন্তু বস্তুতঃ এ ক্রমও কল্পিত।

কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। পূর্বেই বলা হইয়াছে চিৎশক্তি দ্বারা বিন্দু ক্ষুব্ধ হইলে বিন্দু হইতে শব্দ এবং অর্থ উভয়ই আবির্ভূত হয়।

শব্দ ও অর্থ উভয়েরই মূল উপাদান বিন্দুই—অপর কিছু নহে। এইজন্য উভয়ে আত্যন্তিক ভেদ স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না। দেবতা মন্ত্রাত্মিকা —যেমন মীমাংসকগণ বলেন অথবা বিগ্রহাত্মিকা যেমন বেদান্তাদি শাস্ত্র বলেন —এই প্রশ্নের আলোচনা করিতে গেলে বিন্দু তত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান হইতে ইহার মীমাংসা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। কারণ, মন্ত্র বিন্দুরই পরিণাম এবং বিগ্রহও বিন্দুরই পরিণাম। যাহা একপক্ষে মন্ত্ররূপে প্রতীত হয়, তাহাই অপরপক্ষে বিগ্রহরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। অর্থাৎ একদিকে যাহা শব্দ, অপরদিকে তাহাই অর্থ। চিৎশক্তি বিন্দুতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বিন্দুরূপ উপাদান হইতেই শব্দ এবং অর্থ উভয়ই রচনা করিয়া থাকে। ব্রহ্মরূপী শুদ্ধ চৈতন্যতত্ত্বে স্থিতিলাভ করিতে হইলে বিন্দুর অতীত হইতে হইবে। বেদান্তের মায়াকে মহামায়ারূপে বুঝিতে পারিলেই এই জটিল রহস্যটী উদ্ঘাটিত হইতে পারে। চিৎশক্তির সকৃৎ প্রযত্নের দ্বারা যেমন বিন্দু-ক্ষোভকে দ্বার করিয়া শব্দ ও অর্থ অর্থাৎ নাম ও রূপ অর্থাৎ বাচক ও বাচ্য— উভয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে, ঠিক তদ্রূপ চিৎশক্তির সকৃৎ প্রযত্নের দ্বারাই বিন্দুর নিরোধ দ্বারা এবং শব্দার্থ সৃষ্টির উপসংহারপূর্বক বিন্দ্বতীত পরব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি হইতে পারে। যে শক্তি বিন্দুকে ক্ষুব্ধ করে এবং সৃষ্টি উন্মুখ করে সেই শক্তিকে ঊর্দ্ধ্ব আকর্ষণবলে উপসংহার করিলে বিন্দু ক্ষোভহীন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে শব্দ ও অর্থের অর্থাৎ বাচক ও বাচ্যের নিবৃত্ত হইয়া যায়। চিৎশক্তির উন্মেষ যদি ক্ষোভ হয়, তাহা হইলে নিমেষে ক্ষোভনিবৃত্তি হয়। উন্মেষ যেমন একপ্রযত্ন নিমেষও তেমনি একই প্রযত্ন; অর্থাৎ বিন্দু হইতে সঙ্কোচপূর্বক চিৎশক্তিকে আকর্ষণ করিয়া লইলেই মুহূর্তের মধ্যে নামরূপাত্মক সমগ্র জগৎ অস্তমিত হইয়া যায়, কারণ বিন্দুর ক্ষোভ না থাকিলে সৃষ্টিরূপী জগৎ কোথায় থাকে ?

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এ প্রযত্ন কে করে অথবা কে করিতে পারে ? এই প্রযত্নটি সাধারণ জীবের লৌকিক প্রযত্ন নহে—ইহা বলাই বাহুল্য। কারণ জীবের লৌকিক প্রযত্নের দ্বারা বিন্দু কম্পিত হয় না, চিদাকাশ ধ্বনিত হয় না। বস্তুতঃ বিন্দু জীবদৃষ্টির গোচরও নহে এবং কোন বিশিষ্ট প্রণালীতে গোচরীভূত হইলেও জীবপ্রযত্ন বিন্দুকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না। জীবভাবের অন্তরালে যে শিবভাব রহিয়াছে এই প্রযত্ন তাঁহারই; এবং এই প্রযত্ন তাঁহার উদ্যমরূপী ভৈরবাবস্থা। প্রতি জীবেই এই সামর্থ্য আছে, কিন্তু জীবে নহে শিবে। তীব্র পুরুষকাররূপে উহা অভিব্যক্ত হইলে উহা সত্য সংকল্পরূপেই অমোঘ হইয়া প্রকাশমান হয়। পৃথক পৃথক প্রযত্নের দ্বারা অনন্ত শব্দ ও অনন্ত অর্থকে রোধ করিবার চেষ্টা করিতে হয় না। যে বহির্মুখ বিরাট প্রযত্নে মহাসৃষ্টির আবির্ভাব হয় ঠিক সেইরূপ অন্তর্মুখ বিরাট প্রযত্নে মহাসৃষ্টির

উপসংহার হয়। একটী একটী করিয়া ক্রম অবলম্বনপূর্বক ধীরে ধীরে ভাঙ্গিতে হয় না। কালের সহিত কালিক সৃষ্টি সেই মহা আকর্ষণে গুটাইয়া আসে।

পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, যখন অভিধান ও অভিধেয়ের যুগপৎ বিলাপন আবশ্যক তখন তাহা পৃথক প্রযত্ন দ্বারা নিষ্পন্ন হয় না, একই প্রযত্নের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। অভিধান ও অভিধেয়রূপ ভাবদ্বয়ের বিলোপ সিদ্ধ হইলে একমাত্র ভাবাতীত পরমসত্তাই বিরাজ করেন। তাহাই পরব্রহ্ম—যাহা শব্দ ও অর্থ উভয়ের অতীত।

২৫. ৯. ৪৫

৬৬

আপনি আমাদের সম্প্রদায়গত কর্মকাণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। কর্মকাণ্ড শব্দে আপনি সাধন পদ্ধতি লক্ষ্য করিয়াছেন মনে করিয়া আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। কারণ লৌকিক কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের সম্প্রদায়-গত বিধিনিষেধ কিছুই নাই। সাধন পদ্ধতিটী লোকোত্তর, সুতরাং ইহাকে কোন বিশেষ ধারার অন্তর্গত বলিয়া মনে করা যায় না, অথচ ভারতীয় সাধনার মুখ্য ধারার বিশেষ ধর্মসকল ইহাতে লক্ষিত হয় বলিয়া ইহাকে কোন ধারার সহিত সম্বন্ধহীন বলাও চলে না। ইহা মূলতঃ নিগম ও আগম অর্থাৎ বৈদিক ও তান্ত্রিক সাধনা উভয়েরই সহিত সংশ্লিষ্ট। ব্রহ্মগায়ত্রী, বর্ণবিচার এবং বৈদিক যুগের ব্রাহ্মণ আদর্শের পূর্ণরূপে অঙ্গীকার, যথাবিধি সন্ধ্যা উপাসনা প্রভৃতি বৈদিক সাধনার মূল আমাদের সাধনধারার অন্তর্দেশে লক্ষিত হয়। পক্ষান্তরে দীক্ষা, বীজমন্ত্রের, গুরুতত্ত্বের ও ইষ্টতত্ত্বের বিন্যাস এবং আনুষঙ্গিক সাধনপদ্ধতি মূলতঃ আগমসম্মত। অথচ যে ক্রমানুসারে বৈদিক সমাজে আশ্রমসমূহ পরম্পর অঙ্গীকৃত হইত, জ্ঞানগঞ্জের প্রণালীতে সেই ক্রম সর্বথা অনুসৃত হয় না। কারণ ব্রহ্মচর্য" দণ্ডগ্রহণ, সন্ন্যাস, তীর্থস্বামী অবস্থা, পরমহংসাবস্থা এবং কেবলী অবস্থা—এই ক্রমটি তো শ্রীগুরুদেবের জাগতিক এবং প্রকট জীবনের মধ্য দিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাই। ইহা যে ঠিক

বৈদিক নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ বৈদিক ধারায় ব্রহ্মচর্যের পর গৃহস্থাশ্রম এবং তাহার পর বনবাস ও সর্বশেষে সন্ন্যাস। পরমহংসাবস্থা সন্ন্যাসেরই অন্তর্গত অথবা অত্যাশ্রমী অবস্থাও বলা যায়। কিন্তু জ্ঞানগঞ্জের ধারাতে ব্রহ্মচর্যের পর এবং দণ্ড গ্রহণের পর সন্ন্যাস। সন্ন্যাস অবস্থা উত্তীর্ণ হইলে তীর্থস্বামী অবস্থায় গৃহধর্মে অধিকার জন্মে। তাহার পর পরমহংস অবস্থা। ইহার গূঢ় রহস্য আছে, এখানে তাহা লিখিবার প্রয়োজন নাই। এইভাবে বুঝিতে পারিবেন কোন কোন অংশে বৈদিক ধারার সহিত কিঞ্চিৎ পার্থক্যও আছে। সেইরূপ কোন কোন অংশে তান্ত্রিক ধারার সহিতও ভেদ লক্ষিত হয়। কারণ, আমাদের সাম্প্রদায়িক দীক্ষা ব্যাপারে প্রচলিত হোমের কোন স্থান নাই—অথচ হোম আছে। অগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপ করিতে হয় না। যে পাঁচ ছটাক ঘৃত আবশ্যক হয় তাহা কুমারীকে অর্পণ করিতে হয়। কুমারীই অগ্নিস্বরূপ। এইজন্য দীক্ষাকালে অনাদি কুমারী শক্তি পূর্বোক্ত ঘৃত এবং বস্ত্র গ্রহণ করিলে দীক্ষা সফল বুঝিতে হইবে। সাধারণতঃ তান্ত্রিক সাধনায়ও কুমারী পূজার স্থান আছে এবং ইহার মাহাত্ম্যও কীর্তিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ কুমারীর প্রসাদ গ্রহণ করা হয় না, পরন্তু আমাদের সাধনায় ইহাই মুখ্য। জগন্মাতা সধবারূপে এবং কুমারীরূপে পূজিতা হইয়া থাকেন। সধবা রূপটি জীব ও মায়িক জগতের মাতৃস্বরূপ কিন্তু কুমারী রূপটি শিব ও মহামায়া জগতের মাতৃস্বরূপ। ইহা হইতেই বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারিবেন।

কুণ্ডলিনী সম্বন্ধে প্রয়োজন হইলে পরে লিখিব।

৩১. ১০. ৪৫

৬৭

জপের কৌশল সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে। যে কোন প্রকার কৌশলই অবলম্বন করা হউক সবই দুইভাবে বিভক্ত হইবার যোগ্য। তন্মধ্যে একভাগ প্রাণের ক্রিয়ার সহিত সংপৃক্ত এবং অপর ভাগ সেই ক্রিয়ার উপদর্শনের সহিত। প্রাণের ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধভাবে চলিতেছে, কিন্তু জপটি প্রথমাবস্থায় স্বভাবসিদ্ধ ভাবে চলে না—চেষ্টা দ্বারা উহা সম্পন্ন করিতে হয়। চেষ্টার মূলে কৃতিসাধ্যতা জ্ঞান রহিয়াছে। প্রযত্নপূর্বক জপ করিতে করিতে জপটি প্রযত্ননিরপেক্ষ হইয়া পড়ে। তখন প্রাণের স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়ার সহিত উহা গ্রথিত হইয়া যায়। যে সকল উপায়ে এই কৃত্রিম প্রক্রিয়া হইতে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে প্রবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর, তাহার বিশেষ বিবরণ এই পত্রে অনাবশ্যক।

তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে কৃত্রিম সাধনার সময়েও যদি ঐ সাধনায় উপদ্রষ্টাভাবে নিজেকে নিয়মিতভাবে কিছু সময়ের জন্য স্থাপনা করা যায়, তাহা হইলে সাধনার কৃত্রিমতা অবিলম্বে তিরোহিত হইয়া স্বভাবসিদ্ধ প্রাণের ধারাতে পরিণত হইতে পারে। প্রথমাবস্থায় উপদর্শনের মুখ্য করণ মনই থাকিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহা চিদালোকে আলোকিত মন, সুপ্তবৎ অসাড় মন নহে। চিদালোক কোন বিশিষ্ট সাধনসাপেক্ষ নহে। সংযম ও দৃঢ়তার সহিত প্রাণের ক্রিয়ার দিকে নিরন্তর অচল লক্ষ্য রাখিতে পারিলে জাগ্রত মনের সন্ধান পাওয়া কঠিন নহে। মনকে জাগাইয়া রাখাই উহাকে চৈতন্যের আলোকে আলোকিত করা। কিন্তু মন বিষয়হীন হইয়া জাগিয়া থাকিতে পারে না। নিরালম্ব অবস্থায় মন অব্যক্ত হইয়া পড়ে। বর্তমান স্থানে প্রাণের ক্রিয়াই মনের আলম্বন। ঐ ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ হউক অথবা জপাদির প্রাথমিক অবস্থার ন্যায় কৃত্রিম হউক তাহাতে কিছু আসে যায় না। সুনিয়ন্ত্রিত মনের তীক্ষ্ণ লক্ষ্যের সম্মুখে প্রাণক্রিয়া সহজেই কৃত্রিমতা পরিহার করে এবং স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়াও অনতিবিলম্বে মন্দীভূত হয়। চিৎশক্তির উন্মেষ না হইলে এবং এই প্রক্রিয়া কিছুদিন পর্যন্ত অভ্যস্ত না হইলে প্রাণের স্বাভাবিক ক্রিয়াও স্তম্ভিত হওয়ার ন্যায় নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া প্রতীতি জন্মে। লৌকিক দৃষ্টিতে উহা প্রাণাপানের সাম্যস্থাপক কুম্ভক বলিয়াই মনে হইবার কথা। ঐ অবস্থায় একটি প্রশান্ত ভাবের উদয় হয়। তখন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, প্রাণের ক্রিয়া এবং মনের ক্রিয়া—তিনটিই উপরত হইয়া নিষ্ক্রিয় আত্মার শুদ্ধ দৃক্‌শক্তি প্রকাশমান হয় ও আপনাতে আপনি বিশ্রাম করে। এই অবস্থা স্থায়ী না হইলেও দীর্ঘকালের অভ্যাসে ইহা স্থায়ীরূপে পরিণত হইতে পারে। ইহা শান্তির অবস্থা—যাহা সুখ-দুঃখের অতীত, জাগতিক সর্বপ্রকার পুরুষার্থের অতীত এবং দুঃখনিবৃত্তি ও মুক্তির সমপর্যায়ভুক্ত।

কিন্তু ইহা দিব্যাবস্থা নহে। ঐ যে চিৎশক্তির উন্মেষের কথা বলিলাম উহার অভাবে দিব্যাবস্থার বিকাশ হইতে পারে না। চিৎশক্তির বিকাশ হইলে কুম্ভক আর কুম্ভক থাকে না। সৃষ্টি ও সংহাররূপ স্বভাবের ক্রিয়া পূর্ববৎ চলিতে থাকে। কিন্তু এই নিত্য ক্রিয়ার মধ্যেই স্থিতিরূপ নিষ্ক্রিয় সত্তা জাগিয়া উঠে। চিৎশক্তির উন্মেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রাণের ক্রিয়া বা প্রকৃতির খেলা অস্তমিতই থাকে। কিন্তু চিৎশক্তি জাগিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়—লীলাতীতের মধ্যেই নিত্য লীলা চলিতেছে। তখন একাধারে কুম্ভকও থাকে অথচ রেচক পূরকও চলিতে থাকে। উভয়ের মধ্যে আপাত প্রতীয়মান বিরোধ নিবৃত্ত হইয়া যায়। ঐ অবস্থায় আত্মস্বরূপের মধ্যেই সর্বভূতের দর্শন হয়। কিন্তু ঐ অবস্থায় প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে সর্বভূতের মধ্যে আত্মদর্শন হওয়া আবশ্যক।

পূর্বোক্ত দশার অভিব্যক্তি হইলে নিত্যজপের সন্ধান পাওয়া যায়। শক্তি তত্ত্ব নিত্য জপময়, শিবতত্ত্ব জপের অতীত। শক্তিতত্ত্ব শব্দময়-জ্ঞানময়-ভাবময়-ক্রিয়াময় কিন্তু শিবতত্ত্ব এই সকলের অতীত অথচ শক্তি ও শিব অবিনাভূত। কারণ, শক্তি ছাড়া শিব এবং শিব ব্যতিরেকে শক্তি থাকিতে পারে না। ইহার পরে বুঝিতে পারা যায় শিবও যাহা, শক্তিও তাহাই। জপ ও অজপার, সাকার ও নিরাকারের শক্তি ও শিবের আত্যন্তিক অভেদ তখন উপলব্ধিগোচর হয়।

অতএব প্রথম কর্তব্য, দ্রষ্টা হইয়া প্রাণরূপা প্রকৃতির খেলা অখণ্ড দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করা। এই নিরীক্ষণের প্রভাবে ইড়া-পিঙ্গলা হইতে বায়ু প্রবাহ অপসারিত হইয়া সূক্ষ্মভাব ধারণ করে এবং ক্রমশঃ সুষুম্নামার্গে প্রবিষ্ট হইয়া বজ্রিণী ও চিত্রিণী নাড়ী ভেদপূর্বক মুখ্য ব্রহ্মনাড়ীতে উন্নীত হয়। ঐখানে যাইয়া প্রাণপ্রবাহ ব্রহ্মবিন্দুক্ষরণাত্মক অমৃতপ্রবাহে পরিণত হয়। ইহাই মায়ের কোল। বিশ্বমাতৃকা পরাশক্তির অঙ্কে শুদ্ধ চিদাত্মক জীব স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শিবশক্তি-সামরস্যের রসসাগরে মগ্ন হয়। এই অমৃতহ্রদে অবগাহন করিলে মহানির্বাণ লাভ করিয়া চিরদিনের জন্য মহানির্বাণ হইতে মুক্তি লাভ হয়, কারণ "মক্ষিকাও মরে না গো পড়িলে অমৃত হ্রদে"।

২৩. ১. ৪৬

৬৮

…সাধনার জন্য চিন্তা না করিয়া শরীর রক্ষার জন্য বিশেষ যত্নশীল হইবেন, ইহাই প্রার্থনীয়। কারণ, দেহটি সুস্থ থাকিলে সাধনা জ্ঞানতঃ না করিলেও গুরুশক্তির প্রভাবে সাধনার ফল সঞ্চয় করিতে পারা যায়। যে মহাশক্তির খেলা নিজেকে নিজে প্রকাশিত করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে তাহা কাহারও বাধা বা প্রতিবন্ধক অঙ্গীকার করিবে না। অনুরূপ কালকে প্রাপ্ত হইলে তাহা স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই ফুটিয়া উঠিবে। ঐ সময় দেহসম্বন্ধ ও উন্মথতা না থাকিলে উহা ধারণ করিতে পারা যাইবে না। অতএব শরীরকে সুস্থ রাখিয়া যথাশক্তি লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ রাখিলে ভাল হয়। লক্ষ্যই তখন ক্রিয়া হইয়া যাইবে। অভিমানমূলক কর্মের দ্বারা সে ফল আশা করা যায় না। তাহা নিরভিমান দৃক্শক্তির প্রভাবে শুদ্ধ প্রকৃতির ক্রিয়াশক্তির দ্বারা সম্ভবপর হয়।

২১. ২. ৪৬

আপনি লিখিয়াছেন সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হইলে ঊর্দ্ধসংখ্যায় তিন জন্মের মধ্যে মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী, এরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। তাহা সত্য কিনা জানিতে চাহিয়াছেন। এই সম্বন্ধে বহু কথাই বলিবার আছে। যদি কখনও সাক্ষাৎকার হয় তখন সকল রহস্য খুলিয়া এবং বুঝাইয়া বলিতে পারিব। আপাততঃ দুই চারিটি কথা বলিতেছি—আপনি যাহা লিখিয়াছেন এরূপ কথা কতকটা ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মত বলিয়া শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। আরও কোন কোন মহাজন এরূপ মত স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু সকলেই যে এরূপ মত পোষণ করেন তাহাও নহে। কেহ কেহ তিন জন্মের পরিবর্ত্তে সাত জন্মের স্বীকার করেন। অপর কেহ কেহ সদ্‌গুরু হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যের পক্ষে বর্ত্তমান জন্মের ঊর্দ্ধে কোন জন্ম স্বীকার করেন না। এইপ্রকার নানা মত আছে। ইহার রহস্য বুঝিতে হইলে সদ্‌গুরুর স্বরূপ ও লক্ষণ জানা আবশ্যক এবং তিনি যে দীক্ষা দান করেন তাহার প্রকৃতি এবং প্রক্রিয়া ভাল করিয়া অনুধাবন করা আবশ্যক। সাধারণ ভাবে কোনও সিদ্ধান্ত সার্ব্বজনীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দীক্ষাতত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের কতকটা আভাস আমি "দীক্ষারহস্য" নামক ধারাবাহিক কয়েকটি প্রবন্ধে কয়েক বৎসর হইল প্রকাশিত করিয়াছি। উহা "কল্যাণ" পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল—ইচ্ছা হইলে দেখিতে পারেন। দীক্ষা জীবের পক্ষে ভগবত্তালাভের জন্য একান্ত আবশ্যক। আণবমল, কার্ম্মমল ও মায়ীয়মল, এই ত্রিবিধ মল জীবের পাশস্বরূপ। ইহার প্রভাবেই জীব পশুপদবাচ্য হইয়া থাকে। এই তিনপ্রকার মল হইতে মুক্তিলাভ দীক্ষা ব্যতিরেকে সম্ভবপর নহে। কর্ম ও মায়া হইতে মুক্ত হইলে সম্যক্-প্রকার পাশমুক্তি সিদ্ধ হয় না, কারণ আণবমল অবশিষ্ট থাকে। আণবমল ঐশ্বরিক সত্তার সংকোচ আনিয়া জীবভাব প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং এই মল নিবৃত্ত না হইলে পশুত্ব নিবৃত্ত হয় না—পরমেশ্বরত্ব লাভ তো দূরের কথা। দীক্ষার দ্বিবিধ ব্যাপার—পশুত্ব এবং আনুষঙ্গিক আবরণ হইতে মুক্তিলাভ এবং স্বীয় পরমেশ্বরস্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করা। ইহাই দীক্ষার মুখ্য ফল। সুতরাং কর্ম্মের অতীত হইয়া, এমনকি মায়ার অতীত হইয়া কৈবল্যে স্থিত হইলেও পরমপুরুষার্থলাভের কিছুই হয় না। কারণ, আণবমল বাকী থাকে এবং তাহার পর পূর্ণব্রহ্মত্বের অভিব্যক্তি বা পরমেশ্বত্বের বিকাশ অবশিষ্ট থাকে। এইজন্যই দীক্ষার এত মহিমা। পৌরুষ অজ্ঞান এবং বৌদ্ধ অজ্ঞান, এই দুই

প্রকার অজ্ঞানে জীব আচ্ছন্ন রহিয়াছে। দীক্ষা ব্যতিরেকে পৌরুষ অজ্ঞান কাটে না। সুতরাং দীক্ষা ব্যতিরেকে যে কোনপ্রকার সাধনপ্রণালী অবলম্বিত হউক না কেন, তাহাতে পৌরুষ অজ্ঞান থাকিয়াই যায়। যে অজ্ঞানের প্রভাবে স্বয়ং পরমেশ্বর জীব সাজিয়া অভিনয় করিতে বাহির হইয়াছেন যতক্ষণ সেই অজ্ঞান না কাটে ততক্ষণ পরমেশ্বরত্বস্বরূপ অপ্রাপ্তই থাকিয়া যায়। শুধু বৌদ্ধ অজ্ঞান কাটার কোন মূল্য নাই। পৌরুষ অজ্ঞান কাটাইয়া বৌদ্ধ অজ্ঞান, দেহাবস্থান কালেই, কাটাইতে পারিলে চিদানন্দরসের অভিব্যক্তি হয় ও জীবন্মুক্তি লাভ হয়। তারপর ভোগাবসানে দেহান্তকালে পৌরুষজ্ঞানের উদয়ে পরমেশ্বরত্ব-স্বরূপে স্থিতি হয়। ভোগবাসনার প্রকৃতিগত ভেদ অনুসারে দেহাবসানে উদ্ধলোকেও ভোগ হইতে পারে। ভোগ নিঃশেষ হইয়া গেলে পূর্ণত্ব লাভ অবশ্যম্ভাবী। পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে শীঘ্রই হউক অথবা বিলম্বেই হউক, পূর্ণত্ব হইবেই। ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকিলে পূর্ণত্বলাভে কিঞ্চিদ্ বিলম্ব হয় মাত্র ; কিন্তু কোন বাধা হয় না। কিন্তু শুধু বোধ জ্ঞানে বৌদ্ধ অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় মাত্র, আর কোন ফল হয় না। সদ্গুরুর দীক্ষা প্রধানতঃ নিষ্কল, তবে দৈহিক প্রকৃতিতে ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকিলে তদনন্তর 'সকল' দীক্ষাও তিনি দিয়া থাকেন। দীক্ষার দ্বারা অধ্বশুদ্ধি হয়, এবং এইভাবে ক্রমশঃ অশেষ পাশ নিবৃত্ত হইয়া চরমে শিবত্বযোজনারূপী পূর্ণত্বের অভিব্যক্তি হয়।

এই সম্বন্ধে যাহা যাহা জানিতে ইচ্ছা হয় স্পষ্টভাবে জানাইলে উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

৩০. ৩. ৪৬.

৭০

**** আপনি যাহা অনুমান করিয়াছেন তাহা অমূলক নহে। কারণ, আমাদের মত জাগতিক বামাচারবর্জিত। তাই বলিয়া ইহা যে প্রচলিত দক্ষিণমত তাহাও নহে। ইহা যোগমত বটে। কিন্তু পাতঞ্জল যোগ ও নাথপন্থীগণের যোগমত হইতেও ইহাতে অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে ভক্তির স্থান আছে কিন্তু তাহা উন্মাদিনী ভক্তি নহে। জ্ঞানের স্থান আছে কিন্তু তাহা শুষ্ক জ্ঞান নহে। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের বিরোধ এই মতে সমন্বিত হইয়াছে। ইহা কোন কৃত্রিম প্রণালী নহে—স্বভাবসিদ্ধ পন্থা।

২১৪৪৬

*••• তুমি আমাদের ধারার সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে ধারণা করিয়া লইবার জন্য কোন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানিতে চাহিয়াছ। তাহা সাক্ষাৎভাবে আলোচনা প্রসঙ্গে জানাইবার ইচ্ছা রহিল। কারণ, পত্রদ্বারা লিখিতে গেলে বহু কথার অবতারণা আবশ্যক এবং যেখানে প্রচলিত ধারণার সঙ্গে কোন অংশে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হইবার সম্ভাবনা আছে সেখানে বিশ্লেষণমুখে সিদ্ধান্তের স্পষ্ট প্রতিপাদন অত্যন্ত আবশ্যক। অখণ্ড সত্যের প্রকৃতরূপে দর্শন করিতে পারিলে বাস্তবিকপক্ষে বিরোধের কোন কারণ থাকে না। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়, দার্শনিক সম্প্রদায় এবং যোগী সম্প্রদায়ের মধ্যেও বহু বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত ও সাধনে নানাপ্রকার বিরোধ উপলব্ধ হয় তাহাদের সমন্বয় অখণ্ড দৃষ্টির পক্ষে সহজসাধ্য। এ সম্বন্ধে তোমাকে অধিক লেখা বাহুল্য।

জন্মান্তর সম্বন্ধে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ তাহার সমাধান খুব কঠিন নহে। কিন্তু কঠিন না হইলেও গভীর অনুভূতি দ্বারা উহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। আমাদের ধারার অনুমত সিদ্ধান্ত ও বিচার প্রণালী বুঝাইবার পূর্বে শাস্ত্রের সিদ্ধান্তটা তোমার নিকট উপস্থাপিত করিতে চাই। কারণ আমার বিশ্বাস শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও সাধারণতঃ লোকে ঠিক ঠিক জানে না। তুমি জন্মান্তর সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছ তাহা আংশিক, পূর্ণ নহে। স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণদেহের কথা শুনিয়া থাক তন্মধ্যে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্যগণ কেবলমাত্র স্থূলদেহের সত্তা স্বীকার করেন। সাংখ্য ও যোগের ভূমিতে স্থূল ব্যতীত সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরও স্বীকৃত হয়। সাংখ্যের পর বেদান্তভূমিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম ব্যতীত কারণ শরীর অঙ্গীকৃত হয়। ইহার পর আর কাহারও গতি নাই। বস্তুতঃ, কারণ শরীরের পর মহাকারণ শরীর অথবা বৈন্দব শরীরও আছে, মহাকারণ শরীরের পর কৈবল্য শরীরও যে না আছে তাহা নহে। কৈবল্যশরীর নিরাকার ও বিশুদ্ধ চিন্ময় কিন্তু মহাকারণ হইতে যাবতীয় শরীরই সাকার এবং জড়। তন্মধ্যে মহাকারণ শরীর নির্মল, কারণ ইহা মহামায়ার উপাদানে রচিত। মহামায়া অচিৎ হইলেও অত্যন্ত স্বচ্ছ। মহাকারণ শরীরের পর নিম্নবর্তী ত্রিবিধ শরীরই অশুদ্ধ জড় উপাদানে নির্মিত। সুতরাং এই তিনটিই মায়ীয়ক, তন্মধ্যে কারণ শরীর মায়াময় এবং কার্য শরীর মায়া হইতে উদ্ভূত তত্ত্বময়। আপাততঃ মায়া ও প্রকৃতি অভিন্ন মনে করিলে এই উদ্ভূত তত্ত্বগুলি সংখ্যাতে ২৩টি হইবে, কার্যশরীরে যেটা স্থূলভাগ অর্থাৎ স্থূলশরীর তাহা পঞ্চভূত নামক পাঁচটি তত্ত্বের দ্বারা রচিত।

কার্যশরীরের যেটি সূক্ষ্মভাগ সেটি অবশিষ্ট ১৮টী তত্ত্বের দ্বারা নির্মিত। এইভাবে চিন্ময় ও অচিন্ময় পঞ্চবিধ শরীরের কথা তোমাকে বলিলাম। কিন্তু আত্মার পরমস্বরূপ ইহাদের অতীত, কারণ উহা তত্ত্বাতীত।

মহাকারণশরীর, কৈবল্যশরীর এবং হংসশরীর বা পরমস্বরূপ এখানে আলোচ্য নহে। কারণ যোগপথে উহাদিগকে ফুটাইয়া তুলিতে হয়। কিন্তু মায়াগর্ভে অবতীর্ণ হইলেই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই তিনটি মায়িকশরীর থাকিবেই। এখন প্রশ্ন এই: মায়াতে অবতীর্ণ হয় কে? যে সত্তা মায়ার অতীত তাহাই মায়াতে অবতীর্ণ হয়, ইহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং বুঝিতে হইবে মায়ার অতীত একটি ক্ষরণশীল সত্তা আছে যাহা ক্ষরিত হইয়া মায়াতে পতিত হয়—এই ক্ষরণ যে একটি অক্ষর সত্তা হইতে হইয়া থাকে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অর্থাৎ এমন একটি সত্তা আছে যাহা হইতে নিরন্তর ক্ষরণ হইতেছে, অথচ তাহা রিক্ত হইতেছে না। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে"—নিরন্তর এই ক্ষরণটী কেন হইতেছে ইহার সমাধান ও ইহার গোড়ার কথা আমাদের ধারার তত্ত্বালোচনা প্রসঙ্গে জানিতে পারিবে।

যিনি বিভু ও অপরিচ্ছিন্ন সত্তা তিনি স্বেচ্ছাবশে অথবা কোন রহস্যময় কারণবশতঃ সংকুচিত হইয়া অণুত্ব প্রাপ্ত না হইলে মায়াগর্ভে প্রবিষ্ট হইতে পারেন না। স্বরূপের সংস্কারবশতঃ স্বরূপগত অপরিচ্ছিন্নতাও সংকুচিত হয়। ইহাই আত্মবিস্মৃত জীবরূপী অণুর মায়াতে পতিত হইবার পূর্ববর্তী আত্ম-পরিচয়। তান্ত্রিক আচার্যগণ অণুভাব প্রাপ্তির প্রণালীর সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত নির্দেশ কোথাও কোথাও ইঙ্গিতরূপে দিয়াছেন তাহার আলোচনা এখানে করা আবশ্যক। আমাদের ধারাতে অণুভাব প্রাপ্তির পূর্বের বহু অবস্থার ভিতর দিয়া অবতরণের রহস্যময় আলোচনা আছে—কিন্তু এখানে তাহাও বলিব না। আমার শুধু ইহাই বক্তব্য যে মায়াগর্ভে যাহা আসিয়া পড়ে তাহা একটী চিদণু। ইহাকে জীব বলিতে চাও বলিতে পার—এই অণুভাব না কাটা পর্যন্ত জীবই থাকে। ইহা কি ভাবে কাটে ও কখন কাটে তাহা পরে বলিব। কিন্তু ইহা সত্য যে এই অণু অথবা পরমাণু এক হিসাবে নিত্য। বৈষ্ণবগণ এইজন্যই অণুরূপী জীবের নিত্যতাবাদী।

এই যে পরমাণুর কথা বলা হইল ইহার কোন কর্ম নাই এবং কর্ম নাই বলিয়াই কর্মজনিত দেহগ্রহণ ইহার পক্ষে সম্ভব নহে। মায়াগর্ভে প্রবিষ্ট হইলে কর্মের উদয় সম্ভবপর হয়। সুতরাং বুঝিতে হইবে মায়াগর্ভে পতিত হওয়াই প্রকৃত জন্ম—ইহা একবারই হইয়া থাকে—ইহা বহুবার হইয়া থাকে না। মায়া ভেদ করিয়া যদি মহামায়াতে স্থিতি হয় তাহা হইলে বিদেহ কৈবল্যের অবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। ঐ অবস্থা হইতে পুনর্বার মায়াতে পতিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং মায়া ভেদ করাই যদি মৃত্যু হয় তাহা হইলে মৃত্যুর পর জন্মান্তর

থাকিল কোথায় ? ইহা ছাড়া বিদেহ কৈবল্য ব্যতীতও মায়াতীত অন্য অবস্থা আছে এবং তাহাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা। কারণ ঐ অবস্থায় পরমাণুটি শরীর প্রাপ্ত হয়। উহা বিদেহ অবস্থা নয়। উহারই নাম মহাকারণ শরীর। গুরুকৃপা ব্যতিরেকে ঐ শরীরটি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মায়া হইতে যে শরীর উদ্ভূত হয় তাহার জনক পিতা অর্থাৎ ঈশ্বর বা কাল। মহামায়া হইতে যে শরীর উদ্ভূত হয় তাহার জনক গুরু। অবশ্য যিনি গুরু তিনিই পিতা। তথাপি ভেদ আছে ইহা ভুলিলে চলিবে না। আমি এখানে জন্ম বলিতে পিতৃদত্ত দেহ গ্রহণ বুঝিতেছি—ইহা একবারই হয়—দ্বিতীয়বার হয় না। পিতারূপে ঈশ্বর দ্বারা মায়া ক্ষুব্ধ হইলে এই মায়িক দেহের আবির্ভাবরূপ জন্ম হয়। মায়িক দেহের তিরোধান হইয়া গেলে অর্থাৎ মহামায়াতে বিদেহ-কৈবল্য অবস্থাতে অথবা বৈন্দবজগতে গুরুবর্গের অন্যতম কিংবা মন্ত্রবর্গের অন্যতম অথবা তদনুরূপ ভাবাপন্ন দেহ প্রাপ্ত হইলে আর মায়াতে নামিয়া দেহগ্রহণ করিতে হয় না। শুধু তাহাই নহে, মায়াতে লীন হইয়া থাকিলেও প্রায় তদনুরূপই। সুতরাং মুখ্য জন্ম একবার এবং মৃত্যু একবার। কিন্তু কর্মের অতীত না হইলে কর্মজনিত ভোগদেহ গ্রহণ হইতেই থাকে—ইহার কোন সংখ্যা নাই। সুতরাং কর্মের সহিত জন্মান্তর সম্বন্ধ। কর্মের বৈচিত্র্যবশতঃ বিভিন্ন জন্ম হইয়া থাকে কিন্তু মূল জন্ম যেটা সেটা কর্মের অধীন নহে। কারণ পরমাণুর মায়াতে প্রবেশ করাই মূলজন্ম। মায়াতে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে মায়াতীত শুদ্ধ পরমাণুর কর্ম কোথায় ? কর্মজনিত বিচিত্র দেহ-সম্বন্ধ ঐ এক দেহেরই অবান্তর ব্যাপার—উহা গৌণ, মুখ্য নহে। জাগ্রত ও স্বপ্নে যে প্রকার ভেদ, মুখ্য দেহে ও গৌণ দেহে সে প্রকার ভেদ জানিতে হইবে। ৺গোস্বামী মহাশয়ের কথা কতকটা এই ভাবেরই দ্যোতক। জন্মান্তরবাদ মিথ্যা নহে, আবার একজন্মবাদও মিথ্যা নহে—কিন্তু conception-এ অনেক পার্থক্য। ইহা বুঝিতে পারিলে অজাতিবাদও যে সত্য তাহা বুঝিতে পারিবে। গৌড়পাদ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

১৬. ১১. ৪৬

জরা ও মৃত্যু হইতে দেহকে মুক্ত করাই দেহ-সিদ্ধির তাৎপর্য। ইহা নানা উপায়ে হইতে পারে। উপায়ভেদে দেহসিদ্ধির স্বরূপেও কিছু বৈশিষ্ট্য আসিয়া পড়ে। দেহ-সাধনা অতি কঠিন ও দুঃসাধ্য সাধনা। অতি অল্প ব্যক্তিই ইহাতে সফলতা লাভ করে। কিন্তু অল্প হইলেও প্রাচীনকাল হইতে নানা দেশেই ইহার প্রচার আছে। গোরক্ষনাথ, জলন্ধরনাথ প্রভৃতি সিদ্ধ দেহ লাভ করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় সাহিত্যে ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের বিবরণ পাওয়া যায়। ভারতীয় গ্রন্থেও ইহাদের উল্লেখ আছে। হঠযোগীরা বায়ু ও বিন্দু জয় করিয়া দেহ সিদ্ধ করেন। রসায়নবিদ্‌গণ পারদকে ১৮ সংস্কার দ্বারা শোধিত করিয়া তাহার দৈহিক প্রয়োগদ্বারা দেহসিদ্ধি লাভ করেন। সহজপন্থি-গণ ভাবসাধনা দ্বারা, মন্ত্রসাধকগণ মন্ত্রবীর্য দ্বারা, বাউলগণ চন্দ্রসাধনা দ্বারা সিদ্ধদেহ লাভ করিতে যত্ন করেন। গোপীচাঁদ' ময়নামতী প্রভৃতির কাহিনী দেহসিদ্ধি প্রসঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে লিপিবদ্ধ আছে।

সিদ্ধগণের মত এই যে দেহ সিদ্ধ বা শুদ্ধ হইলে ঐ দেহ কালের গ্রাসে পতিত হইতে পারে না। তখন ঐ দেহ আশ্রয় করিয়া দীর্ঘকালসাধ্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সাধনা চলিতে পারে। দেহ-সাধনার উদ্দেশ্য জীবন্মুক্তি লাভ। সিদ্ধগণের জীবন্মুক্তি বেদান্তের জীবন্মুক্তি হইতে ভিন্ন। বেদান্তমতে জীবন্মুক্ত পুরুষ প্রারব্ধের অধীন থাকে। জ্ঞানের ফলে সঞ্চিত কর্ম দগ্ধ হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম নষ্ট হয় না। উহা ভোগের দ্বারা ক্ষীণ হয়। তখন দেহপাত হইলে বিদেহ কৈবল্য লাভ হয়। কিন্তু সিদ্ধগণ এই জাতীয় কৈবল্যমুক্তির পক্ষপাতী নহেন। তাহারা বলেন—দেহ থাকিতেই মুক্তির আস্বাদ পাওয়া চাই, দেহ ও মন অস্তমিত হইলে মুক্তির আস্বাদ কিভাবে উপলব্ধ হইবে? দেহ মৃত্যু বা কালের অধীন থাকিলে মুক্তি হইতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত জীবন্মুক্ত পুরুষ তাঁহাকেই বলা চলে যিনি মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। জীবন্মুক্ত সিদ্ধের দুইটি অবস্থা—(১) প্রথমতঃ মায়িক দেহ শুদ্ধ মায়ার দেহলাভ। ইহাই সিদ্ধ দেহ। (২) তারপর ঐ দেহ ক্রমশঃ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া প্রণবতনুরূপে পরিণত হয়। তখন উহা সিদ্ধগণেরও অদৃশ্য হইয়া পড়ে। সন্তগণ বলেন যে প্রথম অবস্থাটি অমর দেহ, দ্বিতীয়টি অবিনাশী দেহ। উভয়ই মৃত্যুঞ্জয়ী। প্রণবদেহ বস্তুতঃ কুণ্ডলিনীস্বরূপ। সিদ্ধদেহই যোগদেহ। সহজিয়া সাধকগণের প্রবর্তক দশায় অবসানে যে ভাবদেহের বিকাশ হয় তাহা বাস্তবিক পক্ষে সিদ্ধদেহেরই প্রকারভেদমাত্র। তবে ধারাগত পার্থক্য আছে।

সিদ্ধদেহের প্রধান limitation এই যে ইহা রক্তশূন্য। রক্তশোষণ

ব্যতিরেকে দেহসিদ্ধি এখনও কাহারও আয়ত্ত হয় নাই। রক্ত থাকিলেই কালের আঘাত অবশ্যম্ভাবী, ঊর্দ্ধ্ব জগতের সত্তা রক্তহীন বলিয়া মৃত্যুর অধীন নহে। রক্তশূন্য হইলে মৃত্যুর ভয় থাকে না। তখন ঐ সত্তা বিরাট চৈতন্যের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়। বিশুদ্ধ জ্যোতিরূপে ঐ সত্তা থাকে—উহা অতীন্দ্রিয় ও ক্ষোভের অতীত। উহা শূন্যে নিরালম্বভাবে অবস্থান করে। কিন্তু এবার মহাযোগের ফলে যাহা হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাহাতে রক্তশূন্য হইবে না, অথচ চরমে মৃত্যুঞ্জয় হইবে। ইহার প্রক্রিয়া ভিন্ন, উদ্দেশ্যও ভিন্ন। দেহে রক্ত না থাকিলে সেই দেহে সৃষ্টির ক্রিয়া হয় না—তাহার দ্বারা জীব-জগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভবপর নহে।

যখন নরদেহে পূর্ণব্রহ্মের আবির্ভাব হইবে তখন ঐ সকল সিদ্ধকায়া দ্বারা বহুকার্য সম্পন্ন হইবে। উহার প্রধান কার্য হইবে বীজহীন ক্ষেত্রে বীজ অর্পণ করা। অবশ্য উহা জগদ্‌গুরুর প্রেরণাতেই হইবে। নরদেহে এখন পর্যন্ত পূর্ণব্রহ্মের অভিব্যক্তি হয় নাই—কারণ তাহা হইলে জগতের পরিবর্তন হইয়া যাইত। প্রকৃতি পর্যন্ত বিকাশ নরদেহে অবশ্য হইয়াছে—অবশ্য বিরল ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রকৃতিভেদ হয় নাই। প্রকৃতিভেদ হইলেই কালবিনাশ সিদ্ধ হইত—কালের বিক্রম থাকিত না, সকলেই পূর্ণানন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া নিজেকে অনুভব করিত। বস্তুতঃ তাহা হয় নাই। যাঁহাদের ব্রহ্মভাব লাভ হইয়াছে তাঁহারা দেহাবস্থায় উহা লাভ করেন নাই, দেহান্তে করিয়াছেন। বলা বাহুল্য মহাযোগীদের সম্বন্ধে এই কথা বলিতেছি—সিদ্ধসাধকদের সম্বন্ধে নহে। সাধকের লক্ষ্য চিদাকাশ। যোগমন্ত্রের সাহায্য না পাইলে চিদাকাশ ভেদ করা যায় না। ব্রহ্মবীজ ব্যতীত ব্রহ্মাবস্থার বিকাশ হইতে পারে না। যে সব ক্ষেত্রে এই বীজপাত হয় নাই তাহারা মরণান্তেও ব্রহ্মলাভ করিতে পারে না। স্বীয় ভাব ও কর্ম অনুযায়ী তাহাদের গতি হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্রহ্মলাভ তাহাদের হওয়ার আশা নাই। কিন্তু এই মহাযোগের সময় তাহারাও ব্রহ্মপ্রাপ্তির অধিকারী হইবে। তাই তাহাদিগকে ব্রহ্মলাভের যোগ্য করিবার জন্য ব্রহ্মবীজ দান করিতে হইবে। এই সব বীজহীন ক্ষেত্রে বীজবপন ও কর্ষণ প্রভৃতির কার্য সিদ্ধদেহ মহাপুরুষগণ শ্রীভগবানের নির্দেশ অনুসারে সম্পাদন করিবেন।

কায়া সিদ্ধ হইয়া গেলে বস্তুতঃ দেহ ও আত্মার ভেদ লক্ষিত হয় না। এইজন্য এই সকল আত্মা স্তর লাভ করিতে পারে না। এই সকল কায়া মর অবস্থা হইতে অমরত্ব লাভ করে। কিন্তু যোগী যোগমার্গে অগ্রসর হইয়া মর দেহে কর্ম সমাপ্ত করার পূর্বে অথচ মহাভাব বা ভাবদশা অবস্থা লাভ করিয়া দেহত্যাগ করিলে ঊর্দ্ধ্বলোকে অমরদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পূর্বোক্ত অমরদেহ হইতে এই অমরদেহ বিভিন্ন। এই অমরদেহ ঊর্দ্ধ্বলোকে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রকট হইয়া থাকে। ইহাদের স্তর লাভ হয়। মরসিদ্ধ অমরদেহ স্তরহীন।

২৬. ১১. ৪৬.

৭৩

যে অভিনব ব্যাপার সংঘটিত হইয়া জগতের রূপান্তর সম্পন্ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা এখনও সর্বসাধারণের অজ্ঞাত এবং গভীর রহস্যে আচ্ছন্ন। তুমি সেই সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ—সেই জন্য যথাসম্ভব সংক্ষেপে এবং যথাসম্ভব স্পষ্টভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

জগতে ও জীবে অপূর্ণতা রহিয়াছে। বস্তুতঃ সৃষ্টিমাত্রই অর্থাৎ যে সৃষ্টির সহিত আমরা পরিচিত তাহা অপূর্ণতার নিদর্শন। এই অপূর্ণতা দূর করিবার চেষ্টা এবং প্রত্যেকটি জীবের পূর্ণত্বলাভের চেষ্টা বস্তুতঃ অভিন্ন। অভাববোধ অপূর্ণতা হইতেই হইয়া থাকে। দুঃখ, শোক, তাপ, কলুষিত, বৃত্তি, খণ্ডভাব এবং তাহার যাবতীয় পরিণাম—এসব অপূর্ণতারই ফল। সৃষ্টির পর হইতেই এই অপূর্ণতা একপক্ষে যেমন অনুভবে আসিয়াছে, অপরপক্ষে তেমনি ইহা দূর করিবার চেষ্টাও আরব্ধ হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা নানাপ্রকার উপায়ের আবিষ্কার হইয়াছে—সকলেরই একমাত্র উদ্দেশ্য এই অপূর্ণতা দূর করিয়া জীব ও জগৎকে শান্তি সুখ এবং পরমা তৃপ্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা। দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক বিচার ও সাধনা সর্ববিধ লৌকিক প্রয়াস ঐ এক মহান উদ্দেশ্যের দ্বারাই অনুপ্রাণিত।

ইহা হইতে বুঝা যাইবে পূর্ণত্বলাভই জীব ও জগতের সকলপ্রকার ক্রিয়ার একমাত্র লক্ষ্য। অনাদিকাল হইতে এই লক্ষ্যের অনুসরণ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এখন পর্যন্ত লৌকিক দৃষ্টিতে সকলেরই মনে হইতেছে ইহার প্রাপ্তি পূর্বেও যেমন সুদূরপরাহত ছিল এখনও তেমনি সুদূরপরাহত রহিয়াছে, কারণ জগতে দুঃখ কষ্ট এবং অভাববোধের উপশম পূর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছে ইহা বলা যায় না। দুঃখনিবৃত্তি, পরমানন্দপ্রাপ্তি, ব্রহ্মত্বলাভ, মোক্ষ প্রভৃতি যে কোন নামেই সেই মহা উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করা যাউক্ না কেন, তাহার পূর্ণ উপলব্ধি এখন পর্যন্ত সিদ্ধ হয় নাই। ব্যক্তিগত ভাবে কেহ কেহ আনন্দ, মুক্তি, দুঃখনিবৃত্তি অথবা ব্রহ্মপ্রাপ্তি প্রভৃতি অবস্থা লাভ করিয়াছেন এরূপ প্রসিদ্ধি থাকিলেও তাহাতে সমষ্টিগতভাবে সমগ্র জগতের দুঃখনিবৃত্তি সিদ্ধ হয় নাই। বস্তুতঃ যতক্ষণ সকলের দুঃখনিবৃত্তি সিদ্ধ না হয় ততক্ষণ একেরও অর্থাৎ যে কোন ব্যক্তিরই দুঃখ নিবৃত্তি সম্যক্ সিদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না—কারণ সমগ্র সৃষ্টির অতীত সত্তা অখণ্ড ঐক্যসূত্রে বদ্ধ। সাধারণতঃ ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে কেহ উপায়বিশেষের সহায়তায় অথবা নিরুপায়ভাবে কোন শ্রেষ্ঠ অবস্থা বা পদ লাভ করিলে তাহার পক্ষে পূর্ণত্বে অবগাহন করিবার

পূর্বে পথ নির্দেশ প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা দুঃখক্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির দুঃখ মোচনের চেষ্টা স্বাভাবিক। এই চেষ্টা অবস্থাভেদে নানাপ্রকারে হইয়া থাকে কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক্ না কেন ইহার ফলে সংসারতাপে তাপিত ব্যক্তিবিশেষ দুঃখ-নিবৃত্তির মার্গ লাভ করে এবং দীর্ঘকাল পরে তাহার মার্গ-উপদেষ্টার ন্যায় সেও উচ্চাবস্থা লাভ করে। তখন প্রথম ব্যক্তি জীবোদ্ধার কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পূর্ণত্বে অবগাহন করে। দ্বিতীয় ব্যক্তি তখন ঐস্থান গ্রহণ করে এবং তাহারই ন্যায় উচ্চকার্যে ব্যাপৃত হয়। এইভাবে ক্রমশঃ এক একটি করিয়া যোগ্যতা অনুসারে জীব এই দুঃখের ও অভাবের রাজ্য হইতে চিরদিনের জন্য মুক্তি লাভ করে। সৃষ্টির পর হইতেই জীবের উদ্ধার কার্য এইপ্রকারে নিষ্পন্ন হইতেছে। পরমাবস্থায় জীবের স্বরূপ কি থাকে এবং জীব মোটেই থাকে কি না অথবা শুধু ব্রহ্মভাবে স্থিত হয় কিংবা অন্যপ্রকার সিদ্ধাবস্থার অভিব্যক্তি হয়, এই বিষয়ে এইস্থানে আলোচনার কোন আবশ্যকতা নাই। জরা মৃত্যুর অতীতাবস্থা সামান্য দৃষ্টিতে এক হইলেও তাহার নানাপ্রকার ভেদ আছে। রুচিবৈচিত্র্যানুসারে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কৈবল্য, নির্বাণ, পরিনির্বাণ, মহাপরিনির্বাণ, শান্ত ব্রহ্মপদ, শিবত্ব, পূর্ণ স্বাতন্ত্র অথবা পরমেশ্বরত্ব, নির্বিকল্পস্থিতি, নিত্যলীলা ইত্যাদি অনন্ত প্রকারের অবস্থা আছে। মরজগতের শোক-তাপ প্রভৃতি হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া যাহার যে প্রকার অধিকার অথবা রুচি সে সেইপ্রকার একটি নিত্যাবস্থা লাভ করিয়া থাকে। আবার কেহ কেহ নিত্যাবস্থাও ভেদ করিতে সমর্থ হয়।

যে সকল আত্মা জগতের হিত ও সুখের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন, যাঁহারা স্বভাবতঃ করুণাবিশিষ্ট এবং পরোপকার কার্যে রুচিসম্পন্ন তাঁহারা শুধু নিজের ব্যক্তিগত দুঃখের নিবৃত্তি অথবা সুখসমৃদ্ধিতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। তাঁহারা নিজে দুঃখ এবং ক্লেশ স্বীকার করিয়াও অন্যের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। অধ্যাত্মমার্গেও ঐরূপই হইয়া থাকে। বৌদ্ধসম্প্রদায়ে প্রাচীন সময়ে ব্যক্তিগত দুঃখনিবৃত্তি বিশেষরূপে প্রার্থনীয় ছিল। যে জ্ঞানে জগৎকে দুঃখময় বলিয়া চিনিতে পারা যায়, শুধু তাহাই নহে দুঃখের কারণ বুঝিতে পারা যায়, দুঃখনিবৃত্তির স্বরূপ জানিতে পারা যায় এবং উহা প্রাপ্তির উপায় আয়ত্ত করা যায় তাহাই প্রকৃত সম্যগ্জ্ঞান। দুঃখনিবৃত্তি নির্বাণেরই নামান্তর। ইহা শুধু দুঃখনিবৃত্তি নহে, দুঃখের সঙ্গে সমগ্র সত্তারই নিবৃত্তি। এই অবস্থায় লৌকিকজ্ঞান পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহার আবশ্যকতাও আর থাকে না। কিন্তু এই পথ ব্যক্তিগত দুঃখনিরোধের উপায় নির্দেশ করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা অখিল জগতের দুঃখনিবৃত্তির মার্গে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ যাহার দুঃখ নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ যে নির্বাণ প্রাপ্ত হয় তাহার পঞ্চ স্কন্ধই নিরুদ্ধ হইয়া যায় বলিয়া সে নিজেই থাকে না—অন্যের দুঃখ দূর

করিবার চেষ্টা করিবে কে? তা'ছাড়া অন্যের দুঃখ দূর করিবার বাসনা চিত্তে প্ররূঢ় না হইলে সম্যক জ্ঞানের উদয়ে নির্বাণে প্রবেশ অবশ্যম্ভাবী। অশুদ্ধ বাসনা নিবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্হৎ অবস্থা উপলব্ধ হয়। তাহার পর যথাসময়ে স্কন্ধ নিবৃত্তি সিদ্ধ হয় যাহার নামান্তর নির্বাণ। ইহা কতকটা জীবন্মুক্তি ও বিদেহ কৈবল্যের মত। সুতরাং স্থায়ীভাবে পরদুঃখমোচনের চেষ্টা এই পথে চলে না। যে নিজে অর্হৎভাব প্রাপ্ত হয় সে অন্যকে জ্ঞানদান করিয়া শুদ্ধ পথে আসিবার সাহায্য করিতে পারে। কিন্তু তাহার স্কন্ধ নিবৃত্তি হইয়া গেলে তাহার এই পরোপকার ব্রত মধ্যপথেই খণ্ডিত হইয়া যায়। কিন্তু বহুলোকের দুঃখ দূর করিতে হইলে নিজের দুঃখ লঘু মনে করিয়া ঐ দুঃখকে প্রধান স্থান দেওয়া আবশ্যক। তাদৃশ ক্ষেত্রে স্বদুঃখ মোচনের বাসনা অপেক্ষা পরদুঃখ মোচনের বাসনাই অধিকতর বলবতী হয়। এই ক্ষেত্রে যদিও অজ্ঞান বিদ্যমান থাকে তথাপি ক্লেশ হইতে মুক্তিলাভ হয়। ক্লিষ্ট অজ্ঞান এবং অক্লিষ্ট অজ্ঞান এই উভয়প্রকার অজ্ঞানের মধ্যে পরহিতাকাঙ্ক্ষী আত্মার ক্লিষ্ট অজ্ঞান থাকে না কিন্তু অক্লিষ্ট অজ্ঞান থাকার দরুণই পরহিত কার্য সম্ভবপর হয়। পরদুঃখমোচনের বাসনাই শুদ্ধ বাসনা। অক্লিষ্ট অজ্ঞান থাকা পর্যন্ত এই শুদ্ধ বাসনা থাকে। এই বাসনা থাকার দরুণ চিত্ত নির্বাণ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। যতদিন অক্লিষ্ট অজ্ঞান বর্তমান থাকে ততদিন মহাজ্ঞান অর্জনের চেষ্টা চলিতে থাকে। এই চিত্ত বোধিচিত্ত অথবা বোধিসত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ঘনীভূত এবং বিন্দুরূপে পরিণত চিত্ত। যে পরিমাণে এই চিত্ত উৎকর্ষ লাভ করে সেই পরিমাণে ইহা নিম্নবর্তী ভূমি ত্যাগ করিয়া ঊর্ধ্ববর্তী ভূমিতে সঞ্চারিত হয়। এইভাবে একেক ভূমি পরিহার করিয়া ঊর্ধ্বতর ভূমি লাভ করিতে করিতে দশমভূমি প্রাপ্ত হইলে বুদ্ধজ্ঞানের উদয় হয়। ইহাই বোধিসত্ত্ব জীবনের পূর্ণতম আদর্শ। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইলে নির্বাণের ভয় চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইয়া যায়, কারণ নির্বাণ তখন স্বায়ত্ত হয়। দশমভূমির অধিষ্ঠাতা হইয়া—বুদ্ধ সম্রাট্ বা চক্রবর্তী পদে আরূঢ় হন। বুদ্ধের জীবনের একমাত্র ব্রতই পরোপকার অর্থাৎ জাগতিক জীবের দুঃখভঞ্জন। সংখ্যাতীত বুদ্ধ স্ব স্ব ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হইয়া মৃত্যু এবং নির্বাণকে পরিহার করিয়া নিরন্তর এই মহাকার্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

ইহা অতি উচ্চাবস্থা। বুদ্ধ শাস্তা অথবা উপদেষ্টা বা গুরু। তাঁহার শাসনকালে তিনি সাক্ষাদ্‌ভাবেই স্বকার্য সম্পাদন করেন। কিন্তু তাঁহার শাসনকাল অতীত হইয়া গেলেও তাঁহার স্বরূপগত স্বভাবের পরিবর্তন হয় না। কিন্তু সংখ্যাতীত বুদ্ধ জীবোদ্ধার কার্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও এখনও জগতের অজ্ঞান এবং দুঃখ রহিয়াছে—এবং এইভাবে কখনও যে ইহার

পরিসমাপ্তি হইবে সে সম্ভাবনাও নাই। জীবের উদ্ধারকার্য অবশ্যই সিদ্ধ হইতেছে কিন্তু ক্রমিকভাবে; এবং যত জীব প্রপঞ্চে সমাগত হইতেছে তাহার অনেক কম প্রপঞ্চ হইতে উদ্ধার লাভ করিতেছে। যে সকল জীব আবির্ভূত হয় নিরবশেষভাবে সকলের উদ্ধার হইলেও—সর্বজীবের দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব হয় না, কারণ নিরন্তর নব নব জীবের আবির্ভাব হইয়া চলিয়াছে। সুতরাং ঐ স্থানে অনুগ্রহ ব্যাপারও যেমন নিরন্তর, জীবের সংসারপ্রাপ্তিরূপ নিগ্রহও তেমনি নিরন্তর, ইহাই বলিতে হইবে।

বেদান্তের নানাজীববাদের দিক্ হইতে জীবের দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবশ্যই বলা চলে কিন্তু একজীববাদের দিক্ হইতে—এবং ইহাই বেদান্তের মুখ্যপক্ষ—মুক্তিলাভ এখনও হইয়াছে বলা চলে না, কারণ যে দৃষ্টিতে মূলে একটিমাত্র জীব তদনুসারে তাহার মুক্তিই একমাত্র মুক্তি। সর্বজীবের মুক্তি ঐ একমুক্তির অন্তর্গত। এইজন্যই কোন কোন আচার্য বলিয়াছেন যে প্রকৃত মুক্তি বা মোক্ষ এখনও হয় নাই। তবে যে মুক্তিশব্দের প্রয়োগ করা হয় তাহা ঈশ্বরসাযুজ্যকে লক্ষ্য করিয়া।

বৈষ্ণব মহাজনগণ শুধু দুঃখনিবৃত্তিতে সন্তুষ্ট না হইয়া পরমানন্দের আস্বাদন আপন আপন সাধনায় পরমলক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই আনন্দের আস্বাদন রসাস্বাদনরূপে অনন্তপ্রকারে নিত্যধামে হইয়া থাকে। জীবের যোগ্যতা অনুসারে শুদ্ধাভক্তির মহিমায় জীব এই লীলারসের আস্বাদন করিতে সমর্থ হয়। ভক্ত-ভগবান, তাঁহাদের অনন্তপ্রকার সম্বন্ধ—আস্বাদনের বৈচিত্র্যসাধক, ভগবান্ ও ভক্তির ধামের অনন্ত বৈচিত্র্য,সকলই রসাস্বাদনের অবস্থায় সম্ভবপর হয়। ইহাই নিত্যলীলা নামে প্রসিদ্ধ। জন্ম-মৃত্যু স্রোতের ঊর্ধ্বে, এমনকি নির্বাণ ও মহানির্বাণেরও অতীত আনন্দময় ভগবৎ সত্তাতে হ্লাদিনী শক্তির প্রভাবে অনন্তপ্রকার লীলার আবির্ভাব হইয়া থাকে। ইহা নিত্যলীলা বলিয়া ইহার কখনই অবসান নাই। ভক্তজীব ভক্তির প্রভাবে এই আনন্দের নিত্যবিলাস অনুভব করিতে সমর্থ হয় এবং তাঁহাদের কৃপাতে অধিকার ও বাসনা অনুরূপ ক্রমে ক্রমে নিত্যলীলায় যোগ দিতে অধিকার লাভ করে। কিন্তু ইহারাও জগতের দুঃখ সমূলে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না, কারণ সকলেই নিত্যলীলায় প্রবেশ করিবে এবং কালের কবল হইতে অব্যাহতি পাইবে, কেহ অবশিষ্ট থাকিবে না, ইহা সম্ভবপর হয় না।

জীব ও জগতের দুঃখ মহাজনদের হৃদয়কে চিরদিনই ক্ষুব্ধ করিয়া থাকে। কিন্তু সকলের পক্ষে সম্যক্ প্রকারে এই দুঃখনিবৃত্তির উপায় উদ্ভাবন সম্ভবপর হয় না। মহাজনদের মধ্যে যাঁহাতে যে পরিমাণ শুদ্ধ বাসনার বিকাশ থাকে তিনি সেই পরিমাণে অন্যের দুঃখমোচনে তৎপর এবং সমর্থ হইয়া থাকেন। তারপর ঐ বাসনা নিবৃত্ত হইয়া গেলে তিনি পরামুক্তি লাভ করেন। তখন

আর ঐ জীবোদ্ধার ব্যাপারে তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে না। তাঁহার সমধর্ম্মা অন্য কেহ ঐ অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ মহাকার্য সম্পাদন করিতে থাকেন। তাঁহার অধিকার নিবৃত্ত হইয়া গেলে তিনিও পরবৈরাগ্য লাভ করিয়া জগদ্‌ব্যাপারের অন্তরাল হন। বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন প্রকারে বিভিন্ন পরিমাণ সময়ের জন্য এই জীবোদ্ধার ব্যাপার নিয়মিতভাবে চলিতেছে। কে কোন্‌ মার্গে বা কোন্‌ পদ্ধতিতে ক্রম অবলম্বন করিয়া অথবা না করিয়া কত জীবকে এবং কতটা পরিমাণে উদ্ধার করিলেন, এইখানে সে আলোচনার আবশ্যকতা নাই। কারণ, যিনিই উদ্ধার করুন এবং যেভাবেই করুন বস্তুতঃ ইহা গুরুরই কার্য। তিনি নিমিত্ত মাত্র। সুতরাং বুঝিতে হইবে গুরু স্বীয় কার্য অনলসভাবে নিরন্তর সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

সৃষ্টির প্রারম্ভকাল হইতে এই জীবোদ্ধার কার্য গুরুমণ্ডলের দ্বারা অবিশ্রান্তভাবে সম্পাদিত হইলেও এখনও জীব ও জগৎ দুঃখপঙ্ক হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। এখনও দুঃখের মাত্রা এবং দুঃখী জীবের সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা কম হয় নাই। কম তো হয়ই নাই বরং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার কারণ এই—লোকক্ষয়কারী কালের প্রভাব পূর্বাপেক্ষা ক্রমশঃ অধিক হইয়াছে। সর্বজগতের এবং জীবের দুঃখ দূর করিতে হইলে শুধু শাখা সংস্কার করিলেই চলিবে না--মূল সংস্কার করা আবশ্যক। মূল সংস্কার মানে কালের নিবৃত্তি। অর্থাৎ যে কালের অধীন হইয়া জীব অভাব ও যন্ত্রণা বোধ করিতেছে সেই কালকে নিবৃত্ত বা আয়ত্ত করিতে না পারিলে শুধু ব্যষ্টিভাবে জীবকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও জীবমাত্রের সুরক্ষা সিদ্ধ হইতে পারে না। অতএব পূর্ণভাবে গুরু স্বকার্য তখনই করিতে সমর্থ হইবেন যখন কাল আবদ্ধ হইবে এবং তাঁহার কার্যপথে বাধা দিতে পারিবে না।

কিন্তু ইহা কখন সম্ভবপর? ইহার উত্তর এই যখনই হউক্‌ না কেন ইহা অবশ্যই সম্ভবপর, কারণ যে দৃষ্টিতে কালের এবং কালজনিত সৃষ্টির আদি আছে, সেই দৃষ্টিতে কালের নিরোধ ও তজ্জনিত সৃষ্টিরও নিরোধ অবশ্যই আছে। সকলই স্বীয় ভোগকাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে। তদ্রূপ কালেরও শাসনকাল বা অধিকারকাল সমাপ্তপ্রায় হইলে উহা স্বভাবতঃই নিবৃত্ত্যুন্মুখ হয়। উহার প্রবল তাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ঐ সময় কালকে নিবৃত্ত করিয়া তাহাকে আয়ত্ত করার সময় উপস্থিত হয়। অবশ্য ইহা গুরুর কার্য। কালের যেমন শাসনকাল আছে তেমনি গুরুরও শাসনকাল আছে। কালের শাসনকালে গুরুকে এক হিসাবে কালের অধীন হইয়াই অর্থাৎ তাহার নীতি অনুসরণ করিয়াই স্বীয় কার্য সম্পাদন করিতে হয়। কালকে লঙ্ঘন করা, উপেক্ষা করা অথবা কালজনিত নিয়মকে অনাদর করা কালের রাজ্যে সম্ভবপর নহে, কারণ তাহা করিতে গেলে গুরুর স্বকার্য ব্যাহত হইয়া যায়। সেইপ্রকার গুরুর

শাসনকালেও কালের প্রকোপ থাকিবে না বটে, কিন্তু তদ্বারস্থভাবে কাল অবশ্যই কার্য করিবে। অর্থাৎ গুরুর ইচ্ছার অনুবর্তী হইয়া তখন কালকে চলিতে হইবে।

কিন্তু ইহা কখন সম্ভবপর। গুরুরাজ্য স্থাপনের পূর্বে অর্থাৎ অখণ্ডগুরু জগতে প্রকট হওয়ার পূর্বে ইহা সম্ভবপর নহে। তাহার পর ইহা শুধু সম্ভবপর নহে, ইহা অবশ্যম্ভাবী। জগতের যাবতীয় জীব গুরুরাজ্য স্থাপনের পর ক্রমশঃ তৃপ্তি, পূর্ণতা এবং পরমানন্দ লাভ করিয়া গুরুর সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিবে। তখন এক অখণ্ডগুরু অনন্ত খণ্ডবৎ বিভক্ত সত্তা স্বকায়াতে ধারণ করিয়া সকলের সহিত অভিন্নরূপে প্রতিভাসমান হইবেন। তখন প্রত্যেকেই নিজে পূর্ণতা লাভ করিয়া পূর্ণতার উপলব্ধি করিবেন এবং অনন্ত বৈচিত্র্য এক ও অখণ্ড নিজসত্তারই আনন্দময় অনন্ত বিলাসরূপে অনুভব করিবেন। তখন এবং একমাত্র তখনই গুরুর মহনীয় ব্রত উদ্‌যাপন হইবে। জগতে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র গৃহের কোণদেশে একটি ক্ষুদ্র প্রাণীও যতক্ষণ ক্লেশ ও তাপের এবং অভাবের লেশমাত্র অনুভব করিবে ততদিন এই মহাবস্থার উদয় হইয়াছে বলা চলিতে পারে না।

৫.৩.৪৭

৭৪

জগৎ ভেদ করা বা জগৎ অতিক্রম করা ইহার ফল শুদ্ধচৈতন্যাবস্থায় স্থিতি। বর্তমান সময়ে চৈতন্য জড়ের সহিত মিশ্রিতাবস্থায় রহিয়াছে। জড়জগৎ হইতে চৈতন্যকে নিষ্কর্ষ করিয়া জগৎ হইতে উর্ধ্বে নিতে পারিলে ঐ চৈতন্য জড়সম্বন্ধ-রহিত শুদ্ধচৈতন্য আখ্যা প্রাপ্ত হয়। উহাই ব্রহ্ম বা শুদ্ধপ্রকাশ বা শিব। উহা বিশ্বাতীত। কিন্তু এই চৈতন্য সমগ্র জগতের দ্রষ্টারূপে অসঙ্গভাবে সর্বাতীতভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহাতে জগতের সহিত যোগ থাকে না। এই চৈতন্যে ক্রিয়াশক্তির উন্মেষ হইলে একই ক্ষণে ইহা বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বাত্মক হইয়া পড়ে। ক্রিয়াশক্তির দ্বারাই সর্বাকারযোগিত্ব সিদ্ধ হয়। এই পর্যন্ত সিদ্ধ হইলে বিশ্বাতীত চৈতন্য বিশ্বাত্মক হইয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই পরমশিবের অবস্থা।

১৬. ৬. ৪৯

৭৫

***** বঙ্গদেশে ধর্মপত্রিকার আদর নাই, ইহা সত্য। কারণ, সাধারণতঃ যাহারা পত্রিকা পড়ে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই ধর্মপিপাসা নাই। কিন্তু এই পিপাসা জাগাইয়া তোলা-—ইহাও ধর্মপত্রিকা প্রচারের অন্য এক উদ্দেশ্য মনে রাখিতে হইবে। লোকের রুচি বিচিত্র—সেই বৈচিত্র্যকে অনুসরণ করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্যের পূরণ করিতে চেষ্টা করিলে সুফল লাভের আশা অমূলক হইবে না। কালের প্রভাবে লোকের চিত্ত বহির্মুখী হইলেও অন্তর্জগতে চুম্বকের সন্ধান দিতে পারিলে উহাকে অন্তর্মুখ করিতে বেশী দিন লাগে না। তবে চাই সম্মুখে মহান্ লক্ষ্য স্থাপন এবং উহাকে সর্বত্র প্রকাশিত করিবার অক্লান্ত উদ্যম। আশা করি শ্রীভগবান আপনাদের সদুদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন।

২৭. ৫. ৫৩

৭৬

সূফী সাধনায় প্রেমের স্থান খুব উচ্চে। বৈষ্ণব সাধনাতেও তাই। সহজিয়া ও বাউলদের সাধনাতেও তদ্রূপ। তবে আস্বাদনে সূক্ষ্ম ভেদ আছে। নরদেহ ভিন্ন ভালবাসার পূর্ণ আস্বাদন পাওয়া যায় না—তাই ভগবানও ভালবাসার খাতিরে ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া নরদেহ গ্রহণ করেন, বঙ্গীয় বৈষ্ণব প্রেমিক এটা বুঝিতেন। তাই ঐশ্বর্যেরও উপরে তাঁরা মাধুর্যের স্থান দিতেন। ঐশ্বর্যের ভালবাসা ভাগের ভালবাসা—মাধুর্যের ভালবাসাতে কাহারও ভাগ নাই—অখণ্ড আপন বস্তু। নরলীলা ভিন্ন ইহা হয় না। সূফীগণ এত বড় আস্বাদন পান নাই। তাঁরা মানুষকে ভালবাসিতেন ভালবাসার প্রতীক রূপে অর্থাৎ মানুষকে ভালবাসার পরে সেই ভালবাসা ভগবানে অর্পণ করিতেন। নরভাবের ভালবাসা ভগবৎপ্রেমের দ্বার মাত্র। সূফী প্রেমের এমন মহিমা নাই যে তাহার আস্বাদনের জন্য ভগবান্ নররূপে প্রকট হন। মানুষই প্রেমের বলে উন্নীত হইয়া ভগবত্তা লাভ করে। ভগবানকে নামাইয়া মানুষ করিতে পারে না। আর একটি কথা : কাম ও প্রেমের সম্বন্ধ কি? প্রেমই ভালবাসা—কাম ভালবাসা নহে। কামের লক্ষণ কি? রাধাকৃষ্ণের প্রেম কামগন্ধহীন—ইহার অর্থ কি? সূফী প্রেমও তাই। দৈহিক সম্বন্ধ কি কাম? তাহা নহে। রাধাপ্রেম ও সূফী প্রেম—উভয়ত্রই দেহসম্বন্ধ ছিল। তবে কাম কি? "আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা"। এ সম্বন্ধে তোমার ধারণা বিস্তারিত জানাইবে। খৃষ্টীয় mystic দের মধ্যেও যাঁহারা Christ এর দর্শন পাইতেন তাঁহারা তাঁর অঙ্গ স্পর্শ লাভ করিতেন। অথচ তাতে কাম থাকিত না, বরং কাম নিবৃত্ত হইত। **** সপ্তাহে একখানা পত্র লিখিবার ব্যবস্থা করিতে পার ত ভাল হয়। ** ভক্ত ভগবানের চরণে স্থান পায়, ভগবান্ তাকে বুকে রাখেন। পরে তাকে অঙ্গে অঙ্গ দান করেন—তার পরে উভয়ে মিলিয়া এক শরীর হন। দুইজন—অথচ শরীর এক। আবার এমনও হয় দুই শরীর—এক আত্মা। পরে দুইজন মিলিত হন—দুই শরীরও মিলিত হয়।

২২. ৫ ৪৫

সম্ভোগকায়টী আনন্দময়—উহা পুণ্য সম্ভারের ফলস্বরূপ। ধর্মকায় জ্ঞান-সম্ভার হইতে অভিব্যক্ত হয়। পুণ্য সম্ভার ও জ্ঞানসম্ভার পূর্ণ না হইলে বুদ্ধত্বের প্রাকট্য হইতে পারে না। হলাদিনী শক্তির প্রভাবে যেমন বৈষ্ণবাচার্য-সম্মত আনন্দতত্ত্ব নিজেকে নিজে আস্বাদন করেন ও অন্যকেও অধিকারানুসারে করান, সম্ভোগকায়ের কল্পনাও কতকটা সেইপ্রকার। ইহা সকলে দেখিতে পায় না—যার regeneration না হইয়াছে তার পক্ষে ইহা অদৃশ্য, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা অদৃশ্য নহে যদিও "লোকোত্তর" বটে। বোধিসত্ত্বগণ ইহার দর্শন লাভ করেন। সুখাবতীতে যে অমিতাভ স্বরূপ আছেন তাহাও এক হিসাবে বুদ্ধের সম্ভোগকায় রূপেই পরিগণিত হয়। আনন্দ ও করুণা উহার বৈশিষ্ট্য। উহা এক হিসাবে নিত্য, কারণ উহার মৃত্যু হয় না। আর এক হিসাবে অনিত্য কারণ ধর্মকায়ে প্রবেশকালে উহার সংকোচ হয়। অর্থাৎ গুটাইয়া যায়। ধর্মকায় বস্তুতঃ পরমার্থ সত্য—উহা অনিত্যের অতীত, নিত্যেরও অতীত। ধর্মকায় বিশুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপ, যাহাতে বাসনার স্পর্শমাত্র নাই। কিন্তু সম্ভোগকায়ে ক্লেশ না থাকিলেও ক্লেশহীন বাসনা থাকিতে পারে। ক্লেশ নাই বলিয়া উহা লোকোত্তর কিন্তু শুদ্ধ বাসনা আছে বলিয়া উহা আনন্দরূপ। ত্রিকায়সূত্রে তিনটী কায়েরই বৈশিষ্ট্য দেখান আছে। দ্বৈত আগমে যেমন বিশুদ্ধ অধ্বাতে অধিকার-অবসর, ভোগাবসর ও লয়াবসর আছে, তদ্রূপ বৌদ্ধাগমেও নির্মাণ, সম্ভোগ, ও ধর্মকায়ের স্থান আছে। বস্তুতঃ যিনি তত্ত্বাতীত তাঁহারই ত শুদ্ধ তত্ত্বরূপ কায়া। এ সব কায়া বুদ্ধের, অবুদ্ধের নহে। অর্থাৎ যিনি সত্যে জাগ্রৎ হন নাই তাঁহার এ সব কায়া হয় না। কেহ কেহ স্বভাবকায় নামে ধর্মকায়ার অতীত একটী কায়া স্বীকার করেন। ষোড়শী ও সপ্তদশী কলার আবশ্যকতার অনুরূপ এই স্বভাবকায়া স্বীকারের যুক্তি Resurrection body টী কতকটা সম্ভোগকায়ার অনুরূপ। ঐটী শুদ্ধ মায়ার দেহ বা সিদ্ধ দেহ। কিন্তু চিন্ময় দেহ বা জ্ঞান দেহ নহে। ঐ সিদ্ধ দেহ দ্বারাই জগতের মঙ্গল কার্য করা হয়। পঞ্চভূত, দেশ ও কাল উহাকে বাধা দিতে পারে না। উহা শুদ্ধ বলিয়া অমর দেহ—জরামরণবর্জিত দেহ, কিন্তু উহাতে মায়া আছে, তাই উহা দ্বারা জগতের সঙ্গে ব্যবহার চলে। সম্ভোগকায়ও কতকটা ঐ জাতীয়। সিদ্ধ দেহ ও স্বরূপতঃ সাধারণ লোকের অদৃশ্য। তবে কার্য করাব সময় উহা নির্মাণ-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। যে শক্তির দ্বারা উহা হয় তাহা বুদ্ধের উপায়-কৌশল। বৈষ্ণবাচার্য বলিবেন—"যোগমায়া"। Ascension এর ব্যাপারটী দিব্যদেহের

ব্যাপার। "Glory"—ঐটী পরমমুক্ত দেহ (সিদ্ধদেহটী জীবন্মুক্ত দেহ) বা চিন্ময় দেহ বা জ্ঞানদেহ। বৌদ্ধসম্মত ধর্মকায়ার সহিত উহার কতকটা সাদৃশ্য আছে। ধর্মকায় বিকল্পের অতীত। সকল বুদ্ধেরই ধর্মকায় একই। সম্ভোগকায়াদি সম্বন্ধে বৈচিত্র্য আছে। ধর্মকায়ে যেন সব radius গুলি meet করে।

১৪ ৫ ৫১

৭৮

সাতটী প্রশ্নের উত্তর সংক্ষেপে ঃ

১। শিবত্ব ও বিদেহকৈবল্য আলাদা। কৈবল্যে আণবমল থাকে, বোধ থাকে শুদ্ধ, শক্তি স্ফুরণহীন। নিষ্ক্রিয় জ্ঞানের অবস্থা। শিবত্বে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তির ভেদ থাকে না। শিব হতেও শক্তির ভেদ থাকে না। তবে শিব ও পরমশিব ঠিক এক না। দ্বৈত মতে জীব শিবত্ব পায় না—পরমশিব হয় না। অদ্বৈত মতে তাও হতে পারে। বৈষ্ণব মতে জীবস্বরূপ=অণু। তাই মুক্তিতে অপ্রাকৃত দেহ সত্ত্বেও জীব বিভুস্বরূপ ভগবানের আশ্রিত। আগম মতে অণুত্ব জীবের প্রকৃত স্বরূপ না—একটী মল বা আবরণ ··। শিবত্বই তার প্রকৃত স্বরূপ, তা মলহীন ও সংকোচহীন।

২। শ্রীরাম ঠাকুর ও শ্রীগোস্বামী প্রভু তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ ছিলেন। জীব স্বরূপে ভগবদভিন্ন—তাঁহারা জানিতেন। তবে অভিন্নবস্তু লীলাস্থলে আশ্রয় ও আশ্রিতভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। পরম অনুভূতির মধ্যে বৈষ্ণব বা তান্ত্রিক নাম চলে না।

৩। চৈতন্য যা বলেছেন সত্য। জীবের জীবভাবাশ্রিত চূড়ান্ত স্বরূপে অণুত্ব থাকিবেই। তাই প্রতি জীবই শিব হইলেও প্রতি জীবই জীব হিসাবে অণু তাহাতে ভুল নাই।

৪। শঙ্কর—বেদান্তে নির্গুণ ব্রহ্ম সত্য, সগুণ ব্রহ্মও সত্য। জীব ও ঈশ্বর উভয়ের স্বরূপ ঐ নির্গুণ ব্রহ্ম। ব্যবহার ভূমিতে জীব ঈশ্বরের ভেদ আছে কিন্তু স্বরূপে ভেদ নাই। তাই স্বরূপে জীব ঈশ্বর একই। ব্যবহারে উভয়ের পার্থক্য আছে। তা দূর হয় না। স্বরূপে এক হয়েও লীলার দিকে নানাত্ব স্বীকার করা হয়। তবে ·· লীলার দিকটা অতিক্রান্ত হয়। বৈষ্ণবমতে পরম বস্তু নিত্য সগুণ। নির্গুণ সত্তা উহারই অঙ্গজ্যোতি বা আভা। তবে এই সগুন ব্রহ্ম শঙ্করের সগুণ ব্রহ্ম না। ইহা মায়াতীত,

মহামায়ার অতীত, কৈবল্যপদের অতীত। কবীর মতে ইহা নির্গুণ-সগুণের পরাবস্থা। তবে জীবস্বরূপ এই পরম পুরুষের স্বরূপের অবিচ্ছিন্ন অংশ জীব আত্মবিস্মৃত, তাই ইহা ভুলিয়া গিয়াছে। বিস্মৃতির কারণ ধামরূপ ব্রহ্মজ্যোতির প্রভাব, অদ্বৈত আগমে সগুন-নির্গুনের সামরস্য = পূর্ণত্ব। জীবের স্বরূপ ইহা হইতে ভিন্ন না।

৫। ব্যক্তিগত আলোচনা অনাবশ্যক। তবে তুমি তাঁকে গ্রহণ করিতে পারিলে তিনি তোমার নিকট সেইভাবেই প্রকাশিত হবেন—অসম্ভব কিছুই নাই।

৬। সকল দেবতারই চিন্ময় নিত্যস্বরূপ আছে উহা অক্ষর পরমচৈতন্যেরই একটি রূপ। যিনি অরূপ তিনি নিত্যই অনন্তরূপ ধারণ করিয়া আছেন। কোন রূপ ধারণ করিতে হয় না তবে বিসর্গ শক্তির দ্বারা যখন যেরূপ বিচ্ছিন্নবৎ করিয়া ভক্তের নিকট প্রকাশিত করেন তখন বলা হয় ঐরূপ তিনি ধারণ করিলেন। বস্তুতঃ তাঁহাকে আশ্রয় না করিয়া কোন রূপই থাকিতে পারে না। তিনি দর্শন দেন ইহাও সত্য। আবার তিনি দর্শন দেন না, জীব দর্শন আপনিই পায়—ইহাও সত্য। ভাবের পার্থক্য মাত্র। দুর্গা কালীর ন্যায় গায়ত্রীরও নিত্যরূপ আছে।

৭। দেবদেবী ইষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু গুরুর স্থান গ্রহণ করিতে পারেন না। যাহা গুরুর করণীয় তাহা ইষ্ট দেবতার দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। ইষ্ট ও গুরু এক হইলেও ইষ্ট গুরুর অধীন—গুরু ইষ্টের অধীন নহে। গুরু কৃপার বলে সবই করিতে পারেন কিন্তু কৃপাশূন্যের যাহা প্রাপ্য তাহা দিতে পারেন না। কৃপা যেমন সত্য তেমনি পৌরুষ তদপেক্ষা কম সত্য নহে। চরমে মহাকৃপা ও মহাপৌরুষ একই বস্তু। তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য। বহুদিন কিছু অনুভব না হইলেও এক মুহূর্তে সব পরদা খুলিয়া যাইতে পারে। কোন মহাপুরুষ কাহাকেও দর্শন দিয়া তাহার আমূল পরিবর্তন করিতে পারেন না। তবে কোন বিশিষ্ট পথে মানুষের জীবনধারাকে চালিত করিতে পারেন। ইহাও কম কথা নহে। এ পর্যন্ত কেহই পূর্ণত্ব লাভ করেন নাই। সেই সত্য নিয়তির ক্রম লক্ষণ করা সব সময় সম্ভবপর হয় না। সাক্ষাতে সব বুঝাইয়া দিব।

যোগীর পরীক্ষা সম্বন্ধে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। প্রথমতঃ আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের দিক্ হইতে যোগী শব্দের অর্থ বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। তন্মধ্যে বর্তমান উপলক্ষ্যে আমি দুইটি দৃষ্টি আলোচনার জন্য গ্রহণ করিতেছি। একটি পাতঞ্জল দৃষ্টি অনুসারে এবং অন্যটি শাক্ত অদ্বৈত দৃষ্টি অনুসারে। এতদ্-ব্যতীত পরীক্ষা বলিতে স্থূল দৃষ্টিতে যাহা বাহ্য পরীক্ষা বলিয়া পরিচিত সে বিষয়ে কোন আলোচনা করিতেছি না। ইহা ভিতরেরই পরীক্ষা, নিজের কাছে নিজেরই পরীক্ষা। পাতঞ্জল যোগের লক্ষ্য সমাধিমার্গ অবলম্বন করিয়া চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদনপূর্বক চিত্তবৃত্তিকে সম্যক্ নিরুদ্ধ করার পর প্রকৃতির স্তর হইতে বিবেকখ্যাতির দ্বারা কেবল চিদাত্মকরূপে স্বরূপ-স্থিতি লাভ করা। জ্ঞান একাগ্র না হইলে প্রজ্ঞারূপ ধারণ করে না এবং বাহ্যভূমি হইতে ক্রমশঃ ভিতরে প্রবেশ না করিতে পারিলে প্রজ্ঞাও সম্যক্ প্রজ্ঞা-রূপে পরিণত হয় না। কারণ সম্যক্ প্রজ্ঞা না হইলে চিৎ ও অচিতের অবিবিক্ত সংমিশ্রণ হইতে মুক্ত হইয়া সম্যক্ প্রজ্ঞাও খ্যাতিরূপে পরিণত হয় না এবং আত্মসাক্ষাৎকারের পর এই বিশুদ্ধ খ্যাতিও নিরুদ্ধ না হইলে আত্মস্বরূপ চিতিশক্তির অভিব্যক্তি হয় না। প্রথমতঃ লৌকিক বৃত্তিজ্ঞান হইতে প্রজ্ঞারূপী সমাধিজ্ঞানের জন্য চেষ্টা করিতে হয়। এই প্রজ্ঞা একাগ্রভূমিতে অধিগত এবং ক্রমশঃ অন্তর্মুখ হইয়া বিশুদ্ধ অস্মিতা প্রজ্ঞারূপে পরিণত হয়। ইহাই ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা কিন্তু ইহা বিশুদ্ধ জ্ঞান নহে। ইহা বিশুদ্ধ হইলে চিত্ত ঐশ্বর্যের দিকে অগ্রসর না হইয়া বিবেকের দিকে অগ্রসর হইতে বাধ্য। অস্মিতা প্রজ্ঞার মধ্যে চিদংশ ও অচিদংশ অবিবিক্তরূপে মিশ্রিত আছে। এই অবস্থায় ভোগবিতৃষ্ণা থাকিলেও গুণে বিতৃষ্ণা থাকে না। তাই পরবৈরাগ্যের আবির্ভাব এই অবস্থায় সম্ভবপর হয় না। তদনুসারে কৈবল্যের পথে গতি হয় না বলিয়াই ঐশ্বর্যের দিকেই প্রবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থায় দেহ ত্যাগ হইলে কার্য-ঈশ্বররূপে প্রতিষ্ঠালাভের সম্ভাবনা থাকে। ইহা কোন না কোন ব্রহ্মাণ্ডে অধিষ্ঠাতৃভাবে স্থিত। ইহার মধ্যেও স্তরগত ভেদ আছে, এখন অবশ্য সে বিষয় আলোচ্য নহে। যে আত্মা বিশুদ্ধ জ্ঞানপ্রার্থী সে এই পথে না যাইয়া বিবেকের পথে অগ্রসর হয় এবং তাহার ফলে গুণবিতৃষ্ণারূপ পরবৈরাগ্য লাভ করে। এই পর-বৈরাগ্যের ফলে প্রকৃতির আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ দ্রষ্টারূপে আত্মা স্বরূপাবস্থিতি প্রাপ্ত হয়।

অস্মিতাসমাধি পর্যন্ত আয়ত্ত হইলে যোগীর ক্রমিক চারিটি স্থিতির মধ্যে প্রথম স্থিতি লাভ হয়। এই অবস্থায় জ্যোতি আয়ত্ত থাকে এবং শক্তির বিকাশ ও অনেকটা অধিগত হয়। ইহার ফলে এমন একটি অবস্থার আবির্ভাব হয় যাহাকে এক হিসাবে গ্রন্থি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অবস্থা লাভের অব্যবহিত পরেই যোগীর জীবনে একটি সংকটময় স্থিতির উদয় হয়। এই যে অবস্থা তাহা সম্প্রদায়বিদ্‌গণ প্রথমকল্পিক নামে অভিহিত করেন। কারণ যোগি জ্যোতিকে আয়ত্ত করিয়াছেন সত্য এবং এই জ্যোতি প্রজ্ঞাজ্যোতি তাহা ও সত্য কিন্তু ইহা নির্মল নহে বলিয়া নিশ্চিন্ত অবস্থার প্রাপ্তি ইহা হইতে হয় না। কারণ বিশ্বের মধ্যে যে সকল দিব্যশক্তি বা পুরুষ আছেন তাঁহারা ঐ জ্যোতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যোগীর নিকট সমাগত হন এবং তাহাকে নানাপ্রকার শক্তির প্রালোভন দেখাইয়া মোহিত করার চেষ্টা করেন। নিম্নস্তরের যোগীর পক্ষে এই প্রকার সম্ভাবনা থাকে না, কেননা তাহাদের জ্যোতি নির্মল নহে। এই জ্যোতি নির্মল হইলেও কিঞ্চিৎমল ইহাতে বিদ্যমান থাকে, যাহার ফলে এই পরিস্থিতর উদয় হইয়া থাকে। যাঁহারা বিবেকমার্গে প্রস্থান করেন তাহাদের এই মলিনতা থাকে না। চিৎ ও অচিতের গ্রন্থি হইতেই এই মলিনতার উদয় হইয়া থাকে। যাহাদের গ্রন্থিভেদ হইয়াছে এবং যাহারা গ্রন্থিভেদের পথে অগ্রসর হইয়াছে তাহাদের এই আশঙ্কা নাই। গ্রন্থিভেদ না হইয়া যোগশক্তির কিঞ্চিৎ স্ফুরণ হইয়াছে পাতঞ্জল যোগ এই অবস্থাকে মধুমতী ভূমি বলিয়া থাকেন। সম্প্রজ্ঞাত যোগের চরম অবস্থায় উন্নীত হইলেও যোগীর পতনের সম্ভাবনা থাকে। এই অবস্থায় যোগীর চিত্ত আপেক্ষিকভাবে নির্মল হইলেও তাহাতে দুইটি মল থাকিয়া যায়, তাহার মধ্যে একটির নাম আসক্তি এবং অন্যটির নাম অহঙ্কার। সুতরাং বুঝিতে হইবে আসক্তিবর্জিত হইয়া নিরহঙ্কার না হইতে পারিলে কৈবল্যের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। যাঁহারা বিবেকের পথে অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা এই দুইটি মল হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

এই স্থিতিটি যোগীর পরীক্ষাস্থান। এই অবস্থায় যোগীর নানা প্রকার বিভূতির উদয় হইলেও উহার বিশেষ কোন মূল্য নাই। যিনি এই পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হন অর্থাৎ আসক্তি ও অহঙ্কার হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিতে পারেন তাঁহার পক্ষে পূর্বোক্ত জ্যোতি মলিনতা ত্যাগ করিয়া নির্মলভাব ধারণ করে। তখন এই নির্মল জ্যোতিই যোগীর অধ্যাত্মমার্গে পরম অস্ত্ররূপে পরিণত হয়। পূর্বে যোগী বিভূতি লাভ করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু উহা কল্পিত শক্তি, নিজ শক্তি নহে, ঐ সব বিভূতি লাভ করার জন্য যোগীর সংযম অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। একই বিষয় অবলম্বন করিয়া যোগীর ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অবলম্বন করার নাম সংযম। এই সংযম আলম্বন ভেদে নানাপ্রকার। যোগবিভূতির ইহা কৃত্রিম অবলম্বন। সংযম ব্যতীত বিভূতি প্রকাশিত হয়

না। ইহার একমাত্র কারণ এই যে পূর্বোক্ত জ্যোতি নির্মল নহে। কিন্তু জ্যোতি নির্মল হইলে সংযমের প্রয়োজন নাই। জ্যোতির নির্মলতার সঙ্গে সঙ্গে উহা দেহ ও ইন্দ্রিয় সত্তাতে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহার ফলে ভৌতিক দেহের উপাদান শুদ্ধ হইয়া যায় এবং ইন্দ্রিয়েরও উপাদান শুদ্ধ হয়। ইহাই Physical transformation এর যথার্থ স্বরূপ। সমগ্র চিত্তই তখন বিশুদ্ধ অবস্থা লাভ করে। বলা বাহুল্য, পূর্বে ইন্দ্রিয়গুলি এই প্রকার বিশুদ্ধি লাভ করে নাই, কারণ যোগীর অস্মিতাভূমিতে প্রাপ্ত জ্যোতি সম্যক্ নির্মল ছিল না। নির্মল না থাকার কারণ উহার সঙ্গে আসক্তি ও অহংকার মিশ্রিত ছিল। বর্তমানে জ্যোতি এত নির্মল হইয়াছে যে উহাতে আসক্তি ও অহংকারের লেশমাত্র বিদ্যমান নাই। এইটি যোগীর তৃতীয় অবস্থা। এই অবস্থায় ভূতেন্দ্রিয় শুদ্ধির ফলে বিভিন্নপ্রকার শক্তির স্ফুরণ হয়। ইহা আপনা আপনিই সংঘটিত হয়। ইহার জন্য সংযমের আবশ্যকতা নাই। তখন এই শুদ্ধ আধারে ইচ্ছাশক্তির উদয় হয় এবং যোগীর ইচ্ছানুসারে কার্যসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। সংযম প্রয়োগ করিতে হয় না এবং দেহেন্দ্রিয়ের আশ্রয় গ্রহণও আবশ্যক হয় না। ইহাই ইচ্ছাশক্তির উদয়ের ইতিহাস। এই ইচ্ছাশক্তির রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলেও তাহারও একটি ক্রমবিকাশ আছে। শুক্ল পক্ষের চন্দ্রমার যেমন ক্রমিক বিকাশ হয় ইচ্ছাশক্তির ক্রমবিকাশও সেইরূপ। পূর্ণিমাতে যেমন চন্দ্রের সমস্ত কলা পূর্ণ হয় সেইরূপ ইচ্ছাশক্তিরও ক্রমবিকাশের একটি স্থিতি আছে। ইহাই পূর্ণতার স্থিতি। ইহার পরে ইচ্ছার উদয় ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে। চরম অবস্থায় ইচ্ছা মোটেই থাকে না। এই অবস্থাই আত্মার স্বরূপস্থিতিরূপ কৈবল্যে প্রবেশের পূর্ববর্তী অবস্থা। যতদিন দেহসম্বন্ধ থাকে এবং কৈবল্যের উদয় না হয় ততদিন মহাইচ্ছার দ্বারা সকল ব্যাপার নির্বাহিত হয়। শিশু যেমন ইচ্ছা না করিলেও মায়ের ইচ্ছাতে তাহার সকল কার্য হয়, যোগীও তখন নিজে ইচ্ছা না করিলেও মহাইচ্ছার দ্বারা তাহার সকল কার্য নির্বাহিত হয়। যতদিন দেহ থাকিবে ততদিন এই অবস্থা। তাহার পর কৈবল্য। তখন মহাইচ্ছারও কোন প্রশ্ন থাকে না।

এইটিই হইল ঐশ্বর্যের মধ্য দিয়া কৈবল্যে প্রবেশের মার্গ। যাহারা ঐশ্বর্যকে অবলম্বন না করিয়া প্রথমেই বিবেক ও পরবৈরাগ্যের পথে যায় তাহাদের বিবরণ প্রসিদ্ধ আছে।

এই হইল পাতঞ্জল যোগী সম্প্রদায়ের পরীক্ষা এবং পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার ইতিহাস। এইবার অদ্বৈত শক্তি সম্প্রদায়ের কথা বলিব।

এইবার শাক্ত অদ্বৈত দৃষ্টির কথা বলিতেছি। এই দৃষ্টিরও বহু দিক্ আছে কিন্তু আমি বিশেষভাবে কোন সিদ্ধান্তের দিক্ হইতে আলোচনা করিব।

শিবাদ্বৈতের প্রকার ভেদ আছে, শাক্তাদ্বৈতেরও আছে। উভয় সিদ্ধান্তে দৃষ্টিগত সাম্য সত্ত্বেও কোন কোন স্থলে বৈলক্ষণ্য উপলব্ধ হয়, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। জীবভাব বা পশুভাব পরমেশ্বরের স্বাতন্ত্র্যমূলক আত্ম-সংকোচের ফলেই আবির্ভূত হয়। ইহা তিরোধান শক্তির ফল। এই তিরোধান শক্তিই স্বাতন্ত্র্য শক্তির একটা দিক্ যাহা পূর্ণ সত্তাতে বিদ্যমান রহিয়াছে। জাগতিক দৃষ্টিতে তিরোধান শক্তির ব্যাপার অনাদি কালের সহিত সংশ্লিষ্ট। জীব অথবা পশুমাত্রেই এই দৃষ্টি অনুসারে অনাদিকাল হইতেই সংকুচিত অবস্থায় সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতেছে। কর্মপ্রভাবে ঊর্ধ্বগতি ও অধোগতি হইলেও মায়া ও মহামায়ার আবরণ একই প্রকার রহিয়াছে; কারণ মূলগত সংকোচ অনাদিসিদ্ধ। কৌলগণ বলেন, অকুল বোধসমুদ্র যখন কাহাকেও অনুগ্রহ করিবার জন্য তরঙ্গিত হইয়া উঠে তখন উহার এই তরঙ্গই পশুজীবনের পরিবর্তন সাধনের মূলসূত্র হয়। এই তরঙ্গকে ঊর্মি বলিয়া কৌলগণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। জীব যখন হইতেই জীবরূপে প্রকটিত হইয়াছে তখন হইতেই সে কালের অধীন। পরমেশ্বরে অথবা মহা-প্রকাশ স্বরূপে আবরণ অথবা নিমীলন এবং আবরণ-উন্মোচন অথবা উন্মীলনের খেলা স্বভাবসিদ্ধ। নিমীলন অবস্থায় জীব বা পশু কালের অধীন থাকে এবং উন্মীলন অবস্থা গুরুকৃপাসাপেক্ষ। এক অখণ্ড সত্তাই কালরূপে জীবকে তাহার অধীন করিয়া রাখিয়াছে। কালের প্রভাবের সময় মহামায়া, মায়া, প্রকৃতি এবং পঞ্চভূতের খেলা চলিতে থাকে। এ সবই আবরণের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির ব্যাপার। অনুগ্রহশক্তি গুরুশক্তিরূপে উন্মীলনের কার্য করিয়া থাকে। অকুল নামক বোধসমুদ্রের ঊর্মি যখন অনুগ্রহের পাত্র বা লক্ষ্য জীবের উপর পতিত হয় তখনই উক্ত জীবের জীবনে মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা আরম্ভ হয়। যাহার ফলে জীব ক্রমশঃ জীবভাব হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণের দিকে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়। শুদ্ধ বিদ্যার খেলাটি অকুলের আদি-স্পন্দন রূপে ইহা মনে রাখিতে হইবে। জীব অনাদি কাল হইতেই অজ্ঞানমূলক বিকল্প দৃষ্টির আশ্রয়। যখন অনুগ্রহাত্মক চিদূর্মি পূর্ববর্ণিত ঐ বিকল্প দৃষ্টিকে আঘাত করে তখন হইতে জীবসত্তার ভিতরে আমূল পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই যে ঊর্মির কথা বলা হইল ইহা চিৎশক্তিরই বিকাশ ভিন্ন অপর কিছু নহে। এই উন্মেষিত চিৎশক্তি সর্বপ্রথম কালকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। ইহার স্বভাবই কালকে গ্রাস করা। জীব কালের অধীন থাকিয়া বিকল্প রাজ্যে সঞ্চরণ করিতে থাকে। সুতরাং যে ব্যাপারে কালগ্রাস সম্পন্ন হয় তাহার প্রভাবে জীবের দৃষ্টি হইতে বিকল্পজালের অপসারণ অবশ্যম্ভাবী। এই যে বিকল্পজালের নিবৃত্তি ইহা পূর্ণ হইতে সময় লাগে এবং ক্রম অনুসারে ধীরে ধীরে এই নিবৃত্তি সংঘটিত হয়। শুদ্ধ বিদ্যারূপা চিৎশক্তির প্রথম কার্য মলকে শোধিত করা।

এই শোধন ব্যাপারে এক একটি করিয়া ক্রমশঃ প্রতি স্তরই শোধিত হয়। প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেয় এই ত্রিপুটীতে জীব আবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রমাতা অন্তরতম, প্রমাণ মধ্যবর্তী এবং প্রমেয় বাহ্য। বাহির হইতে ভিতরের দিকে ক্রমশঃ এই শোধন কার্য চলিতে থাকে। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে সর্বপ্রথম প্রমেয় শুদ্ধির ব্যাপার সংঘটিত হয়। যাহার ফলে জীবাত্মার অধ্যাত্মমার্গ বিমল আলোকে আলোকিত হইতে থাকে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য গুরুকৃপালব্ধ এই প্রাথমিক শুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়া ছিলেন—বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরী-তুল্যং নিজান্তর্গতং মায়য়া বহিরিব উদ্ভূতম্।

গুরুর কৃপাদৃষ্টি সঞ্চারের ফলে এই ভাবটি উন্মীলিত হয় অর্থাৎ প্রমেয় শুদ্ধির ফলে বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে বিশ্ব দ্রষ্টা হইতে বাহ্যরূপে প্রতীত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে বাহ্য নহে। দ্রষ্টা মায়ার অধীন বলিয়া অর্থাৎ দেহাত্মবোধে স্থিত বলিয়া নিজের অন্তর্গত বিশ্বকে বাহ্যরূপে অনুভব করে। বস্তুতঃ তাহার বাহিরে বাহ্য বলিয়া কিছুই নাই। ইহা মায়ার খেলা। প্রমেয় শুদ্ধি মায়ানিবৃত্তির প্রথম ব্যাপার। জীবমাত্রই দেহাত্মভাবসম্পন্ন। দেবতা, দানব, মনুষ্য, পশুপক্ষী প্রভৃতি সর্বত্রই এই দেহাত্মভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন সদ্‌গুরুর কৃপায় এই দেহাত্মভাব কাটিতে আরম্ভ করে তখন প্রথমে বুঝিতে পারা যায় যে বিশ্ব তাহার বাহিরে নহে, উহা তাহারই মধ্যে। বিশ্ব দেহের বাহিরে হইলেও আত্মার বাহিরে একথা বলা চলে না। গুরুকৃপায় মায়া ক্ষীণ হইতে আরম্ভ করিলে সর্বপ্রথমে দেখিতে ও বুঝিতে পারা যায় যে এই দৃশ্য-প্রপঞ্চ কিছুই তাহার বাহিরে নহে। চিৎশক্তি কুণ্ডলিনীরূপে যতদিন নিদ্রিত ছিল ততদিন দেহাত্মবোধও ছিল এবং বাহ্য জগতের সত্তা সত্যরূপে অনুভূত হইত। কিন্তু চিৎশক্তি জাগ্রত হইলে এই ভাবের পরিবর্তন ঘটে। তখন চিৎশক্তি বহির্মুখ হইয়া এই তথাকথিত বাহ্য সত্তাকে আকর্ষণ করিয়া ভিতরে লইয়া আসে। বিশ্ব বিসর্গশক্তির দ্বারা বাহ্য পদার্থরূপে স্থাপিত হইয়াছিল। এখন বিন্দুশক্তির প্রভাবে অর্থাৎ জাগ্রৎ কুণ্ডলিনীর অন্তরাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ইহা আত্মার ভিতরে সমানীত হয় অর্থাৎ বিশ্ব যে আত্মস্বরূপের অন্তর্গত একটি আভাস মাত্র তাহা তখন বুঝিতে পারা যায়। ইহার তাৎপর্য এই যে গুরু-কৃপায় সঙ্গে সঙ্গে দেহাত্মভাব শিথিল হইতে আরম্ভ হয়।

এই অবস্থাটি বিশেষরূপে প্রণিধান করা উচিত। যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয়-শক্তি বলি তাহা সংবিৎশক্তিরই অংশস্বরূপ। এই সংবিৎ সদ্‌গুরু হইতে প্রসূত হইয়া কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। ইন্দ্রিয়ের কার্য নিজ নিজ বিষয়কে ভোগ করা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সংবিৎশক্তি বিষয়কে ভোগ করিয়া থাকে। তখন এই বিষয়ভোগরূপ জ্ঞান রাগরূপে পরিণত হয়। ইহার ফলে ভোক্তা আত্মার তৃপ্তি সাধন হয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ বিষয় প্রপঞ্চরূপে বিস্তৃত রহিয়াছে

অজ্ঞান অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এই বিষয়ভোগ সম্পন্ন হয়। যে সকল ইন্দ্রিয় এই সকল ভোগ আস্বাদন করে তাহারা চিৎশক্তির প্রভাবে প্রভাবিত নয় বলিয়া বিষয়ভোগরূপ তৃপ্তি স্থায়ীভাবরূপে আত্মাতে সঞ্চিত হইতে পারে না। তাহার ফলে ভোক্তা আত্মাতে তৃপ্তির পরিবর্তে অতৃপ্তিই থাকিয়া যায়। এইজন্য ভোগাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না। ইহার ফলে ভোগের আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়া যায়। শাস্ত্রে বলিয়াছেন—ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। ইহার চরম ফল এই হয় যে চিত্ত নিরন্তর বিষয়ভোগের দিকে লোলুপ হইয়া থাকে। কিন্তু যখন ইন্দ্রিয়শক্তি অর্থাৎ করণেশ্বরী দেবী গুরুকৃপার প্রভাবে সংবিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় তখন পূর্বোক্ত অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ হয়। সংবিৎ বিষয়কে গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করে এবং এই তৃপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ভোগ ক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া যায়। এই যে ভোগের কথা বলা হইল ইহাই শ্রেষ্ঠ ভোগ। সংসারী জীব পশুভাবাপন্ন বলিয়া এই প্রকার ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। কৌলগণ বলেন—বীরসাধক ভিন্ন কেহ ভোগকে রাগরূপে পরিণত করিতে পারেন না বীরসাধক বীর্যসম্পন্ন এবং এই বীর্য জাগ্রৎ কুণ্ডলিনী অথবা উন্মেষপ্রাপ্ত চিৎশক্তির প্রভাবসম্পন্ন। ইহাই বীর সাধকের মুখ্য অবলম্বন। শিবসূত্রে বলা হইয়াছে—"ত্রিতয়ভোক্তা বীরেশঃ।" অর্থাৎ যিনি শ্রেষ্ঠ বীর তিনিই তিনটিকে অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিকে তুরীয় আনন্দরূপে ভোগ করিতে পারেন পশু অর্থাৎ সাধারণ জীবের পক্ষে ইহা সম্ভব নহে। সাধারণ জীব জাগ্রৎ ও স্বপ্ন একসঙ্গে ভোগ করিতে পারে না, তিনটিকে একসঙ্গে করা তো দূরের কথা। যাহাকে কোন কোন যোগী integration বলিয়াছেন তাহা সাধারণ জীবের নাই। তাই খণ্ডকে অখণ্ডরূপে দেখিবার ক্ষমতা তাহাদের জন্মে না। এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগ ইহাই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। উৎপলাচার্য বলিয়াছেন যে—

তত্তদিন্দ্রিয়মুখেন সন্ততং যুষ্মদর্চনরসায়নাসবম্।
সর্বভাবচষকেষু পূরিতেষু আপিবন্নপি ভবেয়মুন্মদঃ॥

এই যে ভোগের কথা বলা হইল ইহাই বস্তুতঃ ভগবানের অর্চনা। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীভগবানের পূজারসায়ন রূপ যে আসব তাহা যাবতীয় ভাবরূপ চষক বা পাত্রে পূর্ণরূপে ভরিতে পারিলে নেশা অথবা গাঢ় তন্ময়তা আবির্ভূত হয়। চক্ষুর দ্বারা রূপ দেখা বস্তুতঃ চক্ষুর দ্বারা রূপ নামক ভাবে বা চষকে পূজারস পান করা বা তন্ময় হওয়া। কানে শব্দ শুনা, ইহাও তাহাই। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষজন্য যে ভোগ ইহাই উপাসনা। জীব যখন যে অবস্থাতেই থাকুক অর্থাৎ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তাহার সর্ব অবস্থাতেই ইহা হইয়া থাকে। ইহা সবই শ্রীভগবানের পূজা। ইহা দুর্বলের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহা যে সম্পাদন করিতে পারে সে দুর্বল নহে, তাহাকেই বীর বলে। ভগবান্

শঙ্করাচার্য এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—যদ্যৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্। অর্থাৎ আমি যে কোন কর্ম করি সবই ভগবানের আরাধনা।

এইপ্রকার বিষয় ভোগের পর অর্থাৎ ভগবদর্চনার ফলে তৃপ্তির উদয় হয়। তখন অন্তর্মুখ দশা আরম্ভ হয়, বহির্মুখ ভাব আর থাকে না। যখন গ্রাহ্য পদার্থ গ্রহণের স্থিতিতে পরিবর্তিত হয় তখন করণেশ্বরী দেবীগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়শক্তি সকল বিষয়ভোগের ক্রিয়া সমাপ্ত হইবার পর তৃপ্তি লাভ করিয়া অন্তর্মুখ হয়। এই অবস্থা উদিত হইলে করণেশ্বরীবর্গ চিদাকাশরূপী ভৈরবের সঙ্গে আলিঙ্গিত হয়। অন্তর্মুখ হওয়ার পর ইহাই স্বাভাবিক অবস্থা। এই আলিঙ্গনের ফলে করণেশ্বরী দেবী ও চিদাকাশরূপ ভৈরব অভিন্ন হইয়া যায়। প্রথমে প্রমেয় প্রমাণের সহিত একত্ব লাভ করে, তাহার পর প্রমাণ প্রমাতার সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়। আলিঙ্গনের পর যে অবস্থার উদয় হয় তাহা একটি বিশ্রামের অবস্থা। তাহাকে শয়ন অবস্থা বলে। প্রশ্ন হইতে পারে যে ইন্দ্রিয়শক্তি সকল চিদাকাশের সহিত আলিঙ্গিত হইতে পারে না কেন? ইহার উত্তর এই যে সাধারণ অবস্থায় ইন্দ্রিয়শক্তি সকল বিষয়ের প্রতি আকাঙ্খা-যুক্ত থাকে। যতক্ষণ ইন্দ্রিয় বিষয়ভোগের আকাঙ্ক্ষা করে ততক্ষণ দেহমধ্যে ৭২০০০ হাজার নাড়ীর কার্য চলিতে থাকে। ঐ অবস্থায় ভিতরে ও বাহিরে একটি ক্রিয়া চলিতে থাকে যাহা স্বরূপতঃ অন্তর্দ্বাদশান্ত ও বহির্দ্বাদশান্তের মধ্যে সঞ্চরণ ক্রিয়া। এই ক্রিয়াতে যে অন্তর্মুখ গতি হয় তাহার ফলে ভিতরের দ্বাদশান্তে প্রবেশ হয় এবং যে বহির্মুখ গতি হয় তাহার ফলে বাহ্য দ্বাদশান্তে স্পর্শ হয়। এই দুইটি সংঘট্টস্থান পরস্পর মিলিত হইয়া যখন সন্ধিতে উপস্থিত হয় তখনই আত্মার পরপ্রমাতৃভাব খুলিয়া যায়। ইহাই প্রকৃত আত্ম-সাক্ষাৎকার। এই অবস্থাটি সন্ধিস্থানমাত্রেই সংঘটিত হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। প্রমেয় ও প্রমাণের সন্ধিতেও ইহা ঘটে এবং প্রমাণ ও প্রমাতার সন্ধিতেও ঘটে।

প্রশ্ন হইতে পারেঃ এই অবস্থার স্বরূপ কি অর্থাৎ এই অবস্থা ঘটিলে কি হয়? ইহার উত্তর এই যে, ঐ সন্ধিকালে পরাসংবিৎ পরিমিত প্রমাতাকে অর্থাৎ জীবকে নিজশক্তির প্রভাবে নিজের স্বরূপে মগ্ন করেন। মিত প্রমাতা যখন অমিত প্রমাতাতে মগ্ন হইয়া যায় তখন দুইটি অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হয়। এই দুইটি ব্যাপারের মধ্যে প্রাণ ও অপানের সংঘর্ষজনিত ক্ষোভ নিবৃত্তি প্রথম, অর্থাৎ এই সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়া থাকে না। শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াটি প্রাণ ও অপানের সংঘর্ষ হইতে জন্মে। ইহাই হইল একদিকের কথা। অন্য দিকে প্রমাণ ও প্রমেয়ের সংঘর্ষও নিবৃত্ত হয়। এইটিই দ্বিতীয় অবস্থা। সুতরাং এটি যে শান্ত ও নির্বিকল্পক অবস্থা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই অবস্থায় প্রাণ স্থির। অধ্যাত্মজগতে

চরণশীল পথিকের পক্ষে ইহাই প্রকৃত শিবরাত্রি। এই সময়ে চন্দ্র প্রভৃতির সহিত সূর্যও অস্তমিত হন। চন্দ্র মন, সূর্য প্রাণ, ইহা মনে রাখিতে হইবে। এই অবস্থাটি অতিক্রম করিতে পারিলে একটি বিশিষ্ট স্থিতির উদয় হয়। পূর্বে যে অবস্থার কথা বলা হইল তাহা অতি উচ্চ অবস্থা হইলেও চরম অবস্থা নহে, এ কথা বলাই বাহুল্য। এই অবস্থাটি মহাব্যোমে প্রবেশরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। আমরা সাধারণতঃ যে ব্যোম বা আকাশকে জানি তাহাতে চন্দ্র-সূর্যের সঞ্চার থাকে। মহাব্যোমে চন্দ্র ও সূর্যের সঞ্চার নাই। ইহাকে আচার্যগণ 'প্রলীনশশিভাস্করঃ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। চন্দ্র মনঃ-স্বরূপ। চন্দ্রের সঞ্চার না থাকার মানেই মনের ক্রিয়া তখন থাকে না। তখন প্রমাণ-প্রমেয়ভাব নিবৃত্ত হইয়া যায়। সূর্য বলিতে বুঝায় প্রাণশক্তিকে। সূর্য থাকে না বলিতে ইহাই বুঝায় যে প্রাণ-অপানের ক্রিয়া সম্যক্ নিবৃত্ত হইয়াছে অর্থাৎ তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের খেলাও আর থাকে না। এই অবস্থাটি বস্তুতঃ খুবই উচ্চাবস্থা কিন্তু উচ্চ অবস্থা হইলেও ইহা নিরাপদ স্থান নহে। কারণ এই অবস্থায় সর্বদাই জাগিয়া থাকিতে হয় অর্থাৎ প্রতিক্ষণেই স্বরূপ অনুসন্ধানের দিকে সতর্ক থাকার আবশ্যকতা হয়, কারণ স্বরূপ অনুসন্ধানে জাগ্রৎ না থাকিলে এই অবস্থা হইতে স্খলিত হওয়া অনিবার্য। প্রকৃত নিরাপদ ভূমি প্রাপ্ত হইলে এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় না। শিবসূত্রে 'উদ্যমো ভৈরবঃ' বলা হইয়াছে তাহা এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই। প্রাচীন যোগিগণের পরিভাষাতে এই অবস্থাই অনাখ্যা নামে পরিচিত। এই অনাখ্যা অবস্থার মধ্যে অনেকগুলি স্তর আছে। সেইগুলি ক্রমশঃ অতিক্রম করিতে না পারিলে নিরাপদ ভূমি প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সুতরাং জানিতে হইবে চিদাকাশ পর্যন্ত সাক্ষাৎকার করিলেই সব কিছু হয় না। চিদাকাশে উত্থিত হইয়াও নিজ সত্তাবোধ সর্বদা জাগাইয়া রাখিতে হয়। তাহা না করিতে পারিলে পূর্ণাহন্তাস্বরূপ পরপ্রমাতৃভাবে স্থিতিলাভ ঘটে না।

অতএব বুঝিতে হইবে এই চিদাকাশকে আশ্রয় করিয়াই পর পর বিভিন্ন দশার অনুভব করা আবশ্যক। সাধনার প্রভাবে ঊর্ধ্বগতি লাভ করা তত কঠিন নয় কিন্তু স্বরূপস্থিতি রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন। এইজন্যই আত্মবিমর্শ আবশ্যক। ইহার প্রভাবে বিকল্পরূপী সমগ্র জগৎ অন্তর্মুখ হইয়া ধীরে ধীরে লীন হইয়া যায়। এই বিকল্পরূপী জগতের লয়ের সঙ্গে সঙ্গে চরাচর গ্রাস সম্পন্ন হয়। ব্রহ্মসূত্রকার বলিয়াছেন—'অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ' অর্থাৎ আত্মা চর ও অচর সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করিয়া ঐ গ্রাসের উল্লাসে একটি রসময় স্থিতিলাভ করে। এই স্থিতি হইলেই আত্মা তখন পরপ্রমাতারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে। উহা এই যে স্বাতন্ত্র্যময় আত্মস্বরূপে স্বরূপের উন্মীলন ও নিমীলন ব্যাপার সব সময়েই থাকে। যাহাকে

স্বরূপের নিমীলন বলা হইল তাহারই নাম অনাদি মহাআবরণ বা মূল পরদা। ইহাই তিরোধান ব্যাপার। আর যাহাকে উন্মীলন বলা হইল তাহাই অনুগ্রহের ব্যাপার। স্বরূপের উন্মীলন হইলে মহামায়া নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং বহির্মুখী বৃত্তি যাহাকে সংসারচক্র বলিয়া বর্ণনা করা হয় তাহা নিজ আত্মারূপী অগ্নিতে অভেদ জ্ঞানের মধ্য দিয়া পরিণতি লাভ করে। ইহাই অন্তরস্বরূপে স্থিতি। এই পর্যন্ত যোগীর বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক হয়। ইহার পর আর বিশেষ চেষ্টা বা উদ্যমের প্রয়োজন হয় না। তাহার কারণ এই যে, এই অবস্থা আরম্ভ হইলে স্বরূপ গোপন অথবা বিস্মৃতি কখনও ঘটে না। তাই বহির্মুখ ভাবেরও শঙ্কা থাকে না। এই যে অবস্থার কথা বলা হইল ইহা যোগীদের পরিভাষাতে উন্মনা অবস্থার নামান্তর। কেহ কেহ ইহাকে ভাব-সংহার বলিয়া বর্ণনা করেন। ভাব বলিতে ভাবময় সমগ্র বিশ্ব বুঝিতে হইবে। পূর্বে যে পরিস্থিতির কথা বলা হইয়াছে তখন প্রমেয়-প্রমাণ-প্রমাতৃরূপ বাহ্য বিশ্বের উপসংহার হইয়াছিল কিন্তু ভাবময় বিশ্ব তখনও ছিল। এইবার যাহা বলা হইল তাহা ভাবময় বিশ্বের নিবৃত্তি বুঝিতে হইবে। পরাসংবিৎরূপী জগদম্বার কৃপায় ইহা সম্ভব হয়। এই অবস্থায় ভেদজ্ঞান তো থাকেই না, পক্ষান্তরে হেয় ও উপাদেয় বোধও থাকে না। ইহা পরম নির্বিকল্প স্থিতি যাহাতে শঙ্কা ও কল্পনার অবকাশও থাকে না।

কিন্তু ইহাও পূর্ণত্ব নহে। কারণ, ভাবসংহার হইয়া গেলেও ভাবের সংস্কারটা তখনও থাকে। যোগীর একমাত্র লক্ষ্য পূর্ণাহন্তা লাভ করিয়া তাহাতে স্থিতিলাভ। এই সংস্কারের মধ্যে ইদন্তার লেশ থাকিয়া যায়। অহন্তা তখনও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। এই অবস্থায় যে সংস্কার থাকে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই, কারণ এই অদ্বৈত-স্থিতিতে থাকিয়া যোগী তখন অনুভব করে—'আমিই এই সকল অভেদ অবভাসিত করিয়াছি।' মনে রাখিতে হইবে যে এ সময় কালসংকর্ষিণী শক্তির খেলা চলিতেছে। যতক্ষণ সংস্কার থাকে ততক্ষণ কালের কলনা সূক্ষ্মভাবে হইলেও কিছু না কিছু থাকেই। কালের কলনা সম্পূর্ণভাবে অস্তমিত না হইলে স্বভাবসিদ্ধ অহংকে পাওয়া যায় না। এই সময়ে অদ্বৈতযোগী অনুভব করেন 'সবই আমি'। বস্তুতঃ ইহা তখন তাঁহার দিক্ হইতে আত্মরূপী শিবেরই পূজা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। এই অবস্থা পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইবার পর যোগীকে আরও গভীর স্তরে প্রবেশ করিতে হয়। পূর্বে যে ভাবসংহারের স্থিতির কথা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা বাস্ত-বিকপক্ষে প্রমেয় পর্যন্ত সংহার, তাহার উপরের কোন অবস্থা নহে। আত্মরূপী শিবের পূজা যাহা বলা হইল তাহা আরও গভীরতর অবস্থা। ইহা প্রমাণের সংহার, শুধু প্রমেয়ের নহে। ইহা অতি গভীর ব্যাপার সন্দেহ নাই। মহ-কল্পের পর যে সংহার ইহা তাহাই। এই সমরকার স্থিতিতে প্রমেয় ও প্রমাণ

চিদাকাশে অথবা চিদগ্নিতে সম্যক্‌প্রকারে লীন হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের সমাধান আবশ্যক মনে হইতেছে। পূর্বে যে বিশ্বসংহারের কথা বলা হইয়াছে এবং এখন যাহা বলা হইল এই উভয়ের মধ্যে স্বরূপগত পার্থক্য আছে। একটি নিম্নভূমির এবং অপরটি উচ্চভূমির, ইহা বলাই বাহুল্য। প্রতি অবস্থাতেই আভাসরূপে হইলেও শঙ্কা উদয়ের সম্ভাবনা আছে। নিম্নভূমির অবস্থাতে ব্যক্তিগত প্রযত্ন বা অনুসন্ধান দ্বারা ঐ শঙ্কা দূর করিতে হয় এবং শঙ্কা নিবৃত্ত না হইলে সেখান হইতেই পতন ঘটিয়া থাকে। এই শঙ্কানিবৃত্তি নিম্নভূমিতে ব্যক্তিগত প্রযত্নের দ্বারা করা হয়। উপরের ভূমিতে শঙ্কার উদয় হইলে উহার জন্য ব্যক্তিগত প্রযত্নের আবশ্যকতা হয় না। ঐ শঙ্কা আপনা আপনিই কাটিয়া যায়। এস্থলে শঙ্কা শব্দের অর্থ কর্তব্যা-কর্তব্য বিচার। সুতরাং পূর্বোক্ত বিবরণের তাৎপর্য এই যে কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় আপনা আপনি হইয়া যায়। এই উচ্চাবস্থায় শঙ্কা ও গ্লানি উদিত হইলেও তাহাতে যোগীর পতন ঘটে না। এই উচ্চাবস্থাটি সদাশিবের অনুরূপ। এই অবস্থায় প্রমেয় তো থাকেই না, তবে প্রমাণের মধ্যে প্রমেয়ের জীবনীশক্তিটি এখনও রহিয়াছে। এই জীবনীশক্তিটি অপর কিছুই নহে, ইহাই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়রূপে প্রসিদ্ধ। এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়কে যোগীর পরিভাষাতে সূর্য বলিয়া বর্ণনা করা হয়। এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয়কে অহঙ্কারে লয় করা আবশ্যক। অহঙ্কারই পরম আদিত্যস্বরূপ। এইবার আমরা প্রমেয় ও প্রমাণ অতিক্রম করিয়া প্রমাতৃতত্ত্বে প্রবেশ করিলাম। এই পরমাদিত্যকেই গায়ত্রীমন্ত্রে ভর্গরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহারই নামান্তর ভর্গশিখা। পরাসংবিৎ ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাগুলি আত্মসাৎ করিয়া উপসংহারের চরম দশায় উপনীত হইয়াছে। এই অবস্থায় তাহার সব কলাই উপসংহৃত হইয়াছে, কেবলমাত্র অমাকলা অবশিষ্ট। এই অমাকলাই শিবকলা। ইহারই নাম পরপ্রমাতা। মনে রাখিতে হইবে ইহাও কিন্তু কলাই নিষ্কল নহে। ইহারই নামান্তর শিবকলা, যাহা আমাদের পূর্ববর্ণিত পরপ্রমাতার সহিত অভিন্ন।

কিন্তু এই যে অহঙ্কাররূপী প্রমাতার কথা পরমাদিত্যরূপে বর্ণনা করা হইল ইহা প্রমাতৃরূপ সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাও পরিচ্ছিন্ন। পরমাদিত্য হইতে ক্রমশঃ উচ্চতর অবস্থার উদয় হয়। পরমাদিত্যের ঊর্দ্ধবর্তী প্রমাতা আদিত্য হইতে উৎকৃষ্ট। তাহার পারিভাষিক নাম কালাগ্নিরুদ্র। পরমাদিত্য হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ কিন্তু ইহাও পরিচ্ছিন্ন। এই অবস্থায় আত্মা হইতে সংসারভাব সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে কিন্তু লেশমাত্র পশুত্ব তখনও আছে। বলা বাহুল্য, তখন বিষয় সংস্কার নাই এমনকি ইন্দ্রিয়সংস্কারও নাই। একমাত্র নির্বিকল্প প্রমাতাই বর্তমান, যিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত। এই পর্যন্ত প্রগতি সিদ্ধ হইলে রুদ্র অবস্থা হইতে ভৈরব অবস্থার উদয় হয়। ভৈরব অবস্থাতে

সর্বপ্রথম মহাকালভৈরবের আবির্ভাব হয়। যাহাকে তন্ত্রশাস্ত্রে মহাকালী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এই মহাকালভৈরবের শক্তি। মনে রাখিতে হইবে ইনিও কিন্তু জগদম্বা নহেন। মহাকালভৈরব বিশ্বসংস্থানে অত্যন্ত উচ্চ অবস্থায় আছেন কারণ ইঁহার পঞ্চকৃত্যের অধিকার আছে কিন্তু পঞ্চকৃত্যের অধিকার থাকিলেও ইনি পূর্ণ নহেন কারণ ইহার স্বাতন্ত্র্য নাই। স্বয়ং জগদম্বার ইচ্ছায় এবং তাঁহারই আদেশে ইনি পঞ্চকৃত্য করেন। এই অবস্থায় একটি পরম তেজের সাক্ষাৎকার ঘটে। ঐ তেজের মধ্যে যাবতীয় পরিচ্ছিন্ন অহন্তা ডুবিয়া যায়। পরিচ্ছিন্ন অহন্তা নানাপ্রকার। দেহগত অহন্তা একপ্রকার, প্রাণগত অহঙ্কার তাহা হইতে ভিন্ন প্রকারের, পুর্যষ্টকগত অহঙ্কার অন্যপ্রকার এবং শূন্যগত অহঙ্কার ইহা হইতে পৃথক্। এই সকলই পরিচ্ছিন্ন অহন্তা। এইগুলি তখন মহাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া একমাত্র পূর্ণ অহন্তাতে স্থিতিলাভ করে। এই পূর্ণ অহন্তা বিশ্বের সহিত সর্বপ্রকারের অভেদভাবাপন্ন। এই অবস্থায় যোগী যখন উপনীত হন তখন পরম শিবের ন্যায় অবস্থা তাঁহার আরম্ভ হয়। এই যে পরমশিবের পঞ্চকৃত্যের কথা বলা হইল ইহা ব্যাপিনীকলার দ্বারা প্রকাশ পায়। ইহার পর মহাকালভৈরবও আর থাকেন না। মহাকালের অতীত মহাভৈরবের আবির্ভাব তখন ঘটে। এ অবস্থায় কোন সংস্কার পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে না। স্বাত্মসংবেদন ক্রমশঃ অধিক অধিক ফুটিয়া উঠে এবং চরমে উহা পূর্ণতা লাভ করে। পূর্বে যে ভগবতী মহাকালীর কথা বলা হইয়াছে তখন তিনিও না থাকার মত, কারণ তিনি তখন অকুলে প্রবিষ্ট হওয়ার জন্য উন্মুখ। অকুলই তাঁহার নিজধাম। বলা বাহুল্য, এই অবস্থা কালের দ্বারা কলিত নহে। ভূমি হিসাবে তখন ব্যাপিনীও অতিক্রান্ত। তখন সৃষ্টি সংহাররূপ কাল থাকে না। একমাত্র সাম্যরূপ কাল থাকে। এই অবস্থায় একটি ক্ষণমাত্র থাকে এবং উহা অনন্ত কালরূপে প্রতীত হয়। ইহাই প্রাচীন পাশ্চাত্য Mysticগণের Eternity অথবা Eternal Moment। উহাতে কোন ক্রম থাকে না। এই পর্যন্ত ক্রমবিকাশ সম্পন্ন হইলে যোগী পরমশিব অবস্থায় উন্নীত হয়, তখন পরাসংবিদ্‌রূপা জগদম্বার সাক্ষাৎকার ঘটে। ইনি একদিকে যেমন পূর্ণরূপা অপরদিকে তেমনি কৃশরূপা। ইনিই অঘটন-ঘটনপটীয়সী মহাশক্তি। ইনি সমস্ত চক্রের বিকাশ করেন বলিয়া ইনি পূর্ণা এবং সকলের সংহার করেন তাই ইনি কৃশা। যখন সকলকে সংহার করেন তখন তিনি নিজস্বরূপে স্থিত হন, যখন তাঁহার নাম কালসংকর্ষিণী। কৃশা অবস্থা ইহারই নামান্তর। এই পরমপদে উন্নীত হইয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করাই জীবের চরম লক্ষ্য।

পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে তুমি বুঝিতে পারিবে যে অখণ্ড মহাযোগের পথে যাহার সম্বন্ধে পূর্বে বলা হইয়াছে সেই যোগীর স্বরূপ এবং তাৎপর্য কি।

প্রমেয়, প্রমাণ ও প্রমাতারূপ ত্রিপুটির নিবৃত্তি হইয়া গেলেও প্রকৃত প্রস্তাবে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ্ স্থিতিতে প্রবেশ লাভ হয় না। কারণ ঐ সময়ে আত্মানুসন্ধান জাগাইয়া না রাখিতে পারিলে পতন অসম্ভব নহে। চিদাকাশ অথবা মহাব্যোমে বাহ্যপ্রপঞ্চ হইতে উপশম লাভ করা যায় ইহা সত্য কিন্তু উহা আত্মস্বরূপ নয় বলিয়া ক্রমশঃ ভাবরূপী প্রমেয়কেও সংহার করিতে হয়। ইহা আন্তর প্রমেয়। ইহা আত্মস্বরূপের অন্তর্গত বিশ্বের স্বরূপ। এই আন্তর প্রমেয় ও প্রমাণ উভয়ই পরম অদ্বৈত স্থিতির বাধক। তারপর প্রমাতৃভাবে প্রবিষ্ট হইলে পূর্বসংস্কার বর্জিত হওয়া আবশ্যক। প্রমাতৃভাব ক্রমশঃ অপরিচ্ছিন্ন হইয়া যায় কিন্তু তাহাও পরমস্থিতি নহে কারণ সেখানেও স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষ হয় না। ইহার পর বিশ্বের সহিত অভিন্নরূপে পূর্ণাহন্তার বিকাশ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বতন্ত্র্যেরও উন্মেষ হয়। ইহাই নিরাপদ স্থান। পূর্ববর্ণিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে যোগীর পক্ষে এই স্থান লাভ হয় না। পূর্বোক্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে পাতঞ্জল যোগীর নিরাপদ ভূমি এবং অদ্বৈত শাক্ত যোগীর নিরাপদ ভূমির পার্থক্য কোথায়।

১৯৪৫

৮০

কালিকার গায়ত্রী

কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদয়াৎ।

অর্থ—(আমরা যেন) কালিকাকে জানি (জানিতে পারি)।

(আমরা যেন) শ্মশানবাসিনীকে ধ্যান করিতে পারি।

ঘোরা আমাদিগকে যেন প্রেরণা করেন (কর্ম পথে জ্ঞানপথে চালনা করেন)

ক্রমবর্তী তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়া সাধকের সহিত ইষ্টদেবীর সম্বন্ধ অনুভূত হয়—

১। বেদন।

২। ধ্যান।

৩। প্রেরণা।

প্রথম অবস্থাটি দেবীর গায়ত্রীতে 'বিদ্মহে' এই শব্দের দ্বারা, দ্বিতীয়

অবস্থাটি 'ধীমহি' এই পদের দ্বারা, তৃতীয় অবস্থাটি 'প্রচোদয়াৎ' এই পদের দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে। বিদ্মহে, ধীমহি এবং প্রচোদয়াৎ এই তিনটি ক্রিয়াবাচক পদ, তন্মধ্যে প্রথম দুইটি ক্রিয়ার কর্ত্তা সাধক স্বয়ং এবং তৃতীয় ক্রিয়ার কর্তা স্বয়ং ভগবতী। এই উভয় ক্রিয়ার সম্মিলনে উপাসনা ব্যাপার সম্পাদিত হয়। আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে প্রথম দুইটি ক্রিয়ার কর্ত্তাই বহুরূপে চিন্তনীয় কারণ ক্রিয়া দুইটি বহুবচনান্ত। অন্তিম ক্রিয়াটির কর্তা এক ও অভিন্নরূপে চিন্তনীয়, কারণ ক্রিয়াটি একবচনান্ত।

উপরিলিখিত বিশ্লেষণ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বেদন ক্রিয়াটি সাধককে সম্পন্ন করিতে হয়। বেদন শব্দে জ্ঞানকে বুঝায়, সুতরাং ইষ্টদেবীকে সর্বপ্রথম জ্ঞানের গোচর করা আবশ্যক। যাহা জ্ঞানের গোচর নহে তাহা ধ্যানর আলম্বন হইতে পারে না এবং যাহা ধ্যানের আলম্বন নহে তাহার সহিত ধ্যাতা সাধক অভেদ প্রাপ্ত হইতে পারে না। অভেদ প্রাপ্তি না হইলে বিশুদ্ধ প্রেরণা আবির্ভূত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

প্রথম ক্রিয়াটি দ্বৈতভাবের, দ্বিতীয়টি দ্বৈতাদ্বৈতভাবের এবং তৃতীয়টি অদ্বৈতভাবের সূচনা করিতেছে। সুতরাং প্রথম অবস্থায় সাধককে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে দ্বৈত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয়রূপে প্রকট করাইয়া লইতে হয়। যাবতীয় কর্মরহস্য ইহারই অন্তর্গত রহিয়াছে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ প্রাথমিক সকল প্রকার কর্মেরই একমাত্র উদ্দেশ্য ইষ্টদেবতাকে প্রকট করা। কাষ্ঠখণ্ডে যেমন অগ্নি নিহিত থাকে কিন্তু ঘর্ষণ দ্বারা তাহাকে অভিব্যক্ত করিতে হয়, তদ্রূপ সাধকের স্বকীয় দেহেই তাহার ইষ্টদেবতা নিহিত রহিয়াছেন কিন্তু সাধকের ক্রিয়া কৌশলরূপ মন্থন ব্যাপার দ্বারা তাঁহাকে অভিব্যক্ত করিতে হয়। অভিব্যক্তির ফলে ইষ্টদেবতা সাধকের নয়নের গোচরীভূত হন। ইহারই নাম বেদন। ইহার পরবর্তী অবস্থায় সাধক ধ্যাতারূপে এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান ইষ্টদেবতাকে অনুক্ষণ ধ্যান করিতে থাকেন। বৈষ্ণবগণ ইহাকেই রূপসেবা বলেন। এই ধ্যান ক্রমশঃ গাঢ় হইতে হইতে ধ্যেয় ও ধ্যাতার মিলনে পর্যবসিত হয়। তখন ধ্যাতার হৃদয়াকাশে ধ্যেয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়। এই অবস্থাটি অদ্বৈত অবস্থা ভিন্ন অপর কিছু নহে, কিন্তু অদ্বৈত হইলেও ইহাতে চিৎশক্তির খেলা থাকে। এই চরম অবস্থায় সাধক সিদ্ধপদে উন্নীত হন। তখন তাঁহার হৃদয়-স্থিত ইষ্টদেবতাকে তাঁহারই অন্তর্যামীস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারেন। এ অবস্থায় সিদ্ধ ভক্ত দ্রষ্টা হন বা সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন. তাঁহার নিজের কোন কর্তব্য থাকে না। তাঁহার সমগ্র দেহটি যন্ত্ররূপে পরিণত হয়। অন্তর্যামী যন্ত্রীরূপে তাঁহার মহাইচ্ছাক্রমে ঐ দেহটিকে যন্ত্রবৎ চালনা করেন। এই চালনা ব্যাপারে চিৎশক্তি জ্ঞান এবং ক্রিয়া উভয়রূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে সিদ্ধ অবস্থায় জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়ের প্রাকৃতভাব

না থাকিলেও জ্ঞান ও ক্রিয়া থাকে। এই জ্ঞান ও ক্রিয়া অন্তর্যামীর প্রেরণা হইতে উদ্ভূত হয়। ঐ অবস্থায় জ্ঞাতৃত্ব অভিমান ও কর্তৃত্ব অভিমান থাকে না, কারণ যন্ত্র অভিমানহীন।

প্রথম অবস্থায় ইষ্টদেবী কালিকারূপে, দ্বিতীয় অবস্থায় শ্মশানবাসিনী রূপে এবং তৃতীয় অবস্থায় ঘোরারূপে অভিহিত হইয়াছেন। যখন প্রথমে তিনি সাধকের দৃষ্টিগোচর হইলেন তখন তিনি কালিকা। যখন কালিকা ধ্যানের আলম্বন স্বরূপ হইয়া সাধককে ক্রমশঃ অধিকাধিক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন তাঁহার তখনকার নাম শ্মশানবাসিনী, অর্থাৎ ঐ অবস্থায় হৃদয় শ্মশানে পরিণত হয় এবং ইষ্টদেবী তাহাতে অধিষ্ঠিত হন, সুতরাং শ্মশান-বাসিনী অবস্থা উপলব্ধি হইলেই তৃতীয় অবস্থার সূচনা হয় বুঝিতে হইবে। এই মহাশূন্যরূপ হৃদয়শ্মশানে আসীন ভগবতী যখন স্বীয় অংশভূত অভেদ-ভাবাপন্ন প্রিয় ভক্তকে হৃদয়ে থাকিয়াই জ্ঞান ও কর্মপথে যন্ত্রবৎ চালনা করেন তখন তিনি ঘোরা। মনে রাখিতে হইবে এই তৃতীয় অবস্থায় দ্বৈতভাব নাই এবং দ্বৈতাদ্বৈতভাবও নাই। শুধু অদ্বৈতভাব মাত্র আছে ; কিন্তু এই অদ্বৈতভাবটি নির্বিশেষ, নির্বিলাস ও নিঃশক্তিক অদ্বৈতভাব নহে। ইহাতে চৈতন্যশক্তির খেলা রহিয়াছে। বস্তুতঃ অভিমান নাই বলিয়া ঠিক জীবভাব নহে। ইহা মুক্ত ও সিদ্ধ অবস্থা কিন্তু পরাভক্তির খেলা ইহাতেও রহিয়াছে কারণ ইহার অখণ্ড স্বরূপের মধ্যে একদিকে জীব সাক্ষিরূপে, অপরদিকে ভগবতী প্রেরিকারূপে অবস্থান করিতেছেন। জীব সাক্ষী, কিন্তু যে দেহ আশ্রয়ে সে অবস্থিত তাহা সিদ্ধদেহ বলিয়া নিত্য বর্তমান হইলেও তাহার প্রতি জীবের কোন অভিমান নাই। ঐ দেহে থাকিয়াও উহার চালক জীব নহে, উহার সঞ্চালনভার স্বয়ং ভগবতী স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি আপন মহা ইচ্ছানুসারে তাঁহার জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিরূপ রশ্মির দ্বারা ঐ দেহে নিরন্তর জ্ঞান ও ক্রিয়ার অভিনয় করিয়া থাকেন। সাক্ষীরূপে জীব তাহা দেখিয়া অথচ তাহাতে অভিমানযুক্ত না হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকে। চিৎ অচিৎও ঈশ্বর এই তিনের মহাসমষ্টি লইয়াই এই তৃতীয় অবস্থার অভিব্যক্তি।

২২. ৪. ৪৫

গীতার পুরুষোত্তম ও আমি যে পরমাত্মার কথা বলিয়াছি, তাহা সর্বথা এক কিনা তাহা তুমি নিজেই বিচার করিয়া লইবে। কিন্তু তাহার পূর্বে গীতাতে পুরুষোত্তম বলিতে কি বুঝায় ও আমি পরমাত্মা বলিতে কি লক্ষ্য করিয়া থাকি এই দুইটি বিষয়ের স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। গীতাতে ক্ষর ও অক্ষর উভয় পুরুষের অতীত উত্তম পুরুষকে নির্দেশ করা হইয়াছে। ক্ষর ও অক্ষর পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মাক্রান্ত; কারণ ক্ষরের স্বভাব ক্ষরণ বা পরিণাম এবং অক্ষরের স্বভাব ক্ষরণ না হওয়া বা অপরিণামিত্ব অর্থাৎ কূটস্থতা; কিন্তু পুরুষোত্তম স্বীয় অচিন্ত্যস্বরূপে ক্ষর ও অক্ষর উভয়ের ধর্মকেই আশ্রয় দিয়া উভয়কে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন। গীতাতে কিন্তু এই পুরুষোত্তমকেই পরমাত্মা বলা হইয়াছে। ইনি পরমপুরুষ যাঁহাকে অনন্য ভক্তি দ্বারা লাভ করিতে হয়। কর্মের সহিত ক্ষরের এবং অকর্ম বা জ্ঞানের সহিত অক্ষরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু কর্ম ও অকর্ম বা জ্ঞান এই উভয়ের সামঞ্জস্য না হওয়া পর্যন্ত উত্তম পুরুষের সন্ধান পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ উত্তম পুরুষে কর্ম ও অকর্মের পরস্পর বিরোধ থাকে না। গীতাতে বলিয়াছেন—কর্মে অকর্মের দর্শন এবং অকর্মে কর্মের দর্শন ইহাই বুদ্ধির নিদর্শন। ইহাই যোগভাব। এই অবস্থায় কর্ম না করিয়াও কর্ম করা হয় এবং কর্ম করিয়াও কর্মহীন থাকা যায়। এই অবস্থায় কর্ম করা ও কর্ম হওয়া বস্তুতঃ একার্থ প্রতিপাদক। এই অবস্থায় কর্তৃত্ব থাকে না, কারণ ইহা অভিমানহীন অবস্থা, এবং সেইজন্যই ইহা বিশুদ্ধ অখণ্ড কর্তৃত্বের অবস্থা। এই প্রকার যোগীই শুদ্ধ সাক্ষাৎকারের দ্বারা 'কৃৎস্নকর্মকৃৎ' রূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন। গীতায় পুরুষোত্তম অথবা পরমাত্মার ইহাই আদর্শ।

জীব কর্তৃত্বাভিমান পরিহারপূর্বক অর্থাৎ নিজের দ্রষ্টৃস্বরূপে স্থিত হইয়া প্রপঞ্চাতীত হৃদয়রূপী মহাশূন্যে প্রবেশ করিলেই প্রকৃতির গুণাধিকার হইতে মুক্তিলাভ করে। ইহাই জীবের পরমাত্মা সাক্ষাৎকার। আমি যে পরমাত্মার কথা বলিয়াছি তাহা ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে পর চিৎকলার উন্মেষের ফল-স্বরূপ উপলব্ধিগোচর হয়। ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইতে হইলে অবিদ্যার ক্রিয়া নিবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। জীবের কর্তৃত্বাভিমান এবং তাহার ফলে সুখদুঃখের অনুভূতি এবং চক্রম মৃত্যুরাজ্য পরিভ্রমণ অবিদ্যারই ফল। অবিদ্যাই মূলক্লেশ। সুতরাং অবিদ্যা নিবৃত্ত না হইলে আত্মা স্বীয় ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত হইতেপারে না। অবিদ্যার নিবর্তকরূপী জ্ঞান এইজন্যই আবশ্যক। জ্ঞান চিত্তের ধর্ম; অজ্ঞানও

চিত্তেরই ধর্ম। কিন্তু জ্ঞানে লক্ষ্য অন্তর্মুখ থাকে বলিয়া এবং অজ্ঞানে অন্তর্মুখ লক্ষ্য আচ্ছন্ন থাকে বলিয়া জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়। লক্ষ্যের অন্তর্মুখতা আচ্ছন্ন হইলেই তাহাতে বহির্মুখতা ফুটিয়া উঠিবার সম্ভাবনা থাকে। বিক্ষেপের মূলে আবরণের কার্য স্বীকার করিতেই হয়, কিন্তু যখন অন্তর্লক্ষ্য বিকাশের দ্বারা তদ্‌গত আবরণ অপসারিত হয় তখন অস্মিতা এবং তৎফলভূত সুখ-দুঃখ আপনি নিরস্ত হইয়া যায়। এই যে জ্ঞান ইহা বস্তুতঃ অন্তঃকরণবৃত্তিতে প্রতিভাসমান চিৎশক্তি ভিন্ন অপর কিছুই নহে। জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞাননিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। যদি অজ্ঞানের সমমাত্রায় জ্ঞানের বিকাশ হয় তাহা হইলে অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া নিষ্কল আত্মস্বরূপে বা ব্রহ্ম-স্বরূপে জীবের স্থিতি হয়। এই অবস্থায় যেমন অজ্ঞান থাকে না অথবা তাহার কার্য সংসার থাকে না তেমনি জ্ঞানও থাকে না, থাকে শুধু আত্মা। আত্মাকে নিত্য স্বপ্রকাশরূপে জাগিয়া থাকিতে হয়। শুধু অজ্ঞানের নহে, অজ্ঞান নিবৃত্তির দ্রষ্টারূপেও তাহাকে থাকিতে হইবে। এই অবস্থায় আত্মাতে চিৎকলার অতি স্বল্পতম মাত্রায় হইলেও কিঞ্চিৎ উন্মেষ আবশ্যক। এই উন্মেষের ফলেই আত্মা সাক্ষীস্বরূপ হইয়া অবস্থান করে। ইহাই আমার বর্ণিত পরমাত্মরাজ্যে প্রবেশ। ইহা হৃদয়ে প্রবেশেরই নামান্তর। চিৎকলার ক্রমবিকাশ বস্তুতঃ ক্রিয়াশক্তিরই ক্রমবিকাশ, জ্ঞানশক্তির নহে। এইজন্য যে অনুপাতে আত্মাতে স্বরূপস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয় সেই অনুপাতে তাহাতে ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। জ্ঞানশক্তির সহিত ক্রিয়াশক্তির অভিন্নতাই চৈতন্য। জ্ঞানশক্তির পূর্ণবিকাশ ব্রহ্মপ্রাপ্তি অবস্থায় হইয়া গিয়াছে। ক্রিয়াশক্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঐ জ্ঞানশক্তি চৈতন্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। চিৎকলার পূর্ণ অভিব্যক্তি পূর্ণচৈতন্য। যাহাকে পরমাত্মা বলা হয় তাহাতে চৈতন্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি থাকে না—আংশিক অভিব্যক্তি থাকে। চৈতন্যের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইলে ভগবদ্‌ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

চৈতন্যের পূর্ণ অভিব্যক্তির ফলে স্বরূপানন্দের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। যাহাকে হ্লাদিনী শক্তিরূপে বর্ণনা করা হয় তাহার পূর্ণ বিকাশ পরমাত্মভাবে সম্ভব নহে। হ্লাদিনী শক্তি স্বরূপশক্তির শ্রেষ্ঠ অবস্থা। উহাতে নিজের আস্বাদন নিজের মধ্যে হইয়া থাকে। এই আস্বাদন আনন্দস্বরূপ। এই আস্বাদনেই পরম পদার্থের পূর্ণ অভিব্যক্তি সম্ভব হয়। যাহাকে ভক্তি বা প্রেম বলা হয় তাহা এই হ্লাদিনী-শক্তিরই বিকাশ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। স্বরূপের যে পূর্ণত্ব তাহা শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি ব্যতীত সম্ভবপর নহে। এই দৃষ্টিতে বুঝিতে পারা যাইবে যে ব্রহ্মে শক্তির অভিব্যক্তি নাই। জ্ঞানপথে অদ্বয় সত্তারূপে এই নিষ্কল চিদ্রূপী সত্তাকে অনুভব করা যায়। পরমাত্মাকে অনুভব করিতে হইলে যোগপথের উন্মেষ আবশ্যক। এই পথে অনুভব করিতে হইলে শক্তির

আংশিক অভিব্যক্তি প্রয়োজন। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত। পরমাত্মা ইন্দ্রিয়ের অতীত হইলেও মনের অতীত নহে। শুদ্ধ মনের অন্তর্মুখ গতিতে একাগ্রভূমিতে পরমাত্মার অনুভব হয়। এই অনুভব যোগানুভব নামে প্রসিদ্ধ। ইহাতে একটি স্বাভাবিক ক্রম আছে। পরমাত্মার স্বাভাবিক অংশরূপে জীবাত্মার আত্মপ্রকাশ ঘটিয়া থাকে। এক কলা, দুই কলা করিয়া কলার বিকাশ যেমন ঘটিতে থাকে তেমনি তেমনি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগাবস্থাও গাঢ় হইতে থাকে। ব্রহ্মে যেমন অভেদ অবস্থা এখানে তেমন ভেদাভেদ অবস্থা। পূর্ণ ভেদও নহে, পূর্ণ অভেদও নহে। ভেদাবস্থায় উভয়ের মধ্যে ভেদ সম্যকপ্রকারে আত্মপ্রকাশ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে যোগ ভক্তিরূপ ধারণ করে। এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে এই অবস্থার ভেদ থাকিলেও উহা লোকোত্তর ভেদ, কারণ উহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গোচর নহে। তখন ভক্ত ও ভগবানের আত্মপ্রকাশ ঘটে। উহা মনের অতীত নহে এবং শুদ্ধ মনোমাত্রের গোচর তাহাও নহে—তাহা ইন্দ্রিয়গোচর। তবে ঐ ইন্দ্রিয় সংস্কারযুক্ত ইন্দ্রিয়, অসংস্কৃত ইন্দ্রিয় নহে। ভগবানের রূপ-রস-গন্ধসমন্বিত দেহের অভিব্যক্তি আছে। ঠিক এইপ্রকার ভক্তেরও আছে। তাই উভয়ের মধ্যে স্থূল সম্বন্ধ প্রকাশ পায়। কিন্তু উহা স্থূল হইলেও লোকোত্তর। ইহা প্রাকৃত জগতের দৃষ্টির অতীত। ইহাকে আশ্রয় করিয়াই চিদানন্দময় লীলাভূমির বিকাশ হয়।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারে কোন ভূমি থাকে না। উহা বিশ্বাতীত। যোগাবস্থায় পরমাত্মানুভবে মনোময় ভূমি থাকে। কিন্তু ভগবদনুভবে পূর্ণ স্থূলরূপে প্রকট ভূমিই থাকে। তবে উহা লোকোত্তর। স্থূল হইলেও উহা লৌকিক ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। ইহাকেই ধাম বলিয়া জানিতে হইবে।

আজ এই পর্যন্তই থাক।

৮২

আপনি যে বিষয়ে সংশয় উত্থাপন করিয়াছেন সে সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা না করিলে সংশয় নিবৃত্ত হওয়া কঠিন। পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কথা আছে। কিন্তু এবিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে মনে রাখিতে হইবে যে সমাধি ও যোগ সমানার্থক শব্দ নহে। সমাধিমাত্রই যোগ নহে, কিন্তু যোগমাত্রই সমাধি তাহাতে সন্দেহ নাই। চিত্তের বৃত্তি যে কারণেই হোক্ একাগ্র হইলেই তাহা সমাধিতে পরিণত হয়। এমনি কি একাগ্র না হইয়া নিরুদ্ধও যদি হয় তাহা হইলেও উহা সমাধি পদবাচ্য, কিন্তু উহা যোগ নহে। কারণ, ভূমি একাগ্র না হইলে সমাধি যোগপদবাচ্য হয় না। যখন একাগ্র ভূমিতে বৃত্তি একাগ্রতা লাভ করে তখন ঐ একাগ্রবৃত্তিই যোগরূপে আখ্যাত হইয়া থাকে। যোগরূপী সমাধিই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি নামে প্রসিদ্ধ। এই একাগ্রভূমিতে প্রজ্ঞার উদয় হয়। প্রজ্ঞার প্রভাবে চিত্তনিহিত অনাদি কালের সঞ্চিত অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান কাটিয়া যায় তবে উহা ক্রমশঃ সংঘটিত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রজ্ঞা অথবা জ্ঞান সালম্বন চিত্তে উদিত হইয়া থাকে। আলম্বন যেমন যেমন বহির্জগৎ হইতে অন্তর্জগতে পরিবর্তিত হয় তেমনি তেমনি প্রজ্ঞা ক্রমশঃ বাহ্য জগৎ হইতে অন্তর্মুখ হইয়া অস্মিতারূপে পরিণতি লাভ করে। বাহ্য বিষয় স্থূল-সূক্ষ্মভেদে দুইপ্রকার। ইহাই বিতর্কসমাধির বিষয়। তদ্রূপ সূক্ষ্ম বিষয় বিচারসমাধির আলম্বন। এই উভয় ক্ষেত্রেই শব্দ, অর্থ ও জ্ঞানের সাংকর্য থাকিতে পারে, না থাকিতেও পারে। সাংকর্য থাকিলে ঐ জ্ঞানটি সবিকল্প জ্ঞানরূপে পরিচিত হয়। সাংকর্য না থাকিলে উহা হয় নির্বিকল্প জ্ঞান। ইহা স্থূল অর্থাৎ বিতর্কভূমিতেও হইতে পারে এবং সূক্ষ্ম অর্থাৎ বিচার ভূমিতেও হইতে পারে। সবিতর্ক এবং সবিচার— এই উভয় জ্ঞানই সবিকল্পক। তদ্রূপ নির্বিতর্ক ও নির্বিচার—এই উভয় জ্ঞানই নির্বিকল্প। স্মৃতি পরিশুদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত বিকল্প দূর হয় না। অর্থের অর্থাৎ পদার্থের সহিত শব্দ ও জ্ঞান—উভয়ের সম্বন্ধ রহিয়াছে। অর্থের সহিত শব্দের সম্বন্ধ এইপ্রকার—শব্দ বাচক, অর্থ বাচ্য। তদ্রূপ অর্থের সহিত জ্ঞানের সম্বন্ধও রহিয়াছে। ঐ স্থলে অর্থ বিষয়, জ্ঞান বিষয়ী। বিতর্ক ও বিচার—উভয় সমাধিতেই সমগ্র জগৎ সম্পূর্ণ হইয়া যায়। ইহার নাম গ্রাহ্য সমাপত্তি। ইহার পর গ্রহণ সমাপত্তিতে অর্থের ভান থাকে না। ইহা সানন্দ সমাধি নামে পরিচিত। ইহার পর অস্মিতা তত্ত্ব আলম্বন করিয়া গ্রহীতৃ সমাধির উদয় হয়। এইপ্রকারে গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য—এই তিনের সমষ্টিরূপ বিশ্ব আরম্ভ

হয়। ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ক্রমবিকাশের ইতিহাস। অস্মিতা সমাধিতে উপনীত হইলে যোগী অতুলনীয় ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সর্বজ্ঞাতৃত্ব এবং সর্বকর্তৃত্বরূপ মহাসিদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। প্রজ্ঞার ক্রমবিকাশের ফলে এইপ্রকার অনুপম ঐশ্বর্যের প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বিশুদ্ধ আত্ম-সাক্ষাৎকার এই অবস্থায় হয় না, কারণ এই প্রজ্ঞার মূলে অবিবেক রহিয়া গিয়াছে। এইজন্য বিভূতি মার্গে পরম উৎকর্ষ লাভ করিলেও কৈবল্য পথে চলিবার সামর্থ্য জন্মে না। ইহার পর ভাগ্যবান যোগী যখন এই সর্বজ্ঞত্ব ও সর্বকর্তৃত্বরূপ ঐশ্বর্যের উপরে বিতৃষ্ণ হয়, তখন সে বিবেকের পথে চলিবার যোগ্যতা লাভ করে। চিত্ত বহির্মুখ থাকিতে বিবেকখ্যাতির উদয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। যদিও ভোগ-বিতৃষ্ণারূপ বৈরাগ্য পূর্বেই সম্পন্ন হয়, তথাপি অধিকার-বিতৃষ্ণারূপ বৈরাগ্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত বিবেকখ্যাতির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। বিবেকখ্যাতি বলিতে ইহাই বুঝায় যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তর্গত প্রজ্ঞার অবয়বস্বরূপ চিৎ এবং সত্ত্ব পরস্পর পৃথক্ এই বোধের উদয়। ঐশ্বরিক প্রজ্ঞাতেও অবিবেক থাকে। এইজন্য চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ সত্ত্ব এই উভয়কে পৃথক্ করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হয়। বিবেকখ্যাতির সাতটি স্তর আছে। এই সাতটি স্তরে বিবেকজ্ঞান সম্পূর্ণ বিশুদ্ধরূপে প্রকাশ পায়, তখন চিৎ অর্থাৎ পুরুষ এবং সত্ত্ব অর্থাৎ প্রকৃতি বা গুণ এই উভয়ের সংমিশ্রণ থাকে না। কিন্তু ইহা কি প্রকারে আবির্ভূত হয় তাহা বিবেচ্য।

ঐশ্বর্যের দিকে বিতৃষ্ণা জন্মিলেই আত্মা যোগের দৃষ্টিতে বিদ্যুতের চমকের ন্যায় ক্ষণিকের জন্য স্ফুরিত হন। এই স্ফুরণের আলোকে গুণরূপী প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন হয়, তখন প্রকৃতি যে পরিণামশালিনী এবং আত্মা অপরিণামী তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন হয়। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চরম উৎকর্ষ লাভ করিলেও প্রকৃতির স্বরূপ দর্শন হয় না—'গুণানাং পরমং রূপং ন দৃষ্টিপথং ঋচ্ছতি।' এইজন্য পুরুষখ্যাতির অবস্থায় আত্মা নিজের আলোকে নিজের নিকট নিজেকে ধরা দেন। এই আলোকেই গুণরূপী প্রকৃতির দর্শন হয়, প্রজ্ঞার আলোকে নহে। ইহার পর খ্যাতির পূর্ণতা জ্ঞানসম্প্রসাদরূপে পরবৈরাগ্যের উদয় হয়। এদিকে চিত্ত একাগ্রভূমি হইতে নিরোধভূমিতে উপনীত হয়। জ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় এবং জ্ঞানসংস্কারের প্রভাবে অজ্ঞানসংস্কারও নিবৃত্ত হয়। তখন চিত্ত সংস্কারাত্মক অবস্থায় থাকে। ইহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা। তখন দ্রষ্টা পুরুষের নিকট চিত্ত সংস্কাররূপে তাহার দৃশ্য হইয়া বিদ্যমান থাকে। ইহাই পতঞ্জলিসম্মত দ্রষ্টার স্বরূপ-অবস্থিতিরূপ যোগ। নিরোধের অবস্থায় এরূপ হয়, তখনও কৈবল্য সম্পন্ন হয় নাই। এইজন্য সংস্কাররূপে হইলেও চিত্তের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে।

এই সংস্কারও যখন কাটিয়া যায় তখন চিত্ত থাকে না। আত্মা তখন যোগী না হইয়াও কেবল স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—ইহার পর বা শ্রেষ্ঠ যোগ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অপর যোগ। জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানকে অতিক্রম করা—ইহাই যোগের লক্ষ্য। জ্ঞানপ্রাপ্তির ফলে অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় এবং জ্ঞানসংস্কারের প্রভাবে অজ্ঞানসংস্কার কাটিয়া যায়। তখন জ্ঞান ও অজ্ঞান—সবই সংস্কারসহিত নির্মূল হইয়া যায়। যতক্ষণ চিত্ত থাকে ততক্ষণ দেহ থাকে। চিত্ত না থাকিলে দেহও থাকে না। যাহাকে কুশল আত্মা অথবা জীবন্মুক্ত বলা হয় তাহা চিত্ত না থাকিলে হয় না, কারণ চিত্ত না থাকিলে দেহকে ধরিয়া রাখিবে কে? তবে প্রারব্ধ কর্মের অবসান হইয়া গেলে চিত্তও থাকে না দেহও থাকে না।

বেদান্তে জ্ঞানের সপ্তভূমি স্বীকারের আনুষঙ্গিকরূপে বলা হইয়াছে যে, চতুর্থভূমি আত্মার অপরোক্ষজ্ঞানের উদয়ের অবস্থা এই পঞ্চমভূমি জীবন্মুক্তির অবস্থা। পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম—এই তিনটি ভূমি জীবন্মুক্তের। পঞ্চম-ভূমিতে জীবন্মুক্তকে বলে ব্রহ্মবিদ্, ষষ্ঠভূমিতে তাহার নাম হয় ব্রহ্মবিদ্-বরীয়ান্, সপ্তমভূমিতে ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ ভূমিকে তুরীয় বলা যাইতে পারে। সপ্তমভূমি তুরীয়াতীত তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদান্তমতে মূল অবিদ্যার দুইটি বৃত্তি আছে—একটি আবরণ, অপরটি বিক্ষেপ। যখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তখন আবরণটি কাটিয়া যায়, কিন্তু বিক্ষেপ তখনও থাকে। ইহাই প্রারব্ধ কর্মরূপে আত্মপ্রকাশ করে। জীবন্মুক্তের প্রারব্ধ কর্ম থাকে, তাই দেহ থাকে এবং প্রারব্ধকর্মজন্য সুখ-দুঃখের ভোগও থাকে। কিন্তু এই ভোগ ভোগমাত্র। ইহাতে অভিনব কর্মের বীজ বপন হয় না, কারণ আত্মসাক্ষাৎকার হওয়ার ফলে নূতন কর্ম আর উদ্ভূত হয় না। কারণ, জ্ঞানীর ক্রিয়মাণ কর্মের অশ্লেষ—ইহাই সিদ্ধান্ত। ব্রহ্মসূত্র, পঞ্চদশী, জীবন্মুক্তিবিবেক (অচ্যুত মোদকের টীকা-সহিত), বোধসার প্রভৃতি গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে আলোচ্য। আত্মসাক্ষাৎকাররূপী জ্ঞান সবিকল্প জ্ঞান তাহাতে সন্দেহ নাই। নির্বিকল্প জ্ঞান সবিকল্প জ্ঞানের পরে উদিত হয়। খাঁটি নির্বিকল্প জ্ঞানের উদয় হইলে মন নিরুদ্ধ হইয়া যায়। তাই দীর্ঘকাল দেহ থাকা সম্ভবপর হয় না, এইরূপ অনেকের মত। কিন্তু এই সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে। জীবন্মুক্ত জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি দুই-ই হইতে পারে। ঈশ্বরকোটি জীবন্মুক্ত দীর্ঘকাল পর্যন্ত লোকসংগ্রহ করিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে নির্বিকল্প জ্ঞানের পরে দেহ সংরক্ষণ করা সম্ভবপর নহে—একথা সত্য নহে। কারণ, প্রারব্ধকর্ম কাটিয়া গেলেও ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন যোগীর দেহের অনুবৃত্তি সম্ভবপর। কিন্তু জীবকোটি জীবন্মুক্তের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। জীবকোটি

জীবন্মুক্ত ঐশ্বরিক শক্তিসম্পন্ন না হওয়ার দরুণ শুধু প্রারব্ধ কর্মের বলেই জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া জীবন্মুক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে বিভিন্ন কথা বলিবার রহিয়াছে। সিদ্ধমার্গ, রসায়ন মার্গ এবং প্রাচীন আগমমার্গ অনুসারে জীবন্মুক্তের চিত্তে অবিদ্যালেশ থাকিতে পারে না এবং জীবন্মুক্ত সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া স্বেচ্ছা অনুসারে যতদিন আবশ্যক মনে করেন ততদিন দেহ ধারণ করিতে পারেন। সিদ্ধদেহ কালের অতীত, এইজন্য সিদ্ধযোগী ইচ্ছামৃত্যু হইয়া থাকেন। তিনি প্রারব্ধের অধীন নহেন। এই ইচ্ছামৃত্যু তিরোধান মাত্র, প্রচলিত অর্থে মৃত্যু নহে। আবার এমন জীবন্মুক্তও আছেন যিনি কল্পান্তকাল অথবা মহাকল্পান্তকাল পর্যন্ত ঐ একই শরীরে বিদ্যমান থাকিতে পারেন। জীবন্মুক্তের অবিদ্যালেশ থাকে ইহা সকলে স্বীকার করেন না। ইহা অনেক বৈষ্ণব আচার্যও স্বীকার করেন না। অনেক বৈষ্ণব আচার্যের মতে জীবন্মুক্তি অবস্থা স্বীকৃতও হয় না। এই সম্বন্ধে বহু কথা বলিবার আছে। তাহা এখন বলা সম্ভব নহে।

যোগীর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সম্প্রজ্ঞাত সমাধিলাভের পরে হইয়া থাকে। ইহাকে উপায়প্রত্যয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। মুখ্য উপায় প্রজ্ঞা—সর্বমূল শ্রদ্ধা। এই প্রজ্ঞালাভের পর প্রজ্ঞা নিরুদ্ধ হইলে যে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয় তাহাই যোগ। কিন্তু অজ্ঞানীদের মধ্যে কাহারও কাহারও প্রজ্ঞার উদয় না হইয়াও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি লাভ হইয়া থাকে। ইহা চিত্তের নিরুদ্ধ অবস্থা হইলেও যোগপদবাচ্য নহে, কারণ ইহা অজ্ঞানমূলক। অজ্ঞান বৃত্তিরূপে না থাকিলেও সংস্কাররূপে থাকেই। সকল আত্মা এই জাতীয় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পর অভিনব সৃষ্টির উদয়ে পুনর্বার সংসার ক্ষেত্রে ফিরিয়া আসেন। ইহাদের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রজ্ঞামূলক না হইলেও বৈরাগ্যমূলক তাহাতে সন্দেহ নাই। এইজন্য এই সকল আত্মা অভিনব সৃষ্টিতে প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় সুখ-দুঃখভোগের জন্য সংসারে জন্মগ্রহণ করে না—কিন্তু উর্দ্ধলোকে অধিকারীরূপে স্থান প্রাপ্ত হয়। ইহারা প্রকৃতিলীন অথবা বিদেহ দেবতা যে-কোন অবস্থায় অবস্থিত থাকুক্ না কেন ইহাদের নিরোধ উপায়প্রত্যয় নহে, ভবপ্রত্যয়।

নির্বিকল্প সমাধি প্রাপ্ত হইলে চিত্তের সংকল্প বিকল্প থাকে না। তখন চিত্ত সত্যসংকল্প হইয়া থাকিতে পারে অথবা সংকল্প-বিকল্প উভয়শূন্য হইয়া থাকিতে পারে। তবে সকলের অবস্থা একপ্রকার হয় না। মনের সম্যক্ প্রকার লয় হইয়া গেলে প্রাকৃত অবস্থায় দেহধারণ সম্ভব হয় না। তবে মনের সংস্কার থাকা পর্যন্ত দেহধারণ সম্ভবপর। অবশ্য উহা সাধারণ লোকের দেহধারণের অনুরূপ অবস্থা নহে। শাস্ত্রে জানা যায় মনের সম্যক্ নিরোধ হইয়া গেলেও চিৎশক্তির দ্বারা অথবা ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবে দেহধারণ সম্ভবপর।

ইহা জীবকোটি জীবন্মুক্তের কথা নহে, ঈশ্বরকোটি জীবন্মুক্তের কথা। সাধারণ লোকের পক্ষে জীবন্মুক্তের মধ্যে এইপ্রকার ভেদ নির্ণয় করা সহজ নহে। এতদ্ব্যতীত যোগীর দেহ যদি প্রাকৃত উপাদান হইতে অপ্রাকৃত স্বরূপে পরিণত হয় তাহা হইলে ঐ দেহ সাধারণ দেহ হইতে নানা অংশে পৃথক্ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যোগিগণ এই অবস্থাতে কায়সম্পদ্ লাভ করিলে পঞ্চরূপে বিভক্ত পঞ্চভূত তাহার বশীভূত হইয়া যায়। সুতরাং এই সকল ভূতজয়ী যোগী জীবন্মুক্ত অবস্থাতে থাকেন না অথচ জ্ঞানী জীবন্মুক্ত হইতে পৃথক প্রতীত হইবে। জীবন্মুক্তির অসংখ্য প্রকার ভেদ আছে। সব জীবন্মুক্ত পুরুষ একই শ্রেণীর অন্তর্গত মনে করা উচিত নহে। কায়সম্পদ্ অথবা ভূতজয়, কিম্বা ইন্দ্রিয়জয় সিদ্ধ না হইলেই যে জীবন্মুক্তি হয় না এমন কথাও নহে। স্বরূপের আবরণ মুক্ত হইলেই এবং সেই নিরাবরণ আত্মাকে অপরোক্ষজ্ঞানে অনুভব করিতে পারিলে মুক্তি করতলগত হইয়া যায়। তবে ঐ মুক্তি জীবন্মুক্তি নাও হইতে পারে। ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি না হইলে ঐ নিরাবরণ আত্মস্বরূপে জ্ঞান দেহাবস্থায় ধারণা করা সম্ভবপর নহে। উহা ক্ষণমাত্রের জন্য উদিত হইলেও স্থৈর্যলাভ করে না। সেইজন্য পুরুষ মুক্ত হইয়াও দেহশুদ্ধির অভাবে মুক্তির অনুভব করিতে সমর্থ হয় না।

প্রাচীন বেদান্ত সম্প্রদায়ে দুইটি মার্গ প্রচলিত ছিল একটি উপাসনা মার্গ এবং অপরটি বিচার মার্গ। উপাসনা মার্গে ভূতশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি সম্পূর্ণ হওয়ার পর জ্ঞান উদিত হইলে জ্ঞানের পরে জীবন্মুক্তি আয়ত্ত হইয়া যায়। তাহার জন্য কালের প্রতীক্ষা থাকে না। কিন্তু বিচার মার্গে উচ্চ অধিকারীর অপরোক্ষজ্ঞান প্রাপ্তি ঘটিলেও ঐ জ্ঞানের প্রভাবে দেহ মন শুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হয় না! এইজন্য তান্ত্রিক দার্শনিকগণ যেমন অজ্ঞানকে বৌদ্ধ ও পৌরুষ অজ্ঞানরূপে বিভাগ করিয়াছেন তেমনি জ্ঞানকে বৌদ্ধ ও পৌরুষরূপে বিভাগ করিয়াছেন। পৌরুষ অজ্ঞানের নিবৃত্তি সদ্গুরুর কৃপায় মুহূর্তমধ্যে হইয়া যায়, কিন্তু বৌদ্ধ অজ্ঞানের নিবৃত্তি বৌদ্ধ জ্ঞানের উদয় ব্যতীত সম্পূর্ণ হইতে পারে না। এই বৌদ্ধ জ্ঞানের বিকাশের জন্যই তপস্যা, সাধনা, বিচার, যোগাভ্যাস প্রভৃতি আবশ্যক। বৌদ্ধ জ্ঞানের উদয়ে বৌদ্ধ অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া গেলে পূর্বপ্রাপ্ত পৌরুষ অজ্ঞানের নিবৃত্তি পৌরুষ জ্ঞানের উদয়রূপে অনুভূত হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে বহু বিষয় আলোচনার রহিয়াছে। এখানে শুধু দিগ্দর্শন মাত্র করা হইল।

যেখানে বাহ্যগুরু হইতে জ্ঞানের উদয় না হইয়া ভিতর হইতেই জ্ঞানের উদয় হয় এবং অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় সেখানে প্রাতিভজ্ঞান গুরুরূপে গ্রহণীয়। বাহ্যগুরু মনুষ্যরূপে, সিদ্ধ-পুরুষরূপে, দেবতারূপে প্রকটিত হন। কিন্তু আন্তরগুরু কোনপ্রকার কায়াধারণ করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন না। নিজের

হৃদয় হইতে উত্থিত প্রাতিভারূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। এইপ্রকার গুরুপ্রাপ্তি ভগবৎকৃপার তীব্রতার উপর নির্ভর করে। ইহাকেই আচার্যগণ শক্তিপাত বলেন। তীব্রমধ্যম শক্তিপাত হইলেও প্রাতিভগুরুর কৃপা লাভ হয়। কিন্তু তীব্রতীব্র শক্তিপাত হইলে প্রাতিভগুরুর আবশ্যকতাও থাকে না—তখন বিদ্যুৎ চমৎকের ন্যায় পূর্ণতম জ্ঞানের উদয় হইয়া পশু আত্মাকে শিবরূপে পরিণত করে এবং এইপ্রকার পূর্ণ শিবত্ব লাভের পর অজ্ঞান সংস্কার, প্রারব্ধকর্ম প্রভৃতির প্রশ্ন আর থাকে না। ইহার মধ্যেও অনেক অবান্তর অবস্থা আছে, কারণ, সকলের স্থিতি এক প্রকার নহে।

সংক্ষেপে কিছু লিখিলাম। পরে প্রয়োজন হইলে এবং শরীর ভাল থাকিলে আবার লিখিব। আপনি পূর্ণগুরুর কৃপালাভ করিয়া কৃতার্থ হউন—ইহাই শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা।

শুদ্ধিপত্র

পত্রসংখ্যা	পৃষ্ঠ সংখ্যা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	৯	২৫	খণ্ডং	খণ্ডিত
৭	১৩	৮	বীজরপে	বীজরূপে
৭	১৩	১০	করেতে	করিতে
৭	১৫	২২	অকৃতিম	অকৃত্রিম
৮	১৬	২১	দ্রষ্টাভাব	দ্রষ্টাভাবে
২০	৪৬	২৫	উভূত	উদ্ভূত
২৬	৫৮	২২	করণ	কারণ
২৯	৬৮	১৮	নিতা	নিত্য
৪১	৮৮	৩১	গত	গতি
৪৪	৯৫	২	অবিভাব	আবির্ভাব
৪৮	১০৫	১২	পূণই	পূর্ণই
৫১	১১৬	১০	স্বরপে	স্বরূপে
৬৯	১৪৪	১	আপীন	আপনি
৭৩	১৫১	৩০	কান	কোন
৭৩	১৫২	১৭	মরজগতের	মরজগতের